পরকীয়া প্রেম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

পরকীয়া প্রেম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্টোবর, ২০০৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
মার্চ, ২০০৯
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
সেপ্টেম্বর, ২০১২

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণ ঃ
শ্রীবিদ্যা অশোক

মুদ্রাকর ঃ
হিন্দুস্থান আর্ট এনঃ কোং প্রাঃ লিঃ
২৪, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ আশি টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

'পরকীয়া'—এই শব্দটির মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে প্রেমের কথা, প্রেমের গন্ধ। মানুষের, বিশেষ করে সমস্ত প্রেমিক-প্রেমিকার রক্তে বইতে থাকে যে প্রেমময় রসধারা, জীবনকে ঘিরে আমৃত্যু যার প্রভাব থেকে যায়। রবীন্দ্র-শরৎ উত্তর বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কল্লোল এবং কল্লোল-পরবর্তী সাহিত্যে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে নানাভাবে। আর বর্তমান সমাজে তো কোনো প্রেমেই নিষিদ্ধের তকমা নেই, এক কথায় সারা বিশ্বের প্রেম একমুখী। বর্তমানে তথাকথিত 'লিভ-টুগেদারের' সময় তো প্রেম বড়ই অসহায়—নির্লজ্জ। এত কিছুর পরেও পৃথিবীতে প্রেম ছিল, আছে, থাকবে, তাই পৃথিবী যতই আধুনিক তথা সভ্য হোক না কেন প্রেম এবং পরকীয়া প্রেম সব যুগেরও অঙ্গ।

বর্তমান সংকলনটিতে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের লেখাকে স্থান দিতে পারা গেছে। যদি বর্তমান সংকলনটি পাঠকদের তৃপ্তি দিতে পারে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করা হবে।

শ্যামাপদ সরকার

সূচীপত্র

মানভঞ্জন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
ল্যাভেন্ডার	অন্নদাশঙ্কর রায়	১৫
চরিত্রহীন	আশাপূর্ণা দেবী	২৪
নুরবানু	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৩
রানী সাহেবা	বিমল মিত্র	৪২
সুবর্ণা	সমরেশ বসু	৫৯
স্বামী হওয়া	বুদ্ধদেব গুহ	৬৫
ফ্রিস্টাইল	সমরেশ মজুমদার	৮৩
আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন	বিমল কর	৮৭
লোলিটা	শ্রীমতী বাণী রায়	১০০
প্রেমিক ও স্বামী	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১০৭
প্রেমিক	দিব্যেন্দু পালিত	১১৫
দ্বিচারিতা	সুচিত্রা ভট্টাচার্য	১২২
এক কম্বলের নীচে	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১২৯
ব্যাভিচারিণী	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৬
পরকীয়া	অঞ্জলি চক্রবর্তী	১৫০
পরপুরুষ	নাসরীন জাহান	১৫৬
করুণ শঙ্খের মতো	সন্তোষ কুমার ঘোষ	১৬৫
জ্যোৎস্নায় শঙ্খচিল	কিন্নর রায়	১৭২
একান্ত গোপনে	পার্থ দত্ত	১৮২
অবৈধ	সৌরেন দত্ত	১৯১
পরকীয়া প্রেম	উজ্জ্বলকুমার দাস	২০০
ডেকামেরন	গিওভানি বোকাসিও	২০৯
লাভ অ্যান্ড সেক্স অফ এ গুড গার্ল	ন্যান্সি ফ্রাইডে	২২৫
টম জোন্স	হেনরী ফিল্ডিং	২৩০
রোমান্স	অ্যানীস নীন	২৩৬

মানভঞ্জন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকার সর্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করে। শয়নকক্ষের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ, ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট পাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশবিশিষ্ট বিলাতি নারীমূর্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙানো রহিয়াছে, কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেওয়ালের কোনো ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গ চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে, মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গিতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদির রসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাদের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোনো এক অশ্রুত অব্যক্ত সংগীতের তালে তালে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গিতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কী এক আনন্দ আছে, সে যেন আপন সৌন্দর্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব পুলক-সহকারে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়—অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গিটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখির মতো অনন্ত আকাশের মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট করিয়া দেখিয়া লয়—আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন ঝিন করিয়া বাজিয়া উঠে। হয়তো আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে, চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্তদন্তপঙ্‌ক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া যখন হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মতো বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনীগৃহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই—সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে, কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও শৌখিন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান-অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে, মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত

বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোটো বৈঠকখানার ছোটো কর্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই একজাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্ধনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলি সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; সেজন্য অনেক লোক বিষয়নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ। সেই গর্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখকর্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন আবর্তের মতো পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়নগৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত, বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী, সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন-তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত ; মাঝে মাঝে তাহারা প্রতিবাদ করিত এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না। সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—'দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে', এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্যসুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝংকৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোনো স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে—সে যখন

সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েস্ট্‌কোট পরা, ফুল্‌মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী 'এক্সেলেন্ট্' করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনো তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর-কোনো নারীর এমন কোনো মনোরঞ্জিনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল; সুধো আসিয়া নাসা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামনাম-উচ্চারণ-পূর্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জনীয় ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য মূর্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গিতে যে-সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারংবার কহিল, বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধকাষ্ঠের মতো তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে-এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময় লোকময় বাদ্যসংগীতমুখরিত দৃশ্যপটশোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীরবেষ্টিত নির্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেদিন 'মানভঞ্জন' অপেরা অভিনয় হইতেছে। কখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সংগীতসহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই

সংগীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায় এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল ; মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোনো বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কানে কানে বলে, 'বউঠাকরুন, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চলো ; দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না।' গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জয় মান হইয়াছে ; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না ; কত অনুনয়বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনো এমন করিয়া সাধে নাই ; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব মোহে স্থির করিল যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্যের যে কেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে, অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল ; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে। রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোনো বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, 'বউঠাকরুন, করো কী, ওঠো, এখনি সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।'

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিটমিট করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই—গৃহপ্রান্তে নির্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে ; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্যময় আলোকময় সংগীতময় রাজ্য—যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে—যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে, তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটীদের মুখের রঙচঙ, সৌন্দর্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে

পাইল। কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসংগীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সংগীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্বরহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত—বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়াসিংহাসন আর কোথায় আছে।

প্রথম যেদিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোনো নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জরিত চিত্তে মনে করিল, যদি কখনো এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতো তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই। আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলিধ্বজের মতো একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উলটিয়া পালটিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুকুতার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা-সঞ্চার করিত—ঝলমল করিয়া, রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারি দিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপলপদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল, এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, 'আহা বউঠাকরুন, আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম।' গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, 'বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গানটা গা।'

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধো অনেকখানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না, শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না। কেহ কাফি রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না, 'কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদনশশী।' সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, 'একবার চাবিটা দাও দেখি।'

এমন জ্যোৎস্নায়, এমন বসন্তে, এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়ায়ই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, 'ওগো, একবার চাবিটা দাও দেখি।' তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোনো মোহ নাই, মাধুর্য নাই—তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো হু হু করিয়া বহিয়া গেল—টব-ভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল—গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, 'চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চলো।' আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহাতে সমস্ত নির্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, 'আমি বেশি দেরি করিতে পারিব না, তুমি চাবি দাও।'

গিরিবালা কহিল, 'আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা-কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।'

গোপীনাথ বলিল, 'সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।'

গিরিবালা বলিল, 'তবে আমি চাবি দিব না।'

গোপী বলিল, 'দিবে না বৈকি। কেমন না দাও দেখিব।' বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল, চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙিয়া খুলিল—তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে ; চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া, গদি উঠাইয়া, আলমারি

ভাঙিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল। গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া, দরজা ধরিয়া, ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গরগর করিতে করিতে আসিয়া বলিল, 'চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।' গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই চৈত্রমাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব, এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া এই অতুল রূপযৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া, সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনি মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না ; পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোনো সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোনো সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, 'আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।' তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলে নিষেধ করিল ; কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না, কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এ দিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কতদিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান্ধর্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে 'মনোরমা' নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং স্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক-একদিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখনো নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীনরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কী এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনো নটীকে গুরুতর প্রহার করিল। তাহার চীৎকারে এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সেদিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব হইতে নূতন নাটক 'মনোরমা'র অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা শহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে ; রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল ; তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীনবেশে দাসীর মতো তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে—প্রচ্ছন্ন বিনম্র সংকুচিতভাবে সে আপনার কাজকর্ম করে—তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোনো এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তখন দেখিতে পাইল—এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই। আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে—তাহার নিরুপম সৌন্দর্য আভরণে ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণে গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে

গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'গিরিবালা' 'গিরিবালা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ ইংরেজিতে বাংলায় 'দূর করে দাও' 'বের করে দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, 'আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।'

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

ল্যাভেন্ডার

অন্নদাশঙ্কর রায়

১

সন্ধ্যাবেলাটা বেশ আনন্দে কাটল। ভদ্রলোক স্বয়ং ইংরেজী গান গেয়ে শোনালেন। হাসির গান, কিন্তু নিছক হাসির নয়। ফল্গু ধারার মতো প্রচ্ছন্ন ছিল একটা করুণ মধুর সুর। আর তাঁর স্ত্রী শোনালেন সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'মায়ার খেলা' তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রথম বয়সে। তারই অবিস্মরণীয় অবশেষ। আর তাঁর দুই কন্যা শোনালেন মীরার ভজন। দিলীপকুমারের ঢঙে। মাতানো গানে 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'। মনে মনে আমিও তাঁদের সঙ্গে মিলে গেলুম।

দেশবন্দনার রেশ যখন নিঃশেষ হয়ে এলো তখন আমি ধীরে ধীরে বিদায় নিতে উঠলুম। এসে ছিলুম তাঁদের ওখানে, কল' করতে।

তার পরে তাঁরা চার জনে মিলে গাইলেন অতুলপ্রসাদের গান-পরিচয় দিতে ও নিতে। ভদ্রলোক ওখানকার কলেজের প্রিন্‌সিপাল। আর আমি ভ্রাম্যমাণ ভ্যাকেশন জজ।

"সে কী! আপনি খেয়ে যাবেন না?" বললেন ভদ্রমহিলা। "আপনার জন্যে সমস্ত তৈরি।"

আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কিন্তু ওদিকে সারকিট হাউসে—"

"আমি আগে থাকতে বারণ করে পাঠিয়েছি।"

শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমার হাঁড়ির খবর বার করেছিলেন। আমি যে নিরামিষ খাই তাও তাঁর অজানা নয়। আমার কোনো অজুহাত খাটল না। বসতেই হলো আবার।

খাবার টেবিলে দেখলুম ভদ্রলোক খোশগল্পের রাজা। মন্টোগোমরী কী বলেছিলেন চার্চিলকে। চার্চিল কী বলেছিলেন তার উত্তরে। এসব তো শুনতে হলোই, তার উপর শুনতে হলো স্টালিন কেমন হারিয়ে দিয়েছিলেন চার্চিলকে ভোজন-প্রতিযোগিতায়। সে ভারী মজার কথা। তাঁর মতো রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারব না তো, গল্পটা মাটি করব। থাক, বলব না।

আহারান্তে অমনি চলে যেতে নেই, একটু দেরি করতে হয়। বসবার ঘরের এক প্রান্তে বিশাল বুক্‌শেল্‌ফ্‌ ছিল। সেখানে গিয়ে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। ইংরেজী ও ফরাসী বই বেশীর ভাগ। কত কালের পুরোনো বই। আজকাল সে-সব বই দেখাও যায় না। দেখতে দেখতে একখানা বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ল্যাভেন্ডারের পল্লব। শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। হাত দিলে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার হাতে ল্যাভেন্ডারের পল্লব পড়তে যাচ্ছে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠল। অপ্রস্তুত হয়ে নামিয়ে রাখলুম বইটা। অমনি তিনি ওখানা সরিয়ে রাখলেন একেবারে নাগালের বাইরে। একটা টুলের সাহায্যে।

হঠাৎ তাঁর এই ব্যবহারে আমি হতভম্ব হয়েছিলুম। তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার দুটি হাত ধরে মাফ চাইলেন। তখন তাঁর দুই চোখের চাউনি যা হলো তা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কী যে করুণ আর কাতর আর তৃষিত! আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "আপনি এখনো যুবক। দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে আপনার সামনে। আর আমি বিগতযৌবন। আমার জীবনও তো শেষ হয়ে এলো।"

কেন ও কথা বললেন ভাবছি। তিনি বলতে লাগলেন, "আমার জীবনে যা গেছে তা গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। ওই যে ল্যাভেন্ডার ও যদি ধুলো হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায় তা হলে আর এ-জীবনে ল্যাভেন্ডার উপহার পাব না।"

এবার মার্জনা চাইবার পালা আমার। বললুম, "আমাকে ক্ষমা করবেন। বুঝতে পারিনি। না বুঝে অপরাধ করেছি।"

"না, না, অপরাধ কিসের! বলতে গেলে আমারই অপরাধ, আমি ওটা অতিথির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি। ক্ষমা করবেন তো!" রুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন করলেন।

আমি তাঁর স্ত্রীর কাছে বিদায় চাইলুম। ভদ্রমহিলা কফি তৈরি করছিলেন। শুনতে পাননি আমাদের কথাবার্তা। তাঁর হাত থেকে কফির পেয়ালা নিয়ে দু'এক চুমুক দিয়ে শুভরাত্রি জানালুম। তাঁকে ও তাঁর কন্যাদের। ভদ্রলোকের দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, "চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।"

এগিয়ে দিতে গিয়ে তিনি আমার সঙ্গে সারকিট হাউস পর্যন্ত হাঁটলেন। বেশী দূর নয়, তা হলেও প্রত্যাশার বাইরে। সারকিট হাউসে পৌঁছে আমি বললুম, "বেয়াদবি মাফ করবেন। সারা সন্ধ্যা মনে হচ্ছিল আপনার মতো সুখী কে! কিন্তু সেই ল্যাভেন্ডারের ঘটনার পর অন্য রকম মনে হচ্ছে। ওটা না ঘটলেই ভালো হতো।"

তিনি একটু বিশ্রাম করবেন বলে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "সুখ অনেক

রকম আছে। এক রকম সুখ আজ আপনি দেখলেন। সত্যি তার মতো সুখ নেই। কিন্তু সেও তার মতো নয়। সেই ল্যাভেন্ডার উপহার পাওয়ার মতো।"

আমি তাঁকে একটু উস্কে দিলুম। তিনি বললেন, "শুনবেন নাকি ও কথা?"

তিনি এক গ্লাস জল চেয়ে নিলেন। জল রইল তাঁর হাতের কাছে। মাঝে মাঝে ভিজিয়ে নেন আর গল্প বলেন।

২

দু'চোখ বুজে দুই চোখের উপর দুই হাত রেখে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে বসলে প্রথমটা সব অন্ধকার দেখায়। তার পরে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ফুটে ওঠে সাঁঝের শুকতারা। সাঁঝের শুকতারার মতো শুভ্র সুন্দর একখানি মুখ। শুভ্র সুন্দর শুচি। অন্ধকারে ঐ একটি মাত্র তারা।

তার সঙ্গে আমার দেখা হয় পঁচিশ বছর আগে। লণ্ডনে তখনকার দিনে আমাদের বাঙালী সমাজের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বেলসাইজ পার্কে মিস্টার ও মিসেস তরফদারের বাড়ী। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা রিসিভ করতেন। সকলে অবশ্য সব শনিবার যেত না। কিন্তু অন্য কোথাও এনগেজমেন্ট না থাকলে আমি অন্তত আধ-ঘণ্টার জন্যে হাজিরা দিয়ে আসতুম।

এমনি এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার দেখা। মিস তরফদারের বান্ধবী বলে তার পরিচয়। শুনলুম বেডফোর্ড কলেজে পড়ে। শনিবারটা প্রায়ই তরফদারদের সঙ্গে কাটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তার মেয়াদ। সাধারণতঃ ছ'টার মধ্যে ফিরে যায়। কিন্তু সেদিন কী জানি কেন আটটা পর্যন্ত আটকা পড়েছিল।

আমি উঠছি দেখে মিসেস তরফদার বললেন "বরুণ, তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি? কিছু মনে করবে না তো?"

"কাজ দেবেন, সে তো আমার সৌভাগ্য, মাসিমা। কিছু মনে করব কেন।"

"তা হলে শোন। এই যে পূরবী দেখছ একে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আজ এর খুব দেরি হয়ে গেছে। তুমি যদি দয়া করে পৌঁছে দাও তো—"

"চিরকৃতজ্ঞ হবেন তো? আচ্ছা, আমি এই সুখকর কর্তব্য স্বীকার করছি।"

সেখানে আরো কয়েক জন গ্যালাণ্ট যুবা ছিল। তারা কেবল ফষ্টি-নষ্টি করতে জানে, কিন্তু হাতের তাস ফেলে একজনও উঠবে না। বসে বসে দু'কথা শুনিয়ে দিল আমাকে। আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে পূরবীকে তার ফারকোট গায়ে দিতে সাহায্য করলুম ও বাইরে যাবার জন্যে দরজা খুলে ধরলুম।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল মনে আছে। ছাতা ছিল আমার সঙ্গে। তুলে ধরলুম ওর মাথায়। ওর ছাতা ও সঙ্গে আনতে ভুলে গেছল। ফিরে গিয়ে নিয়ে আসবার মতো সময় ছিল না। বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশনে ওকে ধরতে হবে।

স্টেশনে পৌঁছে পূরবী বলল, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এটুকুরও দরকার ছিল না। তবে আপনি এই দিকে আসছিলেন বলে মাসিমা আপনাকে এ কাজ দেন। তাঁর মতে লণ্ডনের রাস্তায় বিদেশিনী মেয়েদের একা চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয় এত রাত্রে।"

আমি বললুম, "মাসিমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে বেশী।"

সেদিন আমি ওকে বেডফোর্ড কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিলুম। পথে ওর সঙ্গে কত রকম কথাবার্তা হলো। ভারী ভালো লাগল ওর সঙ্গ, ওর স্বভাব। আমার ধারণা ছিল আমাদের দেশের সুন্দর মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ে যাদের হয় না তারাই বেশী লেখাপড়া করে ও তাদের কেউ কেউ বিলেত পর্যন্ত আসে। কিন্তু পূরবীকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেল। সে ডানাকাটা পরী না হলেও তার রূপ দু'দণ্ড চেয়ে দেখবার মতো।

সেদিন বাসায় ফিরে গিয়ে সারা রাত তার কথা ভেবেছি ও তাকে স্বপ্ন দেখেছি। মনে হয়েছে তার সঙ্গে আমার আলাপ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আছে এর পিছনে গ্রহতারার চক্রান্ত। নইলে কেনই বা সে আটটা অবধি আটকা পড়বে, এত লোক থাকতে আমাকেই বা কেন তার পার্শ্বরক্ষী হতে হবে? অদৃষ্ট আমাদের দু'জনকে একসূত্রে গাঁথতে চায়। তা ছাড়া আর কী এর ব্যাখ্যা।

পরের শনিবারের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে কেমন করে যে সাতটা দিন পার করে দিলুম তার হিসেব নেই। একটু সকাল সকাল গিয়ে দেখি যাবার জন্যে পূরবী তৈরি হয়ে বসে আছে। মাসিমা বললেন, "বরুণ, তোমার কথাই হচ্ছিল। কিন্তু আজ আর তোমাকে কষ্ট দেব না। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো, একটু কিছু খাও। জিতেন সঙ্গে যাক পূরবীর।"

"না ; মাসিমা, কাউকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। এই তো সবে ছ'টা বাজল।" পূরবী একাই যেতে উদ্যত।

এক খাব্‌লা চীনে বাদাম মুখে পুরে এক রাশ চকোলেট পকেটে ভরে হাঁউমাউ করে আমি বললুম, "আমার খাওয়া হয়েছে, মাসিমা। আমিই যাচ্ছি এর সঙ্গে।"

জিতেন তো আমার দশা দেখে হেসে ফেলল। রুমাল দিয়ে আমার দুটো হাত বেঁধে বলল, "চলো, তোমাকে পুলিশে দিয়ে আসি বমাল সমেত।"

মাসিমা বললেন, "বমাল মানে কি চকোলেট না—" পূরবীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

কয়েক শনিবার পরে পূরবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর পাঁচ জনে মেনে নিল। পূরবী আমার গার্ল, আমি তার beau ; আমাদের বিয়ে হবে একদিন-না-একদিন। উৎসাহ এল মাসিমার কাছ থেকে। কিন্তু পূরবী এ বিষয়ে নীরব। সে কিন্তু আমার সঙ্গেই মেশে সব চেয়ে বেশী, আমার সঙ্গে থিয়েটারে যায়,

বাসের উপর তলায় বসে শহরে বেড়িয়ে আসে। অথচ আমার সঙ্গে এমন একটা দূরত্ব রেখে চলে যে আমি অবাক হয়ে যাই তার ব্যবহার দেখে। আর পাঁচ জনে আমাকে মনে মনে হিংসা করছে, কিন্তু আমি কি তাদের হিংসার যোগ্য!

ভেবেছিলুম পূরবীকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব, আমার সঙ্গে এনগেজমেন্ট সম্বন্ধে তার কী মত। কিন্তু কিছুতেই ও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোলো না। শেষে একখানা চিঠি লিখে সাত পাঁচ ভেবে ডাকে দিলুম।

জীবনে সেই আমার প্রথম প্রেমপত্র। তাতে ওকে কী বলে সম্বোধন করেছিলুম, শুনবেন? এঞ্জেল বলে। বলা বাহুল্য চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা।

পূরবী তার উত্তরই দিল না।

পরে যেদিন দেখা হলো জানতে চেয়েছিলুম চিঠিখানা তার হাতে পড়েছে কি না। ওর মুখখানা আরক্ত না হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, "তুমি কি জানতে না যে আমি হস্‌টেলে থাকি? আর কখনো অমন কাজ করো না।"

প্রথম পত্রের এই পরিণামের পর দ্বিতীয় পত্র লিখতে আমার সাহস হয়নি। কাজ কী এনগেজমেন্টের প্রসঙ্গ তুলে? বাক্যে না হোক, কার্যে কি আমরা এনগেজ্‌ড নই? পূরবী আমায় বাক্য দেয়নি, আমিও দিইনি তাকে। কিন্তু আমরা তো পরস্পরের মন বুঝি। তবে আর কী? লোকটা আমি কৃত্রিমতার পক্ষপাতী নই।

এনগেজ্‌ড না হয়েই আমরা এনগেজ্‌ড বলে বন্ধুমহলে গৃহীত হলুম। তবে নিজেদের কাছে ঠিক এনগেজ্‌ডের অধিকার পেলুম না। চুম্বন করতে গিয়ে অদৃশ্য বাধা বোধ করেছি। এঞ্জেলকে চুম্বন করতে সাহস হয়নি। যদি সে কিছু মনে করে। যদি বলে, "আমি কি এতই সুলভ? আমাকে তুমি কী পেয়েছ?"

আপনাকে খুলে বলতে দোষ নেই। আমাদের ভালবাসা সম্পূর্ণ প্লেটোনিক। তা বলে কম সত্য বা কম গভীর নয়। তাকে না দেখতে পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত। দেখা হলে প্রাণ ফিরে আসত। তার চোখে মুখে যা লক্ষ্য করেছি তা আমার সঙ্গ পেয়ে সহজ আনন্দ। সে আর কারো দিকে ফিরেও তাকাত না। আমার চোখে চোখ পড়লে তার চোখের তারা জ্বলে উঠত। অনেক সময় ভেবেছি এ কি প্রেম, না এক প্রকার বন্ধুতা? কিন্তু পরীক্ষায় ফেলে দেখেছি প্রেমই বটে। একবার বেলসাইজ পার্কে যাইনি। সে ছুটে এসেছিল হাইগেটে আমার বাসায় আমার খোঁজ নিতে।

তখনকার দিনে মেলামেশা অত অবাধ ছিল না। সেইজন্যে আমার বাসায় তার ছুটে আসা বলতে কতখানি ত্যাগস্বীকার ও বিপদবরণ বোঝায়, তা একালের ছেলেমেয়ের কল্পনার অতীত। আমার ল্যান্ডলেডী তো স্তম্ভিত। পরে আমাকে বলেছিল, "মেয়েটি দেখছি মরিয়ার মতো প্রেমে পড়েছে তোমার। আহা! কী মধুর মেয়েটি!"

ও আমার জন্যে একটা স্কার্ফ বুনে উপহার দিয়েছিল, সেটা ল্যান্ডলেডির নজর এড়ায়নি। বুড়ি বলল, "এর মতো উপহার তোমার কী আছে দেবার? বাজার থেকে কিনে দিতে যে-কোন লোক পারে।"

বললুম, "আমি তো বুনতে জানিনে। আঁকতেও জানিনে ছাই। আমি আর কী দিতে পারি?"

বুড়ি বলল, "তুমি তো বেশ রাঁধতে পারো দেখি। রেঁধে খাওয়াও না কেন ওকে?"

চমৎকার আইডিয়া। পরের শনিবার নিমন্ত্রণ করলুম পূরবীকে। সে খুশি হয়ে এলো। এখন থেকে প্রায় শনিবার ওর নিমন্ত্রণ মধ্যাহ্ন ভোজনের। তারপরে মাসিমার ওখানে। রান্নাটা অবশ্য একতরফা নয়। সেও যোগ দিত। কী যে আনন্দ পেয়েছি সেই কয়েক মাস! যতই ওর সঙ্গে মিশতে পাই, ততই বুঝতে পারি ওর সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে সারা জীবনটা কেটে যাবে কয়েকটা মাসের মতো।

পূরবী কিন্তু বিয়ের কথা ভুলেও মুখে আনে না। কথা উঠলে এড়িয়ে যায়। আমি যদি বলি, আমাদের দু'জনের এই আনন্দকে জীবনব্যাপী করতে হলে বিয়ে না করে উপায় কী, সে বলে, আচ্ছা বিয়ে-পাগলা বুড়ো যা হোক।

কিছুদিন পরীক্ষা নিয়ে মহা ব্যস্ত ছিলুম। দেখা হয়নি। পরীক্ষার পরে তরফদার মাসিমা বললেন, "এবার তো দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো তোমার। তার আগে একটু ঘোরাঘুরি করবে না?"

আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। কন্টিনেন্ট ঘুরতে চাই। কিন্তু পূরবী কি যেতে রাজী হবে? সে না গেলে আমি কী করে যাই? তার কাছাকাছি থাকতে হবে যে। পূরবীর পড়া আর এক বছর বাকী। সে আপাতত দেশে ফিরছে না। একা ফিরতে হবে আমাকেই। সেইজন্যেই এই দুটি মাস তার কাছাকাছি থাকা এত জরুরি। কন্টিনেন্টে বেড়ানো অবশ্য আমার অনেক দিনের শখ। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা যদি বেছে নিতে হয় তবে পূরবীর কাছাকাছি থাকা আরো জরুরি।

পূরবীর কানে গেল এ কথা। সে বলল, "বুড়ো, এ তোমার নতুন এক পাগলামি। আবার কবে এ দেশে আসবে! হয়তো এ জীবনে নয়। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে পস্তাবে। যাও, কন্টিনেন্ট দেখে নাও।"

ভয়ে ভয়ে বললুম, "তুমি যাও তো আমি যাই।"

সে হাসল। "পড়োনি রবি ঠাকুর কী লিখেছেন? পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।"

পড়েছি। সত্যি, গুরুদেব যদি আর কিছু না লিখে শুধু ঐ একটি পঙ্‌ক্তি লিখে থাকতেন তা হলেও তাঁকে নেবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত হতো। ঐ একটি উক্তির দাম লাখ টাকা। আমার পকেট তখন গড়ের মাঠ। ধারকর্জ করে কোনো মতে একজনের কন্টিনেন্ট বেড়ানো চলে। দু'জনের জন্যে কার কাছে হাত পাতি?

ও যে আমাকে পতি বলে স্বীকার করে নিল এর জন্যে আমার আনন্দের সীমা রইল না। ওর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখলুম আনন্দটা পারস্পরিক।

বললুম, "পতির পুণ্যে কাজ নেই। আমি যাব না। শেষ দুটো মাস সীতার কাছাকাছি কাটাব।"

তার দৃষ্টির দীপ থরথর করে কাঁপল। সে বলল, "আমি যাচ্ছি মেরিয়নের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ে থাকতে। তার অতিথি হয়ে। তুমি থাকবে কোথায়?"

তাই তো। আমি থাকব কোথায়? আর থাকতে ভালো লাগবে কেন পাড়াগাঁয়ে পাক্কা দু'মাস? ও মেয়েরাই পারে। আমরা পুরুষ, আমরা সুদূরের পিয়াসী।

চললুম কন্টিনেন্ট বেড়াতে। একা একা ভালো লাগে না, দল জুটিয়ে নিলুম। হৈ হৈ করে আমরা কয়েকজন যুবক আজ এখানে যাই, কাল ওখানে যাই, খরচ বাঁচানোর জন্যে ট্রেনে রাত কাটাই, কিংবা সরাইখানায়, কিংবা হস্‌পিসে। এই জন্যেই বলে 'পথে নারী বিবর্জিতা।' পূরবীকে সঙ্গে আনলে অর্ধেক ফুর্তি বাদ পড়ত, জীবনটা সেই পরিমাপে নীরস হতো। কোথায় কাফে, কোথায় কাবারে, কোথায় চোরডাকাতের আস্তানা। আমি ও আমার খ্রী মাস্‌কেটীয়ার্স মিলে কত বার বিপদের সন্ধানে গেছি, সামনে পড়েছি। দৈবাৎ রক্ষা পেয়েছি। সে ছিল বটে একটা বয়স। সে-সব দিন আর ফিরবে না।

ফ্রান্স থেকে জার্মানী, জার্মানী থেকে অস্‌ট্রিয়া, অস্‌ট্রিয়া থেকে সুইটজারল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড থেকে ইটালী, ইটালী থেকে আবার ফ্রান্স হয়ে ইংলন্ড। পূরবীর জন্যেই ইংলন্ডে ফেরা, নইলে কোনো দরকার ছিল না।

বিদায় নিতে গেলুম ইষ্টবোর্নে। সেখানে সে তরফদারদের অতিথি। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিপ্রদীপ উজ্জ্বল হলো। বলল, "খুব উপভোগ করলে?"

সত্যি খুব উপভোগ করেছিলুম, কিন্তু সত্য গোপন করাই বোধ হয় সুবুদ্ধি। বললুম, "কই আর উপভোগ করলুম! তুমি ছিলে না।"

সে হেসে বললে, "কথাটা পতির মতোই হলো। আদর্শ পতির।"

ধরা পড়ে গেলুম। সাফাই মুখে জোগাল না। বললুম, "তুমি কিন্তু শুকিয়ে গেছ।"

সে ঈষৎ কুপিত হয়ে বললে, "বরুণ, থাক। পতিগিরি যথেষ্ট হয়েছে।"

সমুদ্রের ধারে বসে দু'জনে দু'জনকে হৃদয় খুলে দেখিয়েছিলুম সেই একদিন। গোধূলি যেন ফুরোতে চায় না। শরৎ গোধূলি।

বললুম, "পূরবী, তোমার উপরে নির্ভর করছে আমার জীবনের সুখ সার্থকতা। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না কর তা হলে যে আমি বাঁচব না তা নয়, কিন্তু জীবনে আমার সুধা থাকবে না। সুধার বদলে থাকবে সুরা। হৈচৈ, উত্তেজনা, নিজেকে মাতিয়ে রাখা, তোমাকে ভুলে থাকা। যে ভাবে এই দু'মাস কাটল।"

সে অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তারপর ক্ষীণস্বরে বলল, "তুমি বিয়ে করোনি,

বিয়ের ভিতর দিয়ে যাওনি, তাই বিয়ে তোমার কাছে একটা সুখস্বপ্ন। আমার কাছেও একদিন সুখস্বপ্ন ছিল। এখন কিন্তু দুঃস্বপ্ন।"

আমি চমকে উঠলুম। এ কী শুনছি! তা হলে কি সে বিবাহিতা!

"হাঁ, যা ভেবেছ। এত দিন তোমাকে বলিনি। বলার সময় আসেনি। আজ না বললে নয়। আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে, বিয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। চাও তো সব খুলে বলতে পারি, কিন্তু কী হবে ইন্নৎ ঘেঁটে! জেনে নাও যে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেছে। যা দেখেছি তার থেকে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে বিয়ের পরে মানুষের পতন হয়। দু'বছর পরে এক দিন হিসাবনিকাশ করে দেখলুম আমি ছোট হয়ে গেছি, আমার স্বামী আমার চেয়েও ছোট। তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে এলুম এ দেশে। কিছু স্ত্রীধন ছিল। পড়াশুনা করছি, পাশ করলে চাকরি পাব আশা করি। স্বামীকে অনুমতি দিয়ে এসেছি আবার বিয়ে করতে। তিনি করেছেনও।"

হতবাক হয়ে শুনছিলুম। এ কি সত্য, না আমাকে ভোলাবার জন্যে স্তোকবাক্য! সোজা বললেই পারে আমাকে বিয়ে করতে তার ইচ্ছা নেই, আমি তার অযোগ্য। কিন্তু এসব বানিয়ে বলা কেন? আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ?

"বিয়ে করে থাকলে তোমার নাম হতো মিসেস অমুক। কিন্তু তা তো নয়। মিস চৌধুরী তোমার নাম।"

"সেটা আমার কুমারী অবস্থার নাম। ইউনিভার্সিটির কাগজপত্রে সেই নাম ছিল। এখানে নাম লেখবার সময় কাগজপত্র বদলাইনি। সহপাঠিনীরা জানে আমি মিস চৌধুরী। মণিকা সেই নাম তার বাড়িতে প্রচার করে দিয়েছে। সকলে সেই নামে ডাকে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তার প্রতিবাদ করিনি। কেনই বা করব? বিয়ে তো আমার চুকে গেছে। আমি তো আর বিবাহিতা নই।"

কান্না আমার বুকে আছাড় খাচ্ছিল। আর একটু হলে চোখের বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। একরাশ বিদেশীর সুমুখে কান্নায় গলে যাব, আমি কি এতই নরম!

মূকের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম তার মুখে। সে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি, ঠকাইনি। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসা আমাদের উন্নত করেছে। হিসাবনিকাশ করলে দেখবে তুমি ও আমি কেউ কাউকে ছোট করিনি, ছোট হইনি। দু'জনেরই উচ্চতা বেড়ে গেছে।"

আমি তা স্বীকার করলুম। কিন্তু আমার আকাশজোড়া কেল্লা যে ধ্বসে গেল। একটা দিনের একটা মুখের কথায় এত বড় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হবে! এটা কেমন করে মেনে নিই! ক্ষোভ আর অভিমান আমাকে বিদ্রোহী করেছিল।

"তুমি যদি চাও," সে তার অমিয়মাখা সুরে বলতে লাগল, "তবে আমাদের

এখনকার এই সম্বন্ধ চিরদিনের হতে পারে। আমিও বিয়ে করব না, তুমিও বিয়ে করবে না। এই ইংলন্ডেই কাজকর্ম খুঁজে নেব দু'জনে। এমনি কাছাকাছি থাকব। এমনি ভালোবাসব। এর চেয়ে মধুর সম্বন্ধ আর কী হতে পারে! কিন্তু আমি তোমাকে বলব না একে চিরন্তন করতে। আমি জানি তুমি দুখস্বপ্ন দেখছ। আমাকে ঘিরে ততটা নয় বিয়েকে ঘিরে যতটা। যাও তবে, বিয়ে করো একটি মনের মতো মেয়ে। সুখী হও। আমার অন্তরের প্রার্থনা তুমি সুখী হও।"

এর পরে আমাদের বিদায়। বিদায়ের দিন সে আমাকে একখানি বই উপহার দেয়, কবিতার বই, ক্রিস্টিনা রোজেটির। তাতে গোঁজা ছিল একটি ল্যাভেন্ডারের পল্লব।

৩

গল্প শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। জানতে চাইলুম, "তার পরে?"

"তার পরে?" ভদ্রলোক কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। "তার পরে আমি সুখী হলুম, সফল হলুম। দেখছেন তো কেমন সুখী পরিবার আমার? চাকরিটাও সুখের চাকরি। দেদার বই কিনি আর পড়ি। গান শুনি আর করি। ছেলেরা মাঝে মাঝে দিক করে। ধর্মঘটের ভয় দেখায়। আমিও ভয় দেখাই ইস্তফার। আমার দিন তো প্রায় হয়ে এলো। সামনের বছর রিটায়ার করছি। কোথায় বসব, বলতে পারেন? কলকাতায় যা ভিড়।"

রাত হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় ঘড়ি দেখছেন। শুধু একটি জিজ্ঞাসা ছিল। পূরবী দেবীর কী হলো?

"বিলেতেই রয়ে গেল। এখনো সেইখানেই আছে। বড়দিনের সময় কার্ড পাঠাই, কার্ড পাই।"

(১৯৫২)

—

চরিত্রহীন

আশাপূর্ণা দেবী

এখন? এই বয়সে?

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সত্যিই কি মানুষের বাসনার শেষ নেই? নেই অসংযমের মাত্রা? চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

মনে মনে বয়সটার—একটা মোটা হিসেব করে নিয়ে আন্দাজ করলাম রাখাল-মামার বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। সেই রাখালমামা—এখনও! আশ্চর্য!

বিদেশে থাকি, কালে-কস্মিনে কলকাতায় আসি, তাও সামান্য ছুটিতে। নিকটতম আত্মীদের খবর নিতেই সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারি না, তা জ্যেঠতুতো! পিসতুতো! রাখালমামা এ যাবৎ বেঁচে বর্তে পৃথিবীর অন্ন ধ্বংসাচ্ছেন কিনা তাই জানতাম না, অন্য খবর ত দূরের কথা। রাখালমামার ছেলে নীতুদা আজ আমার মার কাছে দুঃখগাথা গাইতে এল বলেই শুনলাম। আর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

বাল্যকাল থেকে শুনে এসেছি বটে রাখালমামার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, বৌ, ছেলেসংসার সব থাকতেও নাকি একটি উপসর্গ আছে তাঁর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার উপসর্গটি আর কোথাও নয়, দেশ ভিটেয়। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত যাই হোক, পৃথিবী উল্টে গেলেও তিনি যে রবিবারে দেশে যান, সেটা ভিটের টানেও নয়, পিসি খুড়োর টানেও নয়, সেই 'লক্ষ্মীছাড়া মাগী'র টানে।

তখন আমরা বালক বলে যে আমাদের কান বাঁচিয়ে কোনও কথাবার্তা হত এমন মনে পড়ে না। কাজেই তখনই আমরা জেনে ফেলেছিলাম রাখালমামা খারাপ লোক।

কিন্তু সে কি এ যুগের কথা?

এই যুগ-যুগান্তর পরে আবার কিনা কানে এল রাখালমামা সেই লক্ষ্মীছাড়া মাগীর টানে—

না, এখন বুড়ো বয়সে আর হপ্তায় যাওয়ার ক্লেশ সহ্য হয় না, তাই দেশের

বাড়িতেই বসবাস করছেন রাখালমামা!

ছেলেরা কলকাতায় নিয়ে আসবার জন্যে সহস্র সাধ্য সাধনা করছে, নড়িয়ে আনতে পারছে না তাঁকে।

ছুতোরও অভাব নেই রাখালমামার।

মাথা খুব পরিষ্কার।

ছুতো হচ্ছে, এই বয়সে আর কলকাতায় ভাড়াটে বাড়িতে 'গুড়ের নাগরী ঠাসা' হয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। পাজী, বদ নাতি-নাতনীগুলোর দৌরাত্ম্য সহ্য করতে। সারাদিন বৌদির কলহ কচকচিও তাঁর অসহ্য।

তাছাড়া, ছেলেদের প্রশ্ন করেছেন রাখালমামা, 'পারবে তোমরা, আমার শরীর, স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যা দরকার তার জোগান দিতে?'

কি উত্তর দেবে ছেলেরা? 'হ্যাঁ পারব' বলবে কোন ভরসায়? বয়স হয়েছে বলে শরীর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যে রাখালমামার অনেক কিছু চাই। চাই একসের করে খাঁটি দুধ, নিত্য ভাতের পাতে ছটাকখানেক করে সরতোলা গাওয়া ঘি, দুবেলা সদ্য মাঠ থেকে তোলা টাটকা শাক, পাতা, ডাঁটা, প্রতিদিন তাজা চারাপোনার ঝোল আর বাটি ভর্তি চুনো মৌরলার টক। এছাড়া আর যাই হোক, এগুলো অবশ্যই চাই। এইরকম নিয়ম যত্নে থাকতে পারলে নাকি আরও পনের বিশটা বছর হেসে-খেলে, হেঁটে-ছুটে বেঁচে থাকতে পারেন রাখালমামা।

আর, বাঁচতেই চান তিনি?

কলকাতায় কি পয়সা ফেললেই এ-সব মেলে? এখন অবশ্য গ্রামে ঘরেও আগের মত কিছুই নেই তবু কিছু আছে। প্রচুর না মিলুক সামান্যও মেলে, যদি চেষ্টা যত্ন থাকে।

কিন্তু সে চেষ্টা করে কে?

'কে আর'! নীতুদা ক্ষুব্ধ বিরক্তিতে বলে, 'সেই তিনিই। আমরা ত বলতে গেলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। নেহাত মাসকাবারি টাকা, আর যেবারে যা ফরমাশ থাকে সেই সব নিতে মাসে একবার করে—'

'টাকা বন্ধ করে দিতে পারিস না?' আমার মা বীরাঙ্গনা বিক্রমে বলে ওঠেন, 'তা হলে কেমন না সুড়-সুড়িয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন দেখি?'

নীতুদা হতাশভাবে বলে, 'তাই কী হয়?'

'হবে না কেন?' মা পুনরায় উদ্দীপ্ত, 'তোরা বলবি—আমরা ছাপোষা, মোট মোট নগদ টাকা যাদি দিতে না পারি? একসঙ্গে থাকো, খাও দাও ব্যাস।'

'তাহলে আবার তোমরাই বলবে, কি কুলাঙ্গার ছেলেরা গো! বুড়ো বাপকে খেতে দেয় না।'

'কেউ বলবে না।' আবার স্বগতোক্তি করেন মা, 'বাপ বাপের মত হয় তো, মাথায় করে রাখবে ছেলেরা, বাপ অছেদ্দার কাজ করলে আবার মান্য কি?'

নীতুদা মলিন মুখে বলে, 'সে আর কে বুঝবে? বরং সকলেই ভাবে বৌরা বুঝি বুড়ো শ্বশুরের ঝামেলা পোহাতে রাজি হয় না, তাই ছেলেরা বাপকে বনবাসে দিয়েছে। এর ওপর আবার টাকা বন্ধ!'

'কিন্তু এত বাড়াবাড়িটা হল কবে?' মা বলেন, 'এ রোগ ছিল চিরকালই জানি, সুশীলাদি ত গ্রাম সম্পর্কে আমাদের বোন হয়, দেখেছি বরাবর! হাসাহাসিও করেছে সবাই, কিন্তু এত এমন বেহেড্‌পনা ছিল না। ওই রাখালদা রবিবারে রবিবারে বাড়ি যেত, দেখাসাক্ষাৎ গল্প-গুজব করত, এই পর্যন্ত। তবে মাস মাস খরচাটি দিয়েছে সুশীলাদিকে।'

ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে বলি, 'তা তখনকার দিনে তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজ এসব অ্যালাউ করত? সুশীলাদির বাপ-মা রাগ করতেন না?'

'বাপ-মা কোন চুলোয়? জ্ঞানের আগে সব খেয়ে ত কাকা, খুড়ির সংসারে ভর্তি। তা ছেলেবেলায় নিত্যি খুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বলত, 'কাজে নেই গেলায় আছ, দেব না ভাত। এর-ওর দোরে গিয়ে দাঁড়াত মুখ শুকিয়ে। লোকে মায়া-দয়া করে দুমুঠো ভাত দিত। সবই ত জ্ঞাত-গোত্তর!'

'শ্বশুর বাড়ি?'

'সেখানেও তেমনি। যেমন কপাল জোর! কাকা-খুড়ি একটা বর জোগাড় করে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করেছিল। ছ' মাসের মধ্যে তাকে শেষ করে আবার সেই কাকা-খুড়ির ঘাড়ে। তাদেরই বা ভাল লাগবে কেন? নিত্য খিটিমিটি। সেই সূত্রেই দয়া উথলে উঠল রাখালদার। বলল, 'শুধু একবেলা এক মুঠো ভাতের জন্যে এত লাঞ্ছনা। আমি দেব সুশীলার ভাত খরচা।' তখন রোজগার করত ভাল, সদাগরী আপিসের বড়বাবু ছিল, দয়ার মেজাজ দেখাবার মুরোদ ছিল। তা সেই দয়া দেখানোই 'কাল' হল! সুশীলাদি একেবারে গলে গেল, মাখামাখি বেড়ে উঠল। কাকা গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দিল বিধবা মেয়ের রীত চরিত্তির দেখে। আমার অবিশ্যি এ সব শোনা কথা, স্পষ্ট মনে নেই। তবে আমরা সুশীলাদিকে দেখেছি বাপের ভিটেয় একখানা ভাঙা ঘরে পড়ে থেকে, আর রাখালদার পয়সায় খেয়ে গাঁ সুদ্ধ লোকের কাজ করে বেড়াত। অসীম গতর, যার ঠেকা পড়ে, সেই ডাকে 'সুশীলা!' কিন্তু এ বিষয়ে এতটা বেপরোয়া—'

নীতুদা বাধা দিয়ে বলে, 'এতটা হয়েছে মা মারা গিয়ে অবধি। মাও গেলেন, বাবার চাকরিও গেল—'

'চাকরি গেল!'

'ওই যে অফিসে নতুন ফ্যাসন হল বুড়ো বিদেয় কর।' অথচ বাবা তখনও ওই ষাট বছরেও দুটো জোয়ান লোকের খাটুনি খাটতে পারতেন। কিন্তু সে যাক, গেল। আর যেতেই অমনি বাবা ধুয়ো ধরলেন, 'অফিস যেতাম সারাদিন, এক

রকমে কেটেছে, এত আঁট সাঁটে থাকতে পারব না।'

আমরা ভাবলাম, 'তা মন্দ কি, বৌরা ত রাত-দিন 'বাবা এই বললেন, বাবা তাই বললেন, বলে অশান্তি করছে, দেশে গিয়ে থাকতে পারেন দুপক্ষেরই ভাল। চার ভাই পনের টাকা করে দেব, উনি স্বপাকে খাবেন, আর পুরনো মুনেষের ছেলেটা কাজ-কর্ম করে দিয়ে যাবে, এই ব্যবস্থা! বাবার ত খুব উৎসাহ খুব স্ফূর্তি। তখন কি জানি এইসব অসভ্যতা হবে? পরের মাসেই গিয়ে দেখি রান্নাঘরে সুশীলা পিসি! বুঝুন, দেখে মনের অবস্থা কি হল! এ সব জানতাম বরাবরই, কিন্তু একেবারে এরকম প্রকাশ্যে! কৈফিয়েৎ দিলেন—এঁরও হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া কষ্ট, ওঁরও নাকি ঘর পড়ে গেছে, থাকার কষ্ট অতএব!'

মা উগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোরা বললি না কিছু?'

'কি বলব বলুন? ওঁদের লজ্জা নেই, আমাদের ত লজ্জা আছে! কিছু না বোঝার ভান করে চলে এলাম। এখনও যাই, একবেলা থাকি, খাই চলে আসি। কিন্তু দেখুন, এই বাজারে সংসার থেকে ষাটটা করে টাকা বেরিয়ে যাওয়া! কলকাতার বাড়িতে থাকলে ত—'

বুঝলাম নীতুদার মূল ব্যথাটা কোথায়।

অতঃপর নীতুদাতে আর মা-তে প্রবল পরামর্শ চলতে লাগল, কি করে এই অবৈধ কাণ্ডের একেবারে কাণ্ডচ্ছেদ করা যায়। ব্যবস্থা হল মা একবার সরেজমিনে তদন্ত করতে যাবেন, এবং সেই যত নষ্টের মূলকে যাচ্ছেতাই করে, আর রাখাল-মামাকে ধিক্কার দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়বেন, সমাজের মধ্যে থেকে এ সব অসমাজিকতা চলবে না। বলবেন, ওই পাপকে বিদেয় না করলে ছেলেরা মাসোহারা বন্ধ করে দেবে। কেনই বা বন্ধ করবে না? তুমি বাপ হয়ে যদি দেশে গাঁয়ে তাদের মুখ দেখানোর পথ বন্ধ করতে পারো, তাদের আর টাকা বন্ধের অপরাধ কোথায়?'

আমি বলি, 'তুমি আবার কেন পরের ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবে মা? যে যা করছে করুক না, তোমার কি?'

মা ধিক্কারে আমাকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুই বলিস কি রে বলু, আমার কি? ভিটেটা আমার বাপ-ঠাকুদ্দার নয়? সেখানে বসে যে যা করছে, করবে? বেটাছেলে বাইরে বাইরে যা করে করুক, ভিটেয় পাপ এনে তুলবে?'

লজ্জার মাথা খেয়ে বলে ফেলি, 'পাপের আর কি? বয়সের ত গাছ-পাথর নেই বাবা!'

মা তাতে দমেন না, বলেন, 'থাম তুই বলু, বয়সের বিচার কি করছে ওরা! এখনও যখন এত ইয়ে, তখন আর—যাক গে তুই পেটের ছেলে কি আর বলব! মোট কথা রাখালদাকে বুঝিয়ে আসব ভিটেয় বসে এত অনাচার চলবে না। লজ্জা নেই? ঘেন্না নেই? ছেলেদের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে ভয় নেই? প্রবৃত্তিকে

বলিহারী!'

শেষ পর্যন্ত আমার স্কন্ধে ভর করেই মার বারুইপুর যাত্রা! নীতুদা যাবেন না, এক্ষেত্রে ছেলেরা মুখোমুখি না হওয়াই ভাল।

কি আর করা!

তবে সত্যি বলতে কি, খুব অনিচ্ছে হচ্ছে না, আমারও কৌতূহল হচ্ছে সেই সত্তর বছরের প্রেমিক পুরুষটিকে দেখতে।

দেখলাম!

আর দেখেই প্রথমটায় মনে হল, সত্যি চরিত্রহীন হলে কি এত নির্লজ্জও হয় মানুষ?

সোজা সতেজ খাড়া দেহ, উজ্জ্বল মুখ, চোখ, যেন প্রসন্নতার প্রতিমূর্তি!

লজ্জা, কুণ্ঠা, দ্বিধা, সঙ্কোচ, কোনও কিছুর বালাই নেই, একেবারে মুক্তপুরুষ। মাকে দেখে ইয়ংম্যানের মত হৈ-হৈ করে উঠলেন, 'আর কে রে! বুলবুলি না? কি ব্যাপার! তুই কোথা থেকে? ঈ—স কতদিন পরে দেখা। বাপ-ঠাকুদ্দার ভিটেটাকে তাহলে মনে আছে এখনও? কেউ আসে না, বুঝলি বুলবুলি কেউ আর দেশে আসে না, দেশ একেবারে 'কানা' পড়ে আছে।'

মা ত এই মুহূর্তেই বলতে পারতেন, 'কেন তুমি ত রয়েছো, দেশ, গ্রাম বংশ সব কিছুর মুখ উজ্জ্বল করে।' অথবা এও বলতে পারতেন 'লোকে আর আসবে কোন সুখে? তোমাদের মত কুলধ্বজারা যেখানে বসবাস করছেন!' বললে কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকত। কিন্তু বললেন না। জানি না—বললেন না, না বলতে পারলেন না। বহুদিন বিস্মৃত 'বুলবুলি' শব্দটা কানে গিয়ে গলাটা ভারি হয়ে এল কিনা! মোট কথা দেখতে পেলাম, মাথা হেঁট হয়ে বেশ পরিপাটি করেই পায়ের ধুলো নিলেন রাখালমামার।

ততক্ষণে রাখালমামা আর একবার হৈ হৈ করে উঠেছেন, 'ওরে সুশীলা, কি তোর ঘোড়ার ডিমের কাজ নিয়ে রান্নাঘরে বসে আছিস? বেরিয়ে এসে দ্যাখ, কে এসেছে। বুলবুলি, আমাদের সেজকাকার বুলবুলি। কি একখানা গিন্নীবান্নী হয়ে গেছে! হ্যাঁরে এই বুঝি তোর বড় ছেলে? সেই এতটুকুনটি দেখেছিলাম। কাজকর্ম কি করে ছেলে?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই গড় গড় করে প্রশ্ন যান রাখালমামা, আর যেন ছুটোছুটি করতে থাকেন। খুশিটা যে যথার্থ আন্তরিক, তা বোঝা যায় ওঁর অস্থিরতায়। আবার হাঁক পাড়েন, 'অ সুশীলা, কানের মাথা খেয়েছিস নাকি?'

ততক্ষণে সুশীলা এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সুশীলা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

এঁর জন্যে একটা মানুষ যুগ-যুগান্ত কাল ধরে সংসারে অশান্তি এনেছে, সমাজে

বদনাম কিনেছে, অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করেছে আর এই জীবনের শেষ ঘাটে এসেও ছেলেমেয়ে, আত্মীয়, প্রতিবেশী সকলের কাছে হেয় হচ্ছে!

কালো রোগা ঢ্যাঙা এক বুড়ি, চুলগুলো ছাঁটা, সামনের দুটো দাঁত পড়া!

সেই দাঁতপড়া মুখে একটু হেসে মাকে সম্ভাষণ করলেন, 'তুই ত ছেলের কাছে বিদেশে থাকিস, তাই না? এলি কবে? ওমা এইটিই বুঝি ছেলে? বিলু না কি যেন ডাকনাম ছিল ছোটবেলায়।'

'বিলু নয়! বলু! বাবা এতও তোমার মনে আছে সুশীলাদি!' বলে দিব্যি অম্লান বদনে, যে 'পাপ'কে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার দৃঢ়-সঙ্কল্প নিয়ে হানা দিয়েছেন, সেই পাপের চরণে প্রাণপাত করলেন মা!

'থাক থাক হয়েছে। আয় বোস। থাকবি ত কিছুদিন?'

'নাঃ থাকব আর কি করে!' মা আক্ষেপ করেন 'ছেলের ত গোনাদিনের ছুটি!'

আরও কিছু হয়ত বলতেন মা, কিন্তু ততক্ষণে রাখালমামা তাড়া দিয়ে উঠেছেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, ওসব কথা পরে হবে, আগে ওদের হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে দিকিন। গল্প একবার জুড়লে ত রক্ষে নেই! বুঝলি বুলবুলি, তোর এই সুশীলাদিটি আজ আর তোকে রাতে ঘুমুতে দিয়েছে। দেখবি তোকে গাঁয়ের এই তিরিশ বছরের ঘটনা কাহিনীর পরিচয় দেবে বসে বসে। জানেও ত সকলের নাড়ি নক্ষত্র।'

অতঃপর অতিথি সৎকারে তৎপর হয়ে উঠলেন রাখালমামা।

কোনও বারণ মানলেন না, প্রচণ্ড রোদ্দুরে নিজে গেলেন মিষ্টি আনতে। কোথায় কোন জেলেনিকে বলে এলেন, যে করে হোক একটু মাছ যোগাড় করে নিয়ে আসতে, আর এসে অনবরত সুশীলাকে তাড়া দিতে লাগলেন, 'তোর হল? দুটো মানুষের রান্না করতে তুই যে বুড়ো হয়ে গেলিরে সুশীলা!'

আমরা যত ব্যস্ত হতে বারণ করি, রাখালমামা ততই আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। একি ঘুষ? না অভিনয়?

কিন্তু মার ব্যাপারটা কি? সেও কি অভিনয়?

দেখছি, আর অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আর মজা এই, একবারও আমার দিকে দৃষ্টিপাত করছেন না মা।

শুনতে পাচ্ছি রান্নাঘরে গল্পের স্রোত বইছে।

সেই তিরিশ বছরের ইতিহাস আওড়ানো হচ্ছে বোধহয়। কত অজস্র নাম কানে আসছে! ভাবছি, কী আশ্চর্য! এই দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তে কাটিয়েও মা বারুইপুরের প্রত্যেকটি মানুষকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করে এসেছেন!

তিরিশ বছরের মধ্যে অবশ্য আমি না এলেও মা এক-আধবার এসেছেন। সেই কথারই উল্লেখ শুনছি মার কণ্ঠে, 'সেবারে যখন এসেছিলাম, সুশীলাদি, মা

গো মা, বাড়ি দেখে যেন কান্না পেয়েছিল। উঠোন ভর্তি আগাছা, দেয়ালের বাড়ির চাপড়া খসে খসে পড়েছে আর ইঁদুর ছুঁচোর উৎপাতে ঘর-দালান একেবারে তচ্‌নচ্‌, রান্নাঘরের উনুন দুটো ভেঙে হুমড়ে পড়ে আছে, তুলসী মঞ্চের গাছটা শুকিয়ে কাঠ, মাগো মা সে কী দৃশ্য! এবারে এসে যেন চোখ জুড়োলো। সেই পুরনো বাড়ি এখন যেন পড়লে সিঁদুর উঠছে। চিরকালের খাটিয়ে মেয়ে তুমি!'

সুশীলাদি কি কোনও মন্ত্র জানেন?

বশীকরণ মন্ত্র!

আর সেই মন্ত্রের জোরেই রাখালমামাকে?

মন্ত্রের গুণের কথা বলেন না, বলেন হাতের গুণের কথা।

আমাকে কাছে নিয়ে খেতে বসেন, সেই ওঁর সরতোলা গাওয়া ঘি, বাড়ির গরুর দুধের ঘন ক্ষীর, টাটকা পুকুরের মাছের ঝোল, সদ্য মাঠ ভাঙা আনাজ তরকারি, মৌরলা মাছের কড়া টক, সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সহযোগে। আর আমার চাইতে তিনগুণ বেশি অন্নব্যঞ্জন পার করে হাত চাটতে চাটতে প্রসন্নমুখে সামনে বসে থাকা ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে বলেন, হাতের গুণে, বুঝলি বুলবুলি, সুশীলার হাতের গুণে নটেশাকও বাহবার হয়ে ওঠে। যা রাঁধে তাই যেন অমৃত। হাতের রান্না খেলে রুগীর রোগ সারে, পরমায়ু বাড়ে। এই দ্যাখ না, আমার আটষট্টি বছর বয়েস পার হতে চলল, দেখে বুঝতে পারছিস?

মা হাসেন, 'তা বোঝা যায় না বটে।'

রাখালমামা সোৎসাহে বলেন, 'তাই ত বাড়িঘর ভাল করে সারিয়ে নিয়েছি। বে-ওজরে আরও বিশ বছর বেঁচে থাকব আমি, দেখে নিস।'

রাখালমামার বাঁচার এত বাসনা কেন? মনে হচ্ছে এই বাসনার জোরেই সত্যিই হয়ত আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবেন রাখালমামা।

কিন্তু কিছুতেই কেন লোকটাকে পাপী, বদ, অসচ্চরিত্র, অপবিত্র মনে হচ্ছে না?

মনে করতে চেষ্টা করেও না।

মারও কি ওই একই অবস্থা?

তাই তিনি রাখালমামার কথার উত্তরে সহাস্যে বলেন, 'আমাকে আর দেখতে বোলো না বড়দা, দেখি ত সেই ওপর থেকে দেখব।'

'তোদের মেয়েমানুষদের ওই এক কথা। সব শেয়ালের এক 'রা'। বেঁচে দরকার নেই, বেঁচে কাজ নেই—কেন রে বাপু! কিন্তু কথায় কথায় যে বেলা গড়িয়ে গেল। বলি সুশীলা, তোর আক্কেলখানা কি? তোর না হয় তিনপহর বেলাতেও পিত্তি পড়ে না, এরা হল শহুরে মানুষ, সকাল সকাল খাওয়া অভ্যেস। ...নাও নিজেও পিণ্ডি দুটো গিলে নাও এই সঙ্গে, অনর্থক দেরি করে লাভ নেই। বলু, চলহে আমরা বরং বৈঠকখানায় গিয়ে বসি গে! ...যেতে পা বাড়িয়ে আবার

থমকে দাঁড়ালেন রাখালমামা, বললেন, 'নিজেদের কি রেখেছিস না নিরিমিষ পদগুলোও সবটাই আমাদের ধরে দিয়েছিস?'

এসে অবধি রাখালমামার ডাঁক হাঁকই শুনেছি ওঁর সঙ্গে, সুশীলাদির কথা কওয়া শুনিনি, এই প্রথম শুনলাম। গম্ভীর শান্তকণ্ঠে বললে, 'তুমি যাবে বৈঠকখানায়?'

'হচ্ছে হচ্ছে, যাচ্ছিই ত।' বলে তাড়াতাড়ি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে চলে আসেন রাখালমামা।

ফিরতি পথে ট্রেনে বসে বললাম, 'মা এটা কি হল?'

মার পিত্রালয় বিচ্ছেদে চিত্ত বিষণ্ণ, উদাসভাবে বলেন, "কি আর হল!'

'নীতুদাকে গিয়ে কি বলবে?'

'বলব আবার কি', মা নিজের অভ্যাসে সহসা উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন, বলব, 'কেন নড়বে রাখালটা দেশ থেকে? অত যত্ন, অত সেবা ত্রিভুবনে আর করবে কেউ ওর?'

'মার, সুরটা যে উল্টো লাগছে?'

মা আরও উদাসভাবে বলেন, 'তা কি করব! সব সময় কি একসুর বাজে।'

'নীতুদা বলবে তুমি ঘুষ খেয়েছ!'

'ওঃ, বলবে ত আমি একেবারে ভয়ে মরে যাব ; কেন নীতু কি জজ? আমি চুরির আসামী? বলি ওই যে মেয়েমানুষটা অগাধ বুদ্ধি, অফুরন্ত গতর, আর অঢেল শক্তি নিয়ে চিরকালটা শুধু ভেসে বেড়াল, আর পরের সংসারের বেগার খেটে এল, এই মরণকালে একটা নিজের সংসার পেয়ে বর্তে গেছে সে। বেচারাকে সেইটুকুন থেকে উচ্ছেদ করে আবার ছন্নছাড়া করব? ভাবতে মায়া হয় না, কী পরিপাটি সংসার, কী গোছ, কী ব্যবস্থা, দেখলে চোখ জুড়োয়। কি করে মুখের ওপর বলব, 'এ সংসারে তোমার অধিকার নেই, তুমি বিদেয় হও।'

'কিন্তু তোমাদের সমাজ?'

'চুলোয় থাক! সমাজকে আর কোন লোকটাই বা মানছে এখন?

'আর পাপপুণ্যি, ধর্ম-অধর্ম?'

মা একটা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'দেখ বলু, গিয়েছিলাম বটে তেড়েমেড়ে, কিন্তু ওঁদের দেখে মনে হল পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা কি আমরা? যিনি মালিক, যিনি বিচারকর্তা, তিনি সত্যবিচার করবেন! আর ওই তোর রাখালমামা। ওঁর যা স্বভাব, শুধু সেবা-যত্নই নয়, সারাক্ষণ ওঁর খিঁচুনি খাবার জন্যেও একটা লোকের দরকার। ছেলেরা পারবে? বৌরা পারবে? কেউ পারবে না। শুধু নাকি যে মানুষটা চিরটাকাল ওকেই প্রাণ ঢেলেছে—'

আবেগকে সংহত করে সহসা একটু চুপ করে যান মা।

আমি বলি, 'আমি কিন্তু বলেছি, ওঁকে!'

'কী বলেছিস? কাকে বলেছিস?'

'ওই তোমার রাখালদাদাকে। বললাম, এ বয়সে এভাবে এখানে একা থাকায় ছেলেরা খুব দুঃখিত, পাঁচজনে তাদেরই নিন্দে করে, বলে বুড়ো বাপকে ফেলে দিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তা—'

'তা কি? কি উত্তর দিলেন? লজ্জা পেলেন? না ধমকে উঠলেন?'

'লজ্জাও পেলেন না, ধমকেও উঠলেন না, ঠাণ্ডা গলায় বললেন, সে কথা যে বুঝি না বাবা তা নয়, কিন্তু ভেবে দেখ, আমি এখানে আছি, তাই সুশীলা দুটো খেতে পাচ্ছে। ছেলেরা কি ওকে মাসোহারা দেবে? আমার চাকরি নেই, নগদ টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, তাই এই কৌশল খেলে বসে আছি। চিরটাকাল যে মানুষটা আমার মুখ চেয়েই রইল, তাকে এখন 'আমার টাকা নেই' বলে ভাসিয়ে দেব? আর ওটারও চিরকাল নিজের একটা সংসার নেই বলে কী আক্ষেপ! তাই বলি, কিছুই ত হল না, তবু মরণকালে দুটো হাঁড়ি-কুঁড়ি নেড়েও যদি 'জীবনটা সার্থক হল' ভেবে শান্তি পায় তা পাক। ছেলে বেটাদের ত বলে দিয়েছি, তোরা যত পারিস আমার নিন্দে করে বেড়াস। বলিস—বাবা বদমেজাজি, বাবা খামখেয়ালি, বাবা একজেদি, বাবা খিটখিটে, কারুর সঙ্গে বনিয়ে থাকতে পারে না বাবা। নচেৎ আরও যা প্রাণ চায় বলিস পাঁচজনকে, আমার কোনও কিছুতেই গায়ে ফোস্কা পড়বে না।'

মা কি ভাল করে সবটা শুনতে পেলেন? জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন দেখছি যে!

নুরবানু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কুরমান হাটে কাচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালী কিনবে না বেগুনী কিনবে চট করে ঠাওর করতে পারে না। অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনতো, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনতো, তিত-পুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখে করুমান। জোখা মেলে তো রঙ পছন্দ হয় না, রঙ মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাচের চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর কবুলত নেই, বর্ষায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান-যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভালো করে, যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড়ো দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত। তাই কুরমানের একার খাটনিতে চলে না। নুরবানুকেও কাজ করতে হয়।

নুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিব গিন্নির খেজমত করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভালোমন্দ খেতে পায় মাঝে মাঝে। দরমা পায় চার টাকা!

কিন্তু শান্তি নেই। মনিব উকিলদ্দি দফাদার, নুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে।

প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নুরবানুকে ঃ 'মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।'

'কেন কী করে?'

'খুক খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, অমোদ-সামোদ করে কথা কয়।'

'তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনোদিন।'

'না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।'

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয়নি। একদিন নুরবানুর হাত চেপে ধরলো। সেদিনও কাঁদতে কাঁদতে নুরবানু বললে, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে খামচে দিয়েছে।

রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠলো কুরমানের। বললে, 'তুই সামনে গেছিলি কেন?'

'কে বললে? যাইনি তো সামনে।'

'সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কী করে?

'আমি ছিলাম ঢেঁকি-ঘরে। ও ঘরে ঢুকে বললে, বীজ আছে ক-কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরলো।'

তবু সেদিনও সে মারেনি নুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য! গরিবের বউ-এর কি একটু ছুরৎও থাকতে পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলায়ও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?

'খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমন্ত লোক, থানা পুলিশ সব ওদের হাতে, ওদের অনেক দূর দিয়ে আমাদের হাঁটা চলা। কাজ কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।'

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনী পাকানো।

হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে ঝিম মেরে গেল।

'এসব কোত্থেকে?'

'মুনিব গিন্নি দিয়াছে।'

কিন্তু জিজ্ঞেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পেছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাচের চুড়ি, কাল আংটি-চুটি। নোনা জমি এমনি করেই আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

'খুলে ফেল শিগ্‌গিরি।' গর্জে উঠলো কুরমান।

সাজবার ভারী সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টাল মাতাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারলো। পট পট করে ভেঙে গেল কতকগুলি। হেঁচকা টান মারলো খোঁপায়। একটা কুণ্ডরী-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠলো।

ডুকরে কেঁদে উঠলো নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনোদিন। বাবা, ভয়

করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে, কিষাণের বউ সে, ঠুটো পাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তা দরকার কী।

কিন্তু একি! হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাক টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগলো নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে ছুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে আস্তে আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কী করে?

'তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেলে। এদিকে তোমার একটা ভালো গামছা নেই লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে।

'যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।'

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

'তোর চুল বাঁধা দেখিনি কোনোদিন—'

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন্ ঠুন্।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম? কম কি এক বেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এলো। ফরসা রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

'এ শাড়ি এলো কোত্থেকে?' বর্শার মুখের মতো চোখা হয়ে উঠলো কুরমান।

'আজ যে ঈদ খেয়াল নেই তোমার? ঈদের দিনে মুনিব-গিন্নী দিয়েছে শাড়িখানা।'

ঈদের দিন হলেও নরম পড়লো না কুরমান। ফিরনি-পায়েসের ছিটেফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায়?

না, নরম পড়লো না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘষা জিভ। ফাঁই ফাঁই করে সে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেললো। এবার আর সে হাটে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার সখ কেন? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এতো সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে? গা বেয়ে বেয়ে শেষকালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপমারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শান্তির মতোই এ শাড়িখানা। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর

স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনলো নরুবানুকে। নিয়ে এলো পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র লাগুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক। বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গিয়েছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে টিপে দুপুরবেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্যে ঝুমকো, পায়ের জন্য পঞ্চম, গলার জন্যে দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, 'কই গো বিবিজান। দেখো এসে কী এনেছি।'

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু স্থির। রুপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপর বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিন নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটি মাংসোখেকো জানোয়ার।

'চলে যান এখান থেকে।' চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবান।

'তোমার জন্য লবেজান হয়ে আছি। এই দেখো, জেওর এনেছি গড়িয়ে।'

'দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে শোর তুলবো এখুনি।'

কিন্তু শোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রুপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুশির ঝলকানি, কত না জানি ঠাট্টা বটকেরা, কত না জানি হাসির বুজরুকি। রঙ-সঙ আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কত না জানি যোগসাজসের শর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেল কুরমানের, চারপাশে চেয়ে দেখলো সে অসহায়ের মতো। দেখলো ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

'এখানে কেন?'

ধানাই-পানাই করতে লাগলো উকিলদ্দি। শেষকালে বললে, 'লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কিনা দেখতে এসেছিলাম।'

'তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?'

'বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার, আমার যেখানে খুশি আমি যাবো আসবো।'

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরলো। লাগলো ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি।

উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুরমান। তা ছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর জেল্লা নেই শরীরে সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগোছাটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল নুরবান। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এলো সে হন্ত-দন্ত হয়ে, শিক্‌রে পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো উকিলদ্দির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলো জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না। শুধু শুরু হয় লটপাট।

কী চোখে দেখলো ব্যাপারটা কে জানে কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুঁটি ধরে ঃ 'তুই, তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে। কেন পর-পুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি শুরু করে দিয়েছিস?' উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেল সে নুরবানুকে।

আর যেমনি এলো এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়লো কুরমানের মাথায়। মনে হলো নুরবানুই যেন লাঠি মারলো। মনে হলো কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মতো চেঁচিয়ে উঠলো ঃ 'এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন'।

ব্যস, উথল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হয়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগতো না। আঁধার দেখতে লাগলো চারদিকে।

নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। ফকির ফতুরের মতো তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা সুখে হাসতে লাগলো উকিলদ্দি।

লোক জমতে শুরু করলো আস্তে আস্তে।

কুরমান গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। বললে নুরবানুকে, 'ও কিছু হয়নি, চলে যা ঘরের মধ্যে।'

সত্যিই যেন কিছু হয়নি, এমনিভাবেই আঁচল গুটিয়ে চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউ-এর মতো।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক-দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা-আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে ঘরে তুলতে পারবে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি বরদাস্ত করতে পারে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

'রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রি পর হয়ে যাবে?' কুরমান কেঁদে উঠলো।

পর বলে পর! এপার থেকে ওপার! একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘুড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

'মুখের কথাটাই বড়ো হবে? মন দেখবে না কেউ?'

মুখের জবানের দাম কি কম? রঙ-তামাশা করে বললেও তালাক তালাক। আর এ-তো জল জীওন্ত রাগের কথা, গলা দরাজ করে দিন-দুপুরে তালাক দেওয়া।

'আর দস্তুরমতো সাক্ষী রেখে।' ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

'এখন উপায়? নুরবানুকে আমি ফিরে পাবো না?'

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসলো ফরমান দিতে। ইদ্দতের পর কেউ যদি নুরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর কুরমানের পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কে বিয়ে করবে নুরবানুকে? আর কে! দাড়িতে হাত বুলুতে-বুলুতে উকিলদ্দি বললে, 'আমি বিয়ে করবো।'

কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি-তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশের হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইনাম, মোল্লা-মুনশী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মানী-গুণী লোক সব। এদেরকে অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেলো কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবে না আর নুরবানু। বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কী করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়েছেলে? পাশ-গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল নুরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নীচে।

তাছাড়া আর কি? কুরমানের হাতের নাগালের মধ্যে দিয়ে চলে গেল, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে সে ধরে রাখতে পারলো না। সামান্য কটা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানতো! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

দাউল হয়ে কুরমান চলে গেল দক্ষিণে। নুরবানু ছাড়া তার আর ঘরদুয়ার কী! ঘরের ইউয়ে খাওয়া পাটঘড়ির বেড়া ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তেমনি ভেঙে-ভেঙে পড়ছে তার বুকের পাঁজরা। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে

ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাঁপ খোলে। কোথায় নুরবানু? চৈতী মাঠের মতো বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নুরবানু। যেন একটা অন্যায় করছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নুরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নুরবানু বলে, 'না এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।'

বলে, 'তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম। বড়ো মন কেমন করে।'

বড়ো কাহিল হয়ে গেছে নুরবানু। বড়ো মনমরা। গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জুলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা-ওটা একটু-আধটু গোছগাছ করে দেয় নুরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে। 'তোকে কি আর ফিরে পাবো নুরু?'

'নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেওয়া।'

'আমার কি মনে হয় জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এঁটে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।'

'ইস!' নুরবানু ফণা তুলে ফোঁস করে উঠলো ঃ 'দশ-সালিস ওকে ছাড়বে কেন?'

'না ছাড়লেই বা কি, ও স্পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়।'

'ইস, করুক দেখি তো এমন বেইমানি।' আবার ফোঁস করে ওঠে নুরবানু ঃ 'বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।'

নুরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

'গা-টা তেতো-তেতো করছে জ্বর হবে বোধ হয়।'

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নুরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নুরবানুর ঘরের দরজায়। নুরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে। বলে, 'কেন পাগলের

মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।'

'কবে আসবি?'

'দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্বাবার কলমা পড়বে। তারপরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।'

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে। যেখানে এত প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ, দেদার আসমান।

শিগ্‌গির বাড়ি যাও, কুরমান চোর, কুরমান পরপুরুষ।

জুম্বাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু কই, শনিবারে তো তালাক নিয়ে চলে এলো না নুরবানু।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবে না নুরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মতো নয়, দেনাদারের মতো।

উকিলদ্দি বললে, 'আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না, ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কি করে?'

যতসব ফাঁকিজুঁকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে অষ্টঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসালো। জানালো তার ফরিয়াদ।

ডাকো উকিলদ্দিকে। জবাব কি তার? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে। কেন এজাহার খেলাপ করছে?

উকিলদ্দি বললে, বিয়েই এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকন্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকপোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না। দরজায় খিল দিয়ে ভেবেছে কলমা পড়ার পরই বুঝি ও তালাকের কাবিল হলো। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাঁটান-ছিঁড়েন হতে পারে কী করে?

সত্যিই তো। দশ-সালিশ রায় দিলো। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কী করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মতো।

ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলো নুরবানু।

পরদিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উকিলদ্দি নুরবানুকে তালাক দিলো।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই যাই করছে, নুরবানু চলে কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হুঁকো ধরা, কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে কে জানে। চেয়ে আছে—শুনা মাঠের মতো চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের সব। ভাঙন নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মতো চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকালো নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরঙের নতুন শাড়ি। পরতে-পরতে যেন খুশির জলের স্রোত।

সে জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মাংসের গন্ধ।

সে জলে আর স্নান করা যায় না।

'ইদ্দত আমি এখানেই কারবার করবো। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি।' নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

নেবা হুঁকোয় টান মারতে মারতে কুরমান বললো, 'না, আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।'

—

রানী সাহেবা

বিমল মিত্র

মানুষের সংসারে কত চরিত্রই যে দেখলাম। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর একটি মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছি। পৃথিবীতে সব মানুষ সব কিছু পায় না, সেজন্যে আমার অভাববোধ হয়তো আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। আমি গোয়াবাগানের মেসে সুধা সেনকে দেখেছি, বিলাসপুরে বাণী-বিদ্যায়তনে প্রমীলা সরকারকে দেখেছি, দেখেছি রানী দে, রুণু রায়, লিলি পালিতকে। দেখেছি মিসেস সুজাতা স্বামীনাথনকে জব্বলপুরের শিয়ালকোট লজ-এ। আরো দেখেছি নীলনেশার রায়সাহেবকে, প্রফেসরপত্নী কণিকা দেবীকে। আর আরো দেখেছি সবজি বাগানের সুরুচি আর সদানন্দবাবুকে। ওদের সকলকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছি—কিন্তু আরো কতজনকে নিয়ে যে আমার আজো লেখা হয়নি তাও তো বলে শেষ করা যায় না।

এই যেমন আজকের রানীসাহেবা—

রানীসাহেবাকে আজ এতদিন পরে আবার—! বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রানীসাহেবার একদিন দুদিনের নয়, সুদীর্ঘ পঁচিশ-তিরিশ বছরের সম্পর্ক। মনে হলো, ভবিষ্যতে যদি কাউকে নিয়ে গল্প লিখি তা সে এই রানীসাহেবাকে নিয়েই লেখা উচিত।

সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে আমরা এসেছি। লাহেড়িয়া সরাইতে নেমে মোটরে তিরিশ মাইলের রাস্তা। মৃণালিনীর বিয়ে—রানীসাহেবার একমাত্র মেয়ে মৃণালিনী। অনেকদিন পরে যখন প্রথমে সন্তান হলো, গোকুল জিগ্যেস করেছিল—কী নাম রাখা যায় রে মেয়ের—

তখন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। নাম দিয়েছিলাম—শকুন্তলা—

কিন্তু সে নাম টেঁকেনি। শেষ পর্যন্ত মার ইচ্ছের কাছে বাবার ইচ্ছেকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সেই নামের ব্যাপারেই শুধু নয়। গোকুল যখন নামে-প্রতিভায়-প্রতিষ্ঠায় বড় হলো, রায়সাহেব হলো, তখনও কঠোর হাতে পেছন থেকে যে মানুষটি শাসন করতো, সে মৃণালিনীর বাবা নয়, তার মা—আজকের এই রানীসাহেবা। কত সম্বর্ধনা সভায় উঠে বক্তৃতায় বলেছে গোকুল—আমার উন্নতির মূলে রয়েছেন আমার স্ত্রী—তিনি আমায় দিয়েছেন তাঁর একনিষ্ঠ ভালোবাসা, তাঁর

সেবা, তাঁর যত্ন, তার ঐকান্তিকতা—

সত্যি সত্যি বিয়ের আগে কী ছিল গোকুল আর পরে কীই না হয়েছিল। এ তো যুদ্ধের হিড়িকে ফুলে-ফেঁপে বড়লোক হওয়া নয়, ধাপে ধাপে কেবল উঠেছে গোকুল, শুধু আরো বড় ধাপে ওঠবার জন্যেই। চেম্বার অব কমার্স, এম এল এ, সেনেট সভা, স্বদেশ-বিদেশ সমস্ত জুড়ে মরবার শেষ দিনটি পর্যন্ত কেবল সাফল্য আর সাফল্য। যাতে হাত দিয়েছে, তাতেই লাভ। সমস্তর মূলে নাকি গোকুলের স্ত্রী। ওর স্ত্রীর ভালোবাসা।

আমি শুনতাম। কিন্তু ভেবে পেতাম না, শুনে হাসবো না কাঁদবো।

কিন্তু সেসব কথা এখন থাক।

কলকাতা থেকে পাঁচশো মাইল দূরে বেহারের এই দুর্গম পল্লীতে রানীসাহেবার মেয়ের বিয়েতে এসে যদি সেদিনকার সব কথা, সব ইতিহাস মনে পড়ে যায়, তো মনকে দোষ দিই কী করে। বিরাট বাড়ি। ঠিক বাড়ি নয়, প্রাসাদই বটে। শুনলাম, সাতানব্বই বিঘের ওপর বাড়িখানা। কিন্তু সকাল থেকে যে ব্যাপার চলছে, তাকে কে বলবে দেখে যে বিয়ে আজকে নয়। আমরা যাঁরা অতিথি, তাঁদের আদর-আপ্যায়নের আয়োজন চূড়ান্ত। দশখানা গ্রামের হাজার হাজার প্রজা সকাল থেকে পাতা পেড়েছে। লাড়ু, পেড়া, গুলজামুন, বালুসাই, পুরি, বরফির ছড়াছড়ি চারিদিকে। মুন্সীজী এক-একবার এসে খবর নিয়ে যায় সকলের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি না।

পরের দিন যখন বর এল, কখন বিয়ে হলো ভিড়ের মধ্যে কিছু দেখাই গেল না। তবু দেখবার চেষ্টা করেছিলাম বৈকি। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, তার স্বামীকে দেখবার ইচ্ছে ছিলই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

বিয়ের পরদিন মুন্সীজীকে বললাম—একবার রানীসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে পারা যায় না—

মুন্সী হয়তো প্রথমে অবাক হয়েছিল। কিন্তু চেষ্টা করবে বলে শেষ পর্যন্ত অন্দর-মহলে খবর পাঠালে। খবর যেতে আসতে তাও প্রায় একঘণ্টা লাগলো। সত্যিই তো বিয়েবাড়ি—সবাই ব্যস্ত। এখন একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে কার-ই বা অবসর হবে। কিন্তু তা নয়। মুন্সীজী বললে—না হুঁজুর, রানীসাহেবার কড়া হুকুম আছে, পুরুষমানুষ কেউ যেন অন্দরমহলে না ঢোকে—

মুন্সীজীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, তা পরেই টের পেলাম। সদর আর অন্দরের মাঝামাঝি একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালো মুন্সীজী। দক্ষিণ দিকে একটিমাত্র দরজা। দরজার ওপাশেই অন্দরের সীমানা। দরজার পর্দা খাটানো। ঘোমটা দিয়ে একজন ঝি এসে দাঁড়ালো দু-ঘরের মাঝখানে।

মুন্সীজী আমায় ইঙ্গিত করলে—রানীসাহেবা এসেছেন—যা বলবার শিগগির বলে দিন।

এমন অবস্থার জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। এমন দিনও গেছে, যেদিন রানীসাহেবার সামনাসামনি বসে কথা বলেছি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে বাংলাদেশ ছেড়ে এসে বেহারের এই জমিদারিতে বসে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিগত স্বামীর বৃদ্ধ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে এই সঙ্কোচ, এই আয়োজন এ-আমার পছন্দ হলো না। এমন জানলে আমিই কি এমন প্রস্তাব করতাম। নিজেকে যেন অপমানিত মনে করলাম। রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের বিধবা স্ত্রীর অগাধ সম্পত্তি থাকতে পারে—কিন্তু আমরা দুজনে এক সময়ে তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলাম। সে-বন্ধুত্বের দাবিও কি কিছুই নয়।

মৃণালিনীর বিয়েতে দেবার জন্য কলকাতা থেকে একটা শাড়ি এনেছিলাম। সেখানা মুন্সীজীর হাতে দিয়ে বললাম—না, আমার কিছু কথা বলবার নেই—এইটে রানীসাহেবাকে দিয়ে দিও—'

বলে আর কালক্ষেপ না করে সোজা বাইরে চলে এলাম। তখুনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে নিয়ে স্টেশনে রওনা দিলাম। আজ অবশ্য গোকুল বেঁচে থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে এখানে কিসের টানে এত দূরদেশে এসেছিলাম, তাই ভেবেই নিজের মনকে ধিক্কার দিলাম। কে রানীসাহেবা। কোথাকার রানী! আমার কে তারা? মনে পড়তে লাগলো গোকুলের কথাগুলো। অর্থের অভাব গোকুলের কখনও অবশ্য হয়নি। বিয়ের পরে থেকেই বৃহস্পতি তুঙ্গী হয়েছিল ওর জীবনে। ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায় বন্ধুদের মধ্যে আর কে অমন সাফল্যের সপ্তম স্বর্গে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু অমন হতভাগ্যও আমি জীবনে তো কম দেখেছি।

কোন মহিলা সভার সম্পাদিকা একবার চাঁদার খাতা নিয়ে এসেছিলেন গোকুলের বাড়িতে। ধনবান গোকুলের কৃপাপ্রার্থী তারা। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে গোকুল কথা বলছিল, এমন সময় ভেতরের পরদা ঠেলে এই রানীসাহেবা বেরিয়ে এসেছিলেন।

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—বের করে দাও এঁকে—এখুনি বের করে দাও—

গোকুল যতখানি স্তম্ভিত, তার চেয়ে বেশি স্তম্ভিত মহিলা সভার সম্পাদিকা।

রানীসাহেবা বলেছিলেন—তুমি যদি বের করে না দাও, আমারও বের করে দেবার অধিকার আছে—দারোয়ান—দারোয়ান—

চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন রানীসাহেবা। ঘরের মধ্যে আরো দুজন ভদ্রলোক, একজন টাইপিস্ট, আশেপাশে চাকর, দারোয়ান, ঝি, ঠাকুর। কারোর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কলকাতার ধনীসমাজে সবেমাত্র প্রভাব-প্রতিপত্তি শুরু হয়েছে গোকুলের। বৌবাজারের ছোট দোতলা বাড়িটা ছেড়ে লেক রোডের চারতলা বাড়িটা সবে তুলেছে। হাওড়ার দু-দুটো জুট মিল চলছে, আবার সেই সঙ্গে গিরিডির একটা অভ্রখনি সবে কিনেছে। ওদিকে কাউন্সিলের ইলেকশনে দাঁড়াবে কিনা

ভাবছে—অবস্থাটা এই রকম। মোটকথা সেদিনকার সেই ঘটনাটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি অপমানজনক। কোনও সূত্রে প্রকাশ্যে বাইরের ঘরে তাঁর আসবার কথাও নয়।

দারোয়ান এখনি এসে যাবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন স্ত্রীর আচরণে হতবাকও বটে, ক্ষুব্ধও বটে। গোকুল উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু কাকে সে নিবারণ করবে। স্ত্রীর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আর যারই থাক গোকুলের নেই।

সম্পাদিকা পর্দানসিনা নন। দশ রকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভিজ্ঞতা আছে, ব্যাপারটা বুঝলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা আমি এখন উঠি তা হলে স্যার—একদিন সময়মতো আপনার অফিসে দেখা করবো বরং—

বাঘের মতন লাফিয়ে উঠলেন স্ত্রী।

—তা তো করবেনই—কিন্তু খবরদার বলছি, ও হাসি আমি চিনি—হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে এলোখোঁপা দুলিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে জানি—আরো ভালো লাগে যদি সে মানুষটি দেখতে ভালো হয়, লক্ষ টাকার মালিক হয়—চাঁদা চাইবার নাম করে...ছি ছি...পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি—

আঃ কি হচ্ছে মিণ্টু—ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে গোকুল।

—তুমি থামো দিকি—আমি না থাকলে কবে তুমি এদের পাল্লায় পড়ে মারা যেতে—ছি ছি! তোমাকে আমি দোষ দিই না—কিন্তু সংসারে এমন সরল হলে কি করে চলবে—

মহিলাটি তখন এক ফাঁকে সরে পড়েছেন।

কিন্তু পরদিন থেকে ব্যবস্থা হলো অন্যরকম। গোকুলের ড্রাইভারের পাশে দিবারাত্র আর একজনকে দেখা যেতে লাগলো।

গোকুল মোটরে যেতে যেতে জিগ্যেস করল—তোর পাশে ও কে রে যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর পুরানো ড্রাইভার। বললে—আজ্ঞে, চিন্তার বড় ভাই—

গোকুলকে মোটরে উঠবার সময়ে নমস্কার করেছিল একবার। মনে পড়ল এখন। লোকটা আর একবার পেছন ফিরে নমস্কার করলে। বললে—আমার নাম হরিশ আজ্ঞে, চিন্তা আমার ছোট বোন হয় আজ্ঞে—

স্ত্রীর ডান হাত চিন্তা। সেই চিন্তার বড় ভাই।

অফিসে ঢুকে বসেছে গোকুল। কাজ করছে। মাঝে মাঝে অকারণে হরিশ ঘরের ভেতর উঁকি মারে।

—কিছু দরকার আছে?

উত্তর দেয় না হরিশ। টুপ করে মাথাটা সরিয়ে নেয়।

এক একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে ইচ্ছে হয় একবার সিনেমায় যায়। কিন্তু স্ত্রীর কড়া বারণ আছে ওতে। সিনেমা মানেই তো ওই। দেয়ালে দেয়ালে প্ল্যাকার্ডগুলো দেখ না। বাইরে যার ওই, ভেতরে যা আছে তা কল্পনা করে নাও। আগে না বলে-

কয়ে কয়েকদিন ঢুকেছে ভেতরে। মাথাটা যেন ঠান্ডা হয়ে যায় বেশ। কিন্তু হরিশ আসার পর থেকে কেমন করে যেন সঙ্কোচ হয় গোকুলের।

স্ত্রী বলেন—কেন, গাড়িতে হরিশ থাকা তো ভালো, রাস্তাঘাটে কত রকম বিপদ-আপদ আছে, দেশে ধর্মঘট তো রোজ লেগেই রয়েছে—তোমার সুবিধের জন্যেই তো রাখা—

যত কাজই থাক রাত আটটার পর গোকুলের আর বাইরের থাকবার হুকুম নেই। একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকতে হবে। সে-নিয়ম যেমন কঠোর তেমনি অমোঘ।

স্ত্রী বলেছেন—রাত্তির বেলায় যারা ব্যবসা চালায় তাদের বলে বেশ্যা—অমন পয়সার দরকার নেই আমার—একবেলা খাবো ভিক্ষে করে পেট চালাবো তাও ভালো—তবু—

গোকুল বলেছে—না ভাই, ও-সব জিনিস তর্ক করবার নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম—

স্ত্রীর মতেই চলেছে গোকুল সারা জীবন, স্ত্রীর পরামর্শ মতোই কাজ করেছে। একটা পয়সা কাউকে চাঁদা বা ধার দিতে গেলে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তবে দিয়েছে। বাড়িতে এসে সারাদিন কোথায় কোথায় গিয়েছে কার কার সঙ্গে দেখা করেছে বা দেখা হয়েছে সমস্ত সবিস্তারে বলেছে স্ত্রীকে—। টাকা, পয়সা, আধলা পাইটি পর্যন্ত স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তবে ছাড়া পেয়েছে।

একবার খুব অসহ্য হওয়াতে ডাক্তার সেনগুপ্তের কাছেও গিয়েছিল।

গোকুল সমস্ত খুলেই বলেছিল—দেখুন আমার স্ত্রী আমাকে বড় সন্দেহ করেন—সন্দেহ মানে তিনি মনে করেন আমাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে বিশ্ব-সংসারের সমস্ত নারীজাতি বুঝি উন্মুখ হয়ে আছে—আমার মতো সুপুরুষ কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই—এ রোগের কী চিকিৎসা বলুন তো—

—ছেলেপুলে হয়েছে আপনার? ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছিলেন।

—না।

ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে—কিছু ভাববেন না—যাতে ছেলে হয় বরং সেই চিকিৎসা করান—সে-চিকিৎসা করাতে হয়নি শেষ পর্যন্ত। কারণ কয়েক বছর পরেই মেয়ে হলো গোকুলের। মেয়ে হবার পর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—এখন কেমন চলছে গোকুল—ব্যাধি কমেছে—

—না ভাই, আরো বেড়েছে—গোকুল ম্রিয়মাণ হয়ে জবাব দিলে।

—সে কি?

আমার কিন্তু বরাবর মনে হতো গোকুল হয়তো ঠিক সত্যি কথা বলে না। কোথায় যেন একটা গর্ববোধ আছে মনের ভেতরে। অন্যের স্ত্রীরা যেন ওর স্ত্রীর তুলনায় কম সতীসাধ্বী; কম পতিপ্রাণা। ওর মনে হতো ওর উন্নতির মূলে আছে ওর স্ত্রীর একনিষ্ঠতা। বুঝি ওর স্ত্রীর কল্যাণেই ওর সমস্তিপুরের একটা সুগার মিল, হাওড়ার

দুটো জুট মিল, ওর রায়সাহেব উপাধি, ওর কলকাতার সাতখানা বাড়ি, লাহেড়িয়াসরাইয়ের জমিদারি—সব!

যা হোক—সেই গোকুল মিত্তির—লেট রায়সাহেব গোকুল মিত্তিরের মেয়ে মৃণালিনীর বিয়ের নিমন্ত্রণে না বলতে পারিনি। পুরোনো বন্ধুত্বের টানে পাঁচশো মাইল দূর থেকে এই বয়সে এই পল্লীগ্রামে এসেছি। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিংরুমের মধ্যে চুপচাপ বসে বসে মনে হলো আমি না এলেই বা কে কী মনে করতো! কার কী ক্ষতি হতো।

এখনো ট্রেন আসতে দু'ঘণ্টা দেরি।

হঠাৎ মুন্সীজী শশব্যস্তে ঘরে ঢুকলো।

বললে—রানীসাহেবা পাঠিয়ে দিলেন আমাকে—আপনি চলে যাবেন না—এই চিঠিটা রানীসাহেবা পাঠিয়েছেন আমার হাতে—

মনে হলো বলি—রানীসাহেবা তোমাদের রানীসাহেবা, আমার কে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে চিঠিটা পড়লাম। অনেক অনুনয় করে লিখেছেন—'আপনি এমন রাগ করে চলে গেলে মিনুর অকল্যাণ হবে। বর-কনে চলে যায়নি এখনও। অতিথি দেবতার সমান। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু কথা ছিল—মেয়ের বিয়ের পর বলবো ইচ্ছে ছিল। এ-সুযোগ হয়তো আর পাবো না—দয়া করে ফিরে আসবেন—আমার মান রাখবেন—'

রানীসাহেবার মোটরে করে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই আবার ফিরে আসতে হলো।

বিদায়ের সময় ভালো করে বরকে দেখলাম। শুনলাম মতিহারীর লোক। ওখানেই ওদের জমিদারি। রানীসাহেবার চেয়েও বড় জমিদার ওরা। ছেলের বয়েস যেন মৃণালিনীর চেয়ে কমই মনে হলো। বিহারে তিন-চার পুরুষের বাস। এখানে থাকতে থাকতে চেহারায় পুরোপুরি বেহারী হয়ে গেছে। পাশে মৃণালিনীর বিরাট ঘোমটা—তাও যেন কেমন অবাক লাগলো। 'সুনীতি-শিক্ষা-সদন' থেকে আই-এ পাশ করেনি বটে, কিন্তু কিছুদিন তো সেকেন্ড ইয়ার ক্লাশ করেছিল। সেই মেয়ে যাকে নিয়ে অত কাণ্ড সে-ই বা অমন অতখানি ঘোমটা কেমন করে দিতে পারলে।

বর-কনে চলে গেল। বিয়ের উৎসব কিন্তু তখনও এতটুকু কমেনি। গ্রামের হাজার হাজার লোক নাকি ক'দিন ধরে এমনি খাওয়া-দাওয়া করবে। রানীসাহেবার একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাদের হয়তো এই শেষ উৎসব।

সন্ধেবেলা রানীসাহেবা লিখে পাঠালেন—আজ রাত্রিটা আমায় ক্ষমা করবেন—আমার মন বড় খারাপ, কাল দিনের বেলার ট্রেনে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব, এবং যদি সকালে আপনার অসুবিধে না হয়—সেই সময়ে সাক্ষাৎ হবে—

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক পুরোনো কথা মনে আসতে লাগলো—

পুরোনো বলে পুরোনো?

সে প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা। শুধু ঘটনা বললে ভুল বলা হবে। আমার জীবনে সে এক দুর্ঘটনাই বটে। আর রানীসাহেবা! কিন্তু তখন তো তিনি রানীসাহেবা হননি—তখন তিনি জামশেদপুরের আরতি রায়। সেকেন্ড ইয়ারের আর্টসের ছাত্রী।

গোকুল মিত্তিরের বিয়ের খবরটাও বন্ধুমহলে হঠাৎ শোনা গেল।

বরযাত্রীরা কলকাতা থেকে দল বেঁধে বরের সঙ্গে যাবে টাটানগরে।

আর আমি? আমি তখন কাকার বারো নম্বর সি-রোডের কোয়ার্টারে সামনের ঘরটায় ছুটি কাটাতে গেছি। হঠাৎ গোকুলের চিঠি পেলাম—তোর সামনের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছি—তৈরি থাকিস—সদলবলে পরশু বিকেল বেলা হাজির হবো—

তখন নজরে পড়লো সত্যি সত্যি সামনের ষোল নম্বরের বাগানে ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে বটে। সামনের বাড়িতে যেন উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে এরই মধ্যে। সামনে দু-তিনটে মোটর, লোকজন—।

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেদিনই একলা একলা অনেক রাত পর্যন্ত একখানা বই নিয়ে পড়ছিলাম। কাকা কাকিমা ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুস্বরে দরজায় একটা টোকা পড়ল। তারপর আর একবার। উঠে র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে দিয়ে দরজাটা খুলে পর্দাটা সরাতেই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছি!

সেই শীতের ঠান্ডা রাত—চারদিকে অন্ধকার—মনে হলো মানুষ নয় যেন পরী। বাইরের কুয়াশা, যেন পরী হয়ে ঘরের মধ্যে আগুন পোয়াতে এসেছে।

মেয়েটির কত বয়েস হবে। আঠারো উনিশ। আমার হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে কী অঝোরে কান্না। এমন ঘটনায় বিভ্রান্ত না হয়ে কি উপায় আছে!

বললাম— কে আপনি—কী চান—

দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে অনেকবার প্রশ্ন করলাম। আমার প্রশ্নে কান্না তার আরো করুণ হয়ে উঠলো। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কী চায়, কেন এসেছে সে এত রাত্রে।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা, সব কথা মনে নেই আজ।

তবু কাঁদতে কাঁদতে সে রাত্রে মেয়েটি যা বলেছিল তা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি কৌতুকপ্রদ। ষোল নম্বর সি-রোডের বাড়িতে যে ছেলেটি থাকে—তাকে আমার তখুনি ডেকে দিতে হবে। তার নাম নাকি বিকাশ। বাড়ির সামনে যে-ঘর, তার পুব দিকের জানালায় গিয়ে ডাকলেই সে আসবে। তার সঙ্গে সেই রাত্রে দেখা হওয়া মেয়েটির নাকি বিশেষ দরকার।

মেয়েটি বললে—আমি গেলে কেউ দেখতে পাবে—আপনি দয়া করে একবার বিকাশকে ডেকে আনুন—জিজ্ঞেস করলে বলবেন আরতি তাকে ডাকছে—আমি বিশেষ বিপদে পড়েছি—

আরতি বসলো আমারই বিছানায়।

আর আমি তার নির্দেশমতো অগত্যা সেই শীতের মধ্যে ডাকতে গেলাম ষোল নম্বরের অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশকে। সেদিন ভারি রহস্যময় মনে হয়েছিল এই ঘটনা। বিকাশ যখন এল আরতির চোখে সে কী ব্যাকুল ভয়ার্ত আবেদন। বিকাশকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার কি কর্তব্য ভাবছিলাম, মেয়েটি বললে—আপনি দয়া করে বাইরে একটু বসুন—একটু কষ্ট দেব আপনাকে—

আমার ঘরেরর বিছানায় ওদের দু'জনকে বসিয়ে আমি নির্বোধের মতন বাইরে চলে এসে বারান্দার বেতের চেয়ারটায় বসলাম।

তারপর সেই শীতার্ত রাত কেমন করে কাটলো তা আজ আমার মনে থাকবার কথা নয়। শুধু এতটুকু মনে আছে যে সমস্ত রাত ওদের ঘরের আলো জ্বলেছে আর আমি না-ঘুম না-জাগরণে সেই বেতের চেয়ারে বসে পলে পলে শীতে জমে বরফ হয়ে গেছি। তারপর কখন কাকার ওয়াল ক্লকটায় বারোটা বেজেছে, একটা বেজেছে, দুটো বেজেছে, তিনটেও বেজেছে—সব টের পেয়েছি। ঘরের ভেতরের টুকরো-টাকরা কথা, কান্নার আভাস বাইরে ভেসে এসেছে। পাশের চেরি গাছটার পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে শিশির ঝরে পড়েছে সারা রাত। আমার গায়ে শুধু একটা পুল-ওভার। জামশেদপুরের সেই কনকনে ঠান্ডা শীত সে পুল-ওভার কতটা আর আটকাতে পারে!

ভোর হবার আগে ওরা যখন বেরিয়ে যায়, আমার সঙ্গে কোনোও কথা বলা বা ধন্যবাদ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। মনে আছে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার প্রায় ন'টা বেজে গিয়েছিল।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হওয়ার বুদ্ধি তখনও আমার অনেক বাকি ছিল। বরযাত্রীরা দলবল নিয়ে গোকুল এল বিয়ের দিন বিকেলে। কিন্তু বিয়ের আসরে বউ দেখতে গিয়ে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল।

আরতি রায়। সেই রাত্রের আমার ঘরে আসা সেই মেয়েটি।

গোকুল বোধ হয় বউ দেখে খুশিই হয়েছিল। বরযাত্রী দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু নিজের বিবেকের সঙ্গে যে বিরোধ সমস্ত মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছিল—তা কেমন করে চেপে রেখেছি সারাজীবন তা আমার অন্তরাত্মাই জানে।

বউভাতের দিন বন্ধুরা এক-একটা উপহার তুলে দিয়েছে নববধূর হাতে। কারোর দিকে মুখ তুলে চায়নি নববধূ। আমি কিন্তু আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলাম সেদিন সেই সুযোগে। মনে হলো ধুতির নরুন পাড়ের মতো সারা মুখে একটা বিষাদ, পাউডার আর স্নোর প্রান্তে আলতো ভাবে ঝুলছে। সেই বিষাদটুকুই নববধূর সমস্ত অবয়বে একটা অভিনব মাধুর্য এনে দিয়েছে যেন। সেদিন মনে হয়েছিল—আমিই কি ভুল করেছি না ও শুধু আমার নিজস্ব একটা ভাষ্য—যার পেছনে যে যুক্তি আছে

তাও বুঝি আমার মনগড়া। অনেকবার মনের গোপন সংবাদটা বিশ্বস্ত বন্ধুদের বলি-বলি করেও বলা হয়নি। গোকুলকে বলা তো দূরের কথা।

পরে অনেকদিন গোকুল বলেছে—ভারি ইন্‌টেলিজেন্ট—জানলি—কিন্তু তোর ওপর ওর খুব রাগ—কেন বল তো—

বলতাম—ব্যাচিলরদের ওপর বন্ধুর বউদের ওরকম একটু রাগ থাকে—

তারপর আস্তে আস্তে গোকুল বড়লোক হলো। অল্পবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে ধনী—ধনী থেকে লক্ষপতি—সে ইতিহাস এখানে অবান্তর। কখনও ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা হতো—আবার কখনও ঘন-ঘন। অতবড় ব্যবসাদার, নানান কাজের মানুষ কিন্তু বরাবর দেখে এসেছি রাত আটটার পর কখনও বাইরে থাকেনি।

বলেছে—না ভাই, ও-সব তর্ক করবার জিনিস নয়—ও যা চায় না তেমন কাজ নাই বা করলাম—

সংবর্ধনা-সভায় উঠে দাঁড়িয়ে গোকুল বলেছে—আমার এই উন্নতির মূলে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিচ্ছেন, সে সম্মান আমার প্রাপ্য নয়, অনেকখানিই প্রাপ্য আমার স্ত্রীর—আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি এমন স্ত্রী, এমন স্ত্রীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভালোবাসা সেবা ও যত্ন না পেলে আমি জীবনে কিছু করতে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

সংবাদপত্রে সে রিপোর্ট সবিস্তারে ছাপা হয়েছে। আমি পড়েছি। আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু নিজের কৌতূহল আর সেই রাত্রের গোপন ঘটনাটির কথা মারণমন্ত্রের মতো বুকে পুষে রেখে নিজের মনেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। বহুদিন পরে একবার টাটানগরে গিয়েছিলাম। সেই অজ্ঞাতকুলশীল বিকাশের খোঁজও করেছিলাম। কাকার বাড়ি সি রোড থেকে তখন এফ রোডে হয়েছে। কিন্তু জীবনে অনেক জিনিস হারিয়ে যাওয়ার মতো বিকাশ সেদিন হয়তো সৌভাগ্যক্রমে হারিয়েই গিয়েছিল এবং অনেকদিন পরে যখন দেখা হলো...কিন্তু সে-কথা এখন থাক, নইলে রানীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার প্রচেষ্টাই বা কেন!

এরপর গোকুল মিত্তির বৌবাজার থেকে লেক রোড, লেক রোড থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে থিয়েটার রোড-এ ধাপে ধাপে উঠে গেছে। সাধারণ লোক থেকে রায়সাহেব হয়েছে। দশজনের একজন ছিল, ক্রমে দশজনের শীর্ষে উঠেছে। বাইরে থেকে আমরা দেখেছি গোকুলকে। বাহবা দিয়েছি। কিন্তু গোকুল বরাবর বলেছে—না না, আমি কিছু নয় ভাই—এর পেছনে আছেন মিসেস মিত্তির—আরতি—মিণ্টু—

আমরা যখনি আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছি, গোকুল সাপ দেখার মতো লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে হাসাহাসি হয়েছে—তামাশা হয়েছে।

আমার স্ত্রী বলেছে—কেন হাসির কী আছে—ওই তো ভালো—তোমাদের

যেমন মেয়েমানুষ দেখলেই জিব দিয়ে নাল পড়ে।

চাঁদা চেয়ে বা ধার চেয়ে কখনও কেউ হতাশ হয়নি গোকুল মিত্তিরের কাছে। কিন্তু মহিলা-সমিতি, গার্লস স্কুল কিংবা দুঃস্থ বিধবা—এসব ব্যাপারে একটি পয়সা কখনও দেয়নি গোকুল, এক আমাদের সুনীতি শিক্ষা সদন ছাড়া। গোকুল বলতো—কী করবো, আরতির আপত্তি যে—

গোকুলের উন্নতির সঙ্গে আমি যদিও বরাবর জড়িত ছিলাম—কিন্তু ওর চরিত্রের ওই দিকটার কথা মনে হতেই কেমন যেন করুণার চোখে দেখতাম ওকে। মনে হতো ইচ্ছে করলেই এক দণ্ডে গোকুলের জীবন বরবাদ করে দিতে পারি। ও হয়তো আত্মহত্যা করবে শুনে। কিন্তু আবার এক একবার মনে হতো হয়তো আমারই ভুল। আমারই মনের ভুল কিংবা চোখের ভুল। সেদিন সেই শীতের রাত্রে বারো নম্বর সি রোডের সামনের ঘরটার ঘটনা শুধু নিছক বিভ্রম মাত্র—আর কিছু নয়। আসলে গোকুলের ক্রম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের কৌতূহলের মাত্রাটাও দ্বিগুণ ত্রিগুণ চর্তুগুণ হয়ে বেড়েই চলেছিল।

এর পরের ঘটনা আরতি রায়কে নিয়ে নয়। আরতি তখনও রানীসাহেবা হননি। তখন কেবল মিসেস মিত্র। প্রচুর প্রতিষ্ঠার শিখরে উঠে রায়সাহেব গোকুল মিত্তির যখন মারা গেল হঠাৎ, তখন কারবার নিজের হাতে নিলেন মিসেস মিত্র। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যেমন আড়ালে থেকে স্বামীকে পরিচালনা করতেন, তেমনি আড়ালে থেকেই তখন থেকে ব্যবসা পরিচালনা করতে লাগলেন তিনি।

ঘটনাটা সেই সময়ের।

শকুন্তলা নয়—মৃণালিনী। মৃণালিনী ম্যাট্রিক পর্যন্ত পর্দা স্কুলে পড়েছে। গোকুল মিত্তির ওই মৃণালিনীর স্কুলে যাওয়ার জন্যেই পালকি-গাড়ি কিনেছিল। রবারের টায়ার লাগানো চাকা। জানালা দরজা খড়খড়ি বন্ধ। দুটো মোটা মোটা ওয়েলার ঘোড়া। দুটো মোটর থাকতেও কেন যে এই ব্যবস্থা। জিজ্ঞেস করতে গোকুল বলেছিল—ও-সব কথা থাক্ ভাই—আরতি যখন চায় তখন ও নিয়ে আর—

তারপর ভর্তি হলো আমাদের সুনীতি শিক্ষা-সদনে। গীতাপাঠ, স্তোত্রপাঠ, আর তার সঙ্গে আই-এর কোর্স। এখানে ভর্তি হওয়ার পেছনে মিসেস মিত্রের নিশ্চয়ই সম্মতি ছিল। কারণ স্ত্রীর বিনা-পরামর্শে কোনোও কাজ করবার পাত্র গোকুল নয়।

তখন গোকুল বেঁচে নেই। সমস্ত কাজ কারবারের কলকাঠি মিসেস মিত্রের হাতে। তখন সেই সময়ে একদিন আগুন জ্বলে উঠল।

সেদিন কলেজে নিয়মিত গেছি। ক্লাস বসে গেছে। হঠাৎ মিসেস মিত্রের চিঠি নিয়ে এসে হাজির মিসেস মিত্রের দারোয়ান। পিওন-বুকে সই দিয়ে চিঠি নিলাম। চিঠি খুলে পড়তে গিয়ে মাথায় বজ্রাঘাত হলো।

সিল করা চিঠি। বিশেষ জরুরি এবং গোপনীয়।

টাইপ করা তিন পৃষ্ঠা চিঠি। নীচে মিসেস মিত্রের সই।

পত্রের বিবরণে প্রকাশ—মিসেস মিত্রের মেয়ে মৃণালিনী নাকি প্রেমপত্র লিখেছে সুনীতি শিক্ষা-সদনের ইংরেজির প্রফেসার বিভূতি ঘোষালের কাছে এবং বিভূতি ঘোষাল সে চিঠির জবাব দিয়েছে। এমন একখানা দু'খানা নয়, অনেকদিন ধরে অনেক চিঠিই লেখা হয়েছে। কিন্তু মিসেস মিত্তির এখন ধরে ফেলেছেন সমস্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৃণালিনীর কলেজে আসা বন্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, এখন জানতে চেয়েছেন বিভূতি ঘোষালের মতো প্রফেসারকে কেন এখনি বরখাস্ত করা হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন সুনীতি-শিক্ষা-সদনকে এখনি ভেঙে দেবে না। যেখানে মেয়েদের শিক্ষার নামে চরিত্রহীনতার হাতেখড়ি দেওয়া হয় এবং যে-প্রতিষ্ঠানে অসচ্চরিত্র লম্পট শিক্ষকদের বেছে বেছে নিযুক্ত করা হয় মেয়েদের প্রলুব্ধ করবার জন্য—সে প্রতিষ্ঠান তুলে দেবার জন্যে কোনো আইন দেশে আছে কিনা—এবং না থাকলে সে আইন এখনি কেন প্রবর্তন করা হবে না তাই জানতে চেয়েছেন। সুশিক্ষার নামে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভদ্রঘরের যুবতী মেয়েদের যে এইভাবে অনাচার ও দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তা বহুলোক বহুদিন ধরে সন্দেহ করে আসছেন। কিন্তু ভদ্রবেশী গুণ্ডাদের কূটনীতিতে এতদিন সকলের দৃষ্টি অন্ধ হয়েছিল। সুনীতি-শিক্ষা সদনের এই দৃষ্টান্ত এবার সকলকে ইত্যাদি।

তিনপৃষ্ঠাব্যাপী অভিযোগ। শেষে লিখেছেন—দেশবাসী তথা বিশ্ববিদ্যালয় এর কোনো প্রতিবিধান না করলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবেন।

এর একখানা নকল তিনি পাঠিয়েছেন ভাইস-চ্যান্সেলারের কাছে—আর একখানা চ্যান্সেলারের কাছে। এবং লিখেছেন যে, তাঁর উত্তরের জন্যে তিনি পনেরো দিন অপেক্ষা করবেন—জবাব না পেলে তিনি অন্য ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন।

গোকুল বেঁচে নেই। তবু গোকুল বেঁচে থাকলেও কোনো সুরাহা হতো বলে মনে হয় না। কারণ মিসেস মিত্রের কথাই শেষ কথা জানতাম। কিন্তু চিঠিটা পড়ে হাসিও পেল। কারণ জামশেদপুরের সেই বারো নম্বর সি রোডের ঘটনা তো নিছক কল্পনাও নয়।

কিন্তু চিঠিটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেও পারলাম না। তখুনি বিভূতি ঘোষালকে ডেকে পাঠালাম। ছোকরা মানুষ। ওদিকে বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে রত্নও বলা যায়। অনেক দেখেশুনেই তাকে ভর্তি করেছিলাম। ইংরেজি, হিস্ট্রি আর ইকনমিক্‌সে এম-এ দিয়েছে। তিনটেতেই ফার্স্ট। চিরকাল এখানে চাকরি করবে না। আরো উন্নতি করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

সেদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে যে কথা সে বলেছিল তাতে তার বিশেষ কোনোও দোষ আমি পাইনি।

এক কথায় সে বলতে চেয়েছিল—তারা দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসে—

সেদিনকার মৃণালিনীকেও আজ মনে করতে চেষ্টা করলাম। খড়খড়ি বন্ধ পালকি-গাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে আসতো রোজ। মিসেস মিত্রের কড়া নজর আর কোচোয়ান

চাকর ঝি দারোয়ানের নজরবন্দী হয়ে থেকে থেকে একমাত্র বোধহয় কলেজের এলাকায় ঢুকেই সে জীবন ফিরে পেত। চটুল চলা আর কথা বলার ভঙ্গী থেকে বুঝতাম এখানেই একমাত্র সে বুঝি মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তার লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় ওঠা, ক্লাশের বাইরে দুর্দম ছোটাছুটি আর তারপর ঠিক বাড়ি যাবার আগে পালকি গাড়িটা যখন ঘেরা কলেজ কম্পাউন্ডের ভেতরে এসে ঢুকতো তখন অকারণে বাড়ি যেতে দেরি করা আর যাবার আগে তার সেই বিষাদ-মলিন চেহারা হয়ে যাওয়া—সমস্তর যেন একটা মানে ছিল। আজ সেই মেয়েকেই দু'হাত নিচু ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তার চেয়ে কমবয়েসী স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখে তাই অত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যা হোক চিঠিটা পেয়েই মিসেস মিত্রের বাড়ি গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে—দেখাও হলো।

কিন্তু কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই আরতি রায়কে। সাদা থান, তুষারধবল গায়ের রং আর প্রচুর স্থূল মাংসপিণ্ডের তলায় জামশেদপুরের সে-মেয়েটি বুঝি কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, যতক্ষণ ছিলেন সামনে বসে, একবারও আমার চোখে চোখ রাখলেন না। হয়তো ভেবেছিলেন যদি চোখের জাফরি দিয়ে সেই কুমারী আরতি রায় হঠাৎ এক ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে ফেলে! কিংবা যদি আমি চিনে ফেলি সেই আরতি রায়কে।

অনেকক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন—যাদের হাতে ছেলে-মেয়ের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব, তারাই যদি এমন করে তাদের সর্বনাশ করে তা হলে বাপ-মায়ের মনে কতখানি দুঃখু হয় তা ভাবুন তো একবার—

আমার অবশ্য চুপ করে শোনবারই পালা। যিনি কথা বলছেন তিনি তখন আর বন্ধুপত্নী নন—রায়সাহেব গোকুল মিত্রের প্রচুর সম্পত্তিশালিনী বিধবা স্ত্রী।

বললেন—আপনারা ও-স্কুল উঠিয়ে দিন—যদি তা না দেন তবে জানবেন ও আমিই উঠিয়ে দেব—দেহের ধর্মনাশ আর মনের ধর্মনাশ ও একই কথা—

তারপর পাশের দিকে চেয়ে ডাকলেন—প্রফুল্লবাবু—

গোকুলের পুরোনো টাইপিস্ট প্রফুল্ল কাজ করছিল একপাশে। মিসেস মিত্রের ডাকে উঠে এল কাছে।

মিসেস মিত্র কপালের চুলগুলো ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন—একশো সাতের সি ফাইলটা আনুন তো একবার—

ফাইলটা আসতেই মিসেস মিত্র সেখানা খুললেন। বললেন—প্রফুল্লবাবু, এই তেত্রিশের ফোলিওটা দেখে রাখুন—মাসে মাসে সুনীতি-শিক্ষা-সদনের নামে যে পাঁচ হাজার করে চাঁদা বরাদ্দ আছে—আজ একটা চিঠি ড্র্যাফট্ করে দেবেন—ওটা ক্যানসেলড্ হবে—আর ওদের ওখানে যে পঞ্চাশখানা পাখা দেওয়া আছে ওগুলোও

ফেরত দেবার কথা লিখে দেবেন ওই সঙ্গে—

তারপর বাঁ পাশে দরজার দিকে চেয়ে ডাকলেন—চিন্তা—

চিন্তা এল।

বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে একবার ডেকে দে তো—

যজ্ঞেশ্বর সামনে আসতেই বললেন—যজ্ঞেশ্বর, শুনে রাখ, কাল যখন আপিসে যাবি একবার আমাদের অ্যাকাউনটেন্টকে দেখা করতে বলবি—খগেনবাবু আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করেন বাড়িতে—বলবি বিশেষ দরকার—

তারপর চিন্তার দিকে চেয়ে আবার বললেন—হ্যাঁ রে, মিনু বার্লি খেয়েছে, না এখনও...একবার জ্বরটা দেখলে হতো যে...আর যজ্ঞেশ্বর—শোন ইদিকে—

যজ্ঞেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বললেন—মা—

—একবার বড় ডাক্তারবাবুকে খবর দে তো—গাড়ি নিয়ে যা—নইলে দেরি হবে—বলবি এখনি যেন আসেন—প্রফুল্লবাবু, আপনি এ-মাসে ডাক্তারবাবুর মেডিকেল বিলগুলো এখনও দেননি কেন—কাজে আপনাদের বড় গাফিলতি হয়—আমি যেদিকে না দেখবো...

দশটা কাজের মধ্যে মিসেস মিত্রকে যেন কেমন দিশেহারা দেখলাম। ঠিক যেন সামঞ্জস্য করতে পারছেন না জীবনের সঙ্গে—কোথায় কোন ফুটো দিয়ে বুঝি সব নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার দিকে না চেয়েই আমাকে বললেন—ও, আপনি এখনও বসে আছেন—আপনাকে চা আনিয়ে দিচ্ছি—চিন্তা, চা নিয়ে আয় তো এক কাপ—

কী জানি হঠাৎ মিসেস মিত্রের চিঠিটা পেয়ে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম—সামনাসামনি প্রত্যক্ষ দেখে কেমন যেন ওঁর ওপর করুণা হলো। অর্ধমৃতের ওপর আঘাত করতে ইচ্ছে হলো না। মিসেস মিত্র কি সত্যি সত্যিই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ!

সেদিন বাড়ির বাইরে এসে বাড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেছিলাম। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জেলখানার মতো। অমন রক্ষা-ব্যবস্থা কিসের জন্য? জানালাগুলোর সামনে দেড় হাত জায়গার ব্যবধানে খড়খড়ির আবরণ দেওয়া। চন্দ্র-সূর্যও যেন ওখানে প্রবেশ করতে না পারে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সুনীতি শিক্ষা-সদনের মাসিক মোটা চাঁদাটা বন্ধ হয়ে গেল। গোকুল মিত্রের ধার দেওয়া পঞ্চাশখানা পাখা—তাও একদিন ওদের লোক এসে খুলে নিয়ে গেল। তবু টিমটিম করে চলতে লাগলো প্রতিষ্ঠান। শেষে একদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর একদিন কার কাছে যেন শুনেছিলাম যে মিসেস মিত্র মেয়েকে নিয়ে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর জমিদারিতে গিয়ে বাস করছেন। জনতা, কোলাহল, শহর, সভ্যতা থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে তিনি হয়তো আত্মরক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। কুমারী জীবনে যে দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছেন আরতি রায়, মিসেস মিত্র হয়ে তিনি

সারাজীবন তার প্রায়শ্চিত্তই হয়তো করে গেলেন এবং নিজের কন্যার মধ্যে যাতে তাঁর কোনো বিগত দুর্বলতার ছাপ না পড়ে তার সেই শুভ প্রচেষ্টাই হয়তো তাঁকে তাঁর লাহেড়িয়াসরাই-এর দুর্গম বন্দিনিবাসে আবদ্ধ করেছে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, তা আজ মৃণালিনীর লম্বা ঘোমটা আর তার কমবয়সী স্বামীকে দেখেই বুঝতে পারলাম।

মুন্সীজীও বলছিল—ওরা হুজুর বড় ভারী জমীন্দার—বনেদী বংশ ওদের—ওদের বংশের নিয়মই আলাদা, বউ শ্বশুরবাড়ি গেলে জীবনে আর কখনও বাপের বাড়ি আসতে পারবে না—বড় ভারী বনেদী জমিন্দার ওরা হুজুর—

সকালবেলা নিয়মিত জলযোগের পর ডাক পড়লো।

মহলের পর মহল পেরিয়ে মুন্সীজী আজ একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছে। আজ আরতি রায়ও নয়, মিসেস মিত্রও নয়, আজ রানীসাহেবা! সেই দুর্গম পল্লী প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্দরমহলের একটি ঘর দেখলাম পরিপাটি করে সাজানো। চারপাশে কলকাতার সোফা কৌচ। দেয়ালের সারা গায়ে গোকুলের নানা বয়সের নানা ভঙ্গীর ফটো। দুটো মানুষ-সমান অয়েল পেন্টিং; একটা গোকুলের আর একটা রানীসাহেবার।

খানিক পরে পাথরের প্লেটে ফল আর মিষ্টি এল। আর তার পেছনে পেছনে এসে হাজির হলেন রানীসাহেবা।

বহুদিন পর দেখছি। বিচলিত হলাম। সত্যি এ-যেন অন্য মানুষ!

এসেই বললেন—ওটা খেতে আপত্তি করবেন না—ওটা প্রসাদ—আমার বিগ্রহ দেবকীনন্দনের—

তারপর সামনে বসলেন। আরো শুচিশুভ্র আর তুষারধ্বল হয়েছে তাঁর অবয়ব। একটু আগেই স্নান সেরে পুজো সেরে আসছেন বোধ হয়। কপালে চন্দন-চর্চিত জোড়া ভৃগুপদরেখা। হাতে নামজপের থলি। ভেতরে আঙুলটা নিঃশব্দে নড়ছে। বুঝি ইষ্টনাম জপ করছেন।

বললেন—কেমন জামাই দেখলেন আমার—তারপর খানিক থেমে বললে—জানেন, মিনুর বিয়ের জন্য আমার ভারি ভাবনা ছিল—আজ আমি সত্যিকারের স্বাধীন—

দেয়ালের অয়েল পেন্টিংখানা দেখিয়ে বললেন—উনি বলতেন বটে যে, আমি নাকি ওঁর উন্নতির মূলে—কিন্তু উনি ছিলেন দেবতা, ওঁর স্পর্শ পেয়ে আমিই বরং ধন্য হয়ে গেছি—ওঁর ভালোবাসা না পেলে কি আজ মিনুকে ঠিক নিজের মনের মতন করে মানুষ করতে পারতুম—নিজের পছন্দমতো ঘরে-বরে দিতে পারতুম—আজ উনিও নেই—মিনুও গেল—আপনারা সবাই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাই কোনোও বাধা এল না—তাছাড়া—

আরো এমন দু-একটা কথা হলো। আশ্চর্য হলাম। এ যেন সে-মানুষ নন। আরতি

রায়, মিসেস মিত্র আর আজকের এই রানীসাহেবা—এরা যেন একজন নয়—তিনজনের তিনটি বিভিন্নরূপ। অথচ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে ওঁকে চিনে এসেছি, তবু মনে হলো চেনার যেন আর শেষ নেই। এ-চেনার শেষ হবেও না। কবেকার কোন আরতি রায়—সে কি আজ রানীসাহেবাকে দেখলে চিনতে পারবে? কিংবা হয়তো রানীসাহেবাও আজ আরতি রায়কে দেখে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে। আরতি রায়কে দেখে রানীসাহেবাও আজ বুঝি লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে থাকবে। নইলে এমন করে অসঙ্কোচে আমার চোখে চোখ রেখে কথাই বা কেমন করে বলতে পারছেন এই রানীসাহেবা!

মামুলি বিদায়-অভিনন্দনের পর চলে আসছিলাম।

দরজার বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল—আর একবার শুনুন—

ফিরে দাঁড়ালাম। হাসি হাসি-মুখ! হাসি দেখে কেমন যেন খটকা লাগলো। হাসি তো কখনও দেখিনি ওঁর মুখে।

বললেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতুম—

—বলুন না, কী কথা—

—আপনি একদিন আমার মেয়ের নাম রাখতে চেয়েছিলেন শকুন্তলা—আমি রেখেছি মৃণালিনী—আপনার দেওয়া নামে আমার আপত্তি ছিল—কেন জানেন?

—না, কেন?

—আপনি আগে বলুন, কী মনে করে আপনি ওর নাম শকুন্তলা রেখেছিলেন?

—আমি কিছু মনে করে ও নাম রাখিনি। কিন্তু—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না—

—আপনি সত্যি কথা বলছেন? —রানীসাহেবা হঠাৎ যেন বড় ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি হঠাৎ এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। ভয় হলো—ধরা পড়ে গেলাম নাকি; ও কি হাসি নয় তবে—ভ্রূকুটি?

তারপর আমার দিকে তেমনি ভাবে তাকিয়েই রানীসাহেবা বললেন—আমার স্বামীকে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই জানতেন, আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোনোও ফাঁকি ছিল না—যদি এতদিনের পরিচয়েও সেটা না বুঝে থাকেন তো...

বলতে বলতে থেমে গেলেন রানীসাহেবা। তারপর একসময়ে আশেপাশে চেয়ে নিয়ে বললেন—আজ আমি স্বাধীন, উনিও নেই, মিনুও জন্মের মতো পর হয়ে গেল—আজ আর বলতে দোষ নেই—কেন আপনি শকুন্তলা নাম রেখেছিলেন তো আর কেউ না বুঝুক—আমি বুঝেছিলাম—

আমায় ক্ষমা করবেন—আমায় ক্ষমা করবেন আপনি—

—কিন্তু আপনি যে ক্ষমার যোগ্য নন—শকুন্তলার জন্ম-বৃত্তান্ত আমাদের দেশের একটা সাত বছরের মেয়েও জানে—বলতে বলতে বিদায়-সম্ভাষণ না করেই চলে গেলেন দরজার পর্দার আড়ালে। খানিকক্ষণ হতবাকের মতন দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম।

ট্রেনে আসতে আসতে ভেবেছি কত কথা। ভেবেছি—অল্প বয়সের ত্রুটির জন্য যাঁকে সারাটা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে—সমস্ত বিলাস ব্যসন শহর সভ্যতা ছেড়ে যিনি আত্মবিবরে মুখ লুকিয়ে মুহ্যমান মৃতকল্প হয়ে আছেন—আজ রানীসাহেবার সেই পরিপূর্ণ রূপটাই যেন দেখবার সৌভাগ্য হলো। গোকুল অবশ্য ছিল হতভাগ্য কিন্তু এই রানীসাহেবাকে দেখলাম আজ তার চেয়ে আরো শতগুণ হতভাগ্য!

মনে মনে সঙ্কল্প করলাম—রানীসাহেবাকে নিয়ে এখন গল্প লিখবো না। ওই মৃণালিনী যখন শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারে আত্মধিক্কারে উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করবে—তখনই রানীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখার উপযুক্ত সময়।

সেই আমার রানীসাহেবার সঙ্গে শেষ দেখা। এর পর আর দেখা হয়নি।

শেষ দেখা বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখা নয়। এর পরে যে ছোট ঘটনাটি ঘটলো সেটি না ঘটলে রানীসাহেবাকে নিয়ে গল্প লেখবার কোনোও সার্থকতাই থাকে না। এতদিনের সমস্ত দেখা একটি মুহূর্তে যেন ভুল-দেখায় পরিণত হলো। সেই ঘটনাটি বলি।

এক সুগার মিলের শেয়ার বিক্রি করতে এক ভদ্রলোক একদিন আমার কাছে এসে হাজির।

সকালবেলা। লোকটি কিন্তু বড় স্মার্ট।

বললে—শেয়ার আপনাকে আমি এখনি কিনতে বলছি না, কিন্তু আমাদের প্রসপেক্টাসখানা একবার পড়তে অনুরোধ করি—ম্যাকসুইনি ব্রাদার্স লিমিটেডের সমস্ত কনসার্ন আমাদের বি কে গুপ্ত এন্ড কোং কিনে নিয়েছেন—ম্যানেজিং এজেন্টস্ নতুন হলেও ফার্ম বহুদিনের, প্রেফারেনসিয়াল শেয়ারে ডিভিডেন্ড এইট পারসেন্ট আর অর্ডিনারি শেয়ার হলো...

উল্টেপাল্টে দেখলাম। 'নরকটিয়াগঞ্জ সুগার ম্যানুফাক্চারিং এন্ড ট্রেডিং কনসার্ন—ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি কে গুপ্ত এন্ড কোং—'। সাদা অ্যান্টিক পেপারে রয়্যাল আট পেজি বুকলেট। শেষের পাতায় ব্যালান্সশিট।

ছোকরাটি বললে—আপনি হয়তো ভাববেন নতুন ম্যানেজিং এজেন্টস—কিন্তু বি কে গুপ্তকে যাঁরা জানেন তাঁদের যদি একবার জিজ্ঞেস করে দেখেন...মিস্টার গুপ্ত আমেরিকা আর জাপানে কুড়ি বছর ধরে এই সুগার টেক্নোলজি নিয়ে জীবনপাত করেছেন—এতদিন পরে ইন্ডিয়াতে ফিরে এসে আজ ক'বছর হলো এইটে হাতে নিয়েছেন—অদ্ভুত ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার মশাই—ছোটবেলায় একজন নিজের গাঁটের

পয়সা খরচ করে ওঁকে জাপানে পাঠায়—অত্যন্ত গরিবের ছেলে ছিলেন কি না—

খানিক পরে ছোকরাটি বললে—আর একটা ভেতরের কথা তা হলে আপনাকে বলি—বেহারের রানীসাহেবার নাম শুনেছেন?

চমকে উঠলাম।

তিনি নিজে এর পেছনে আছেন—তিনি একাই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছেন এরই মধ্যে, আবার দরকার হলে আরো লক্ষ লক্ষ টাকার...

বললাম—রানীসাহেবা?

আমার চোখে মুখে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বেহারের রানীসাহেবা বলতে ওই একজনকেই তো বোঝায়—আপনি চেনেন নাকি—তা সেই রানীসাহেবাই ওঁকে কুড়ি বছর ধরে আমেরিকায় জাপানে পড়বার খরচ চালিয়ে এসেছেন—ফরেন কোনোও ডিগ্রী আর বাকি নেই আর কি—দেশে ফেরবার আর ইচ্ছেই ছিল না, রানীসাহেবাই ওঁকে ডেকে এনে ওইতে নামিয়েছেন—আসল কোম্পানিটা রানীসাহেবারই বলতে পারেন—অথচ দেখুন মিস্টার গুপ্ত ছোটবেলায় কী গরিবই ছিলেন—জামশেদপুরে পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়েছেন—

—কী নাম বললেন? আমি শিরদাঁড়া সোজা করে চেয়ারে উঠে বসলাম?

—আজ্ঞে আমাদের ম্যানেজিং এজেন্টস্-এর নাম মিস্টার গুপ্ত।

—পুরো নাম?

—মিস্টার বি কে গুপ্ত।

—না, না—ইনিশিয়াল নয় পুরো নামটা কী?

—বিকাশ গুপ্ত।

সুবর্ণা

সমরেশ বসু

প্রায় মাস চারেক পরে শিল্পীবন্ধু ভুবনের একটি দীর্ঘ পত্র পেলাম। লিখেছেঃ ভাই নীরেশ, নিশ্চয় এতদিনের নীরবতায় রাগ করেছিস। কিন্তু বিশ্বাস কর, এতদিন বন্ধ দরজার অন্ধকার কোণেই পড়েছিলুম। কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল না। মা আমাকে এত বেশী চেনেন যে কখনো ডেকে জিজ্ঞেস করেন নি, ঘরের কোণে কেন আমার এ নির্বাসন। কাজের মধ্যে হাঁক-ডাক ছুটোছুটি করা আমার অভ্যেস, যে জন্য বন্ধুদের ধারণা, ষোল আনা প্রতিভার সিকিখানেক আমার বাকী রয়ে গেল, আমি বারো আনার কারবারী রয়ে গেলুম।

সেই আমি এতদিন রং তুলি ছুঁইনি, বন্ধুহীন একলা ঘরে একটা অসহ্য কষ্ট, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাময় একটি বিশাল অন্ধকার জিজ্ঞাসার গ্রাসে চাপা পড়েছিলাম।

অথচ আমি জানি, কারণটা শুনলে তোমরা সবাই খুব তুচ্ছ মনে করবে। হাসতেও পার। না হয় তুচ্ছ মনে করা গেল, না হয় হাসাই গেল, কিন্তু তুচ্ছও যে ক্ষেত্র বিশেষে বড় উচ্চ হয়ে বাজে, বহুদূর গভীরে পৌঁছায় তার প্রতিধ্বনি, তা মানবে আশা করি। আমার বেলায় তাই হল। একটি তুচ্ছতাই আমার চিরদিনের দরজা-বন্ধের কৌতূহল ও আগ্রহ হয়ে রইল।

দিল্লীতে, ফ্রেঞ্চ এম্‌ব্যাসি থেকে যখন প্যারিস প্রদর্শনীর কথাবার্তা বলে বেরিয়ে এলুম, মনটা তখন আনন্দে ভরপুর। ভাবলুম, কলকাতায় ফেরার আগে কোথাও একটু বেড়িয়ে যাই। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আগ্রার কথা। আগ্রার সঙ্গেই একটা অপরিচিত কৌতূহল, একটা মেয়ের মূর্তি ধরে আমাকে ডাক দিল। যার নাম জানি, অনেক সংবাদ জানি, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি, মূর্তিটি সেই সুবর্ণা রায়ের। সুবর্ণার দু'একটি পত্র তুমিও দেখে নিয়েছ আমার কাছে। একটু-আধটু ঠাট্টাও করেছ। কারণ তোমরা যাদের **Fan** বল, এমন অনেকের সঙ্গে আমাকে পত্রালাপ করতে দেখেছ, কিন্তু দু'বছর ধরে পত্রে যোগাযোগ রাখতে কখনো দেখিনি। আর তা রাখিনি কারুর সঙ্গে, কারণ সম্ভব নয়। কিন্তু সুবর্ণার সঙ্গে যে কেন রেখেছিলুম, আমি নিজেও তা খুব ভালো জানিনে। বোধ হয় ওর পত্রের মধ্যে একটি বিশেষ মেয়ে, একটি বিশেষ মনকে ঝলকে উঠতে

দেখেছিলুম। যার অনায়াস গতির মধ্যেও একটি আশ্চর্য ব্রীড়া লীলায়িত হয়ে উঠেছিল। অপরিচয়ের মধ্যেও, চোখে একটি ধরাপড়া পরিচয়ের হাসি ছিল লুকিয়ে। আমার ভাল লেগেছিল। তাই, সুবর্ণার প্রথম অনুরোধেই ওকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলুম। পত্রে কথা দিয়েছিলুম, আগ্রায় যদি কখনো যাই, ওকে নিশ্চয় সংবাদ দেব, দেখা করব।

আমার খেয়াল ছিল, সুবর্ণা এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দিল্লী থেকে দিলুম চিঠি লিখে। তারিখ দিয়ে জানালুম, তিন দিন পরে, সকালবেলার ট্রেনে আগ্রা পৌঁছুচ্ছি। এবং কোন হোটেলে উঠব সেটাও লিখে দিলুম।

ঠিক তারিখ মতোই সকালবেলা আগ্রা গিয়ে পৌঁছালাম। যাত্রীর তেমন ভীড় ছিল না গাড়িতে।

টিকিট কালেক্টরকে টিকিট দেবার মুহূর্তেই, গেটের বাইরে লক্ষ পড়ল একটি মেয়েকে, যে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। আমি বাইরে এলুম। মেয়েটির মুখে যেন একটু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে আমার সামনে এগিয়ে এলো আরো। প্রায় অপরিচিতার মতো।

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলুম না, আপনি কি সুবর্ণা—

কথার আগেই সিল্ক শাড়ির আঁচল এবং আবাঁধা এলোচুল প্রায় লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে। ও যে সুবর্ণা, এতে যেন সেটাই প্রমাণ করে দিলে। এসবে আমি ভীষণ অনভ্যস্ত। লজ্জায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, এ কি করছেন।

ততক্ষণে সুবর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'আপনি' করে বলছেন যে?

সেটা নিশ্চয় আমার প্রথম দর্শনের আড়ষ্টতা। কিন্তু সুবর্ণা শাস্ত্রসম্মতভাবেই সুবর্ণা। এবং বিম্বোষ্ঠী, এবং আয়ত কালো চোখ এবং—

থাক্। সুবর্ণার বর্ণনা আমার পক্ষে লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। ওটা তোমাদের এক্তিয়ারে। শুধু পত্র লেখায় যাকে দেখেছিলুম, এ সুবর্ণা তার চেয়ে কিছু বেশী কিংবা পত্রে যা ঢাকা ছিল, শারীরিক আবির্ভাবে ঘুচে গেল তা। ওর চোখের গভীর থেকে যেন একটা স্বপ্নে পাওয়া খুশি উপচে পড়ল। যেন বাতাসের ঘায়ে একটি বেপথু ফুল। দেখলুম ওর চোখের ওপর এসে পড়েছে সাপের মতো চুলেরগুছি। মিথ্যে বলব না, স্বপ্ন ভর করল আমারই চোখে।

জিজ্ঞেস করলুম, আমাকে চিনলে কেমন করে?

অনেকদিনের পরিচিতার মতই একটু লজ্জা মিশিয়ে বলল, যেমন করে সবাই চেনে। কাগজে ফটো দেখেছি।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও চোখ নামাল। কিন্তু মাথায় মালপত্র নিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে। বললুম, সুবর্ণা, আমি এখন হোটেলে যাব।

সুবর্ণা বললে, ওবেলা কিন্তু আমি আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাব। আর, এখন আপনার সঙ্গে একটু হোটেলে যাব?

ওর অনুমতি চাওয়া দেখে, ওকে যেন আরো বেশী করে চেনা গেল, মনে মনে খুশী হয়ে বললুম, তোমার অসুবিধে না হলে—

সুবর্ণা যেন ওর উচ্ছাসকে চাপা দিয়ে বললে, এখন আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

বললুম, একটুও না।

মনে মনে অবাক হলুম। দেখামাত্র এতখানি মুগ্ধতা, প্রায় যেন মোহের সঞ্চার করল আমার মধ্যে। থরে বিথরে সাজানো আমার ত্রিশোর্ধ্বের বুকের একটি নিশ্চিন্ত জায়গা সহসা এমনি এলোমেলো হয়ে উঠছে কেন? সুবর্ণাকে দেখে সব থেকে আগে আমার আঁকার কথা মনে পড়ল। এবং এই প্রথম আমার মনে হল, আমার সব রং জড়ো করলেও বুঝি ওকে কুলোবে না। আমার সব গতি দিয়েও ওকে হয়তো ধরা যাবে না।

ওকে সঙ্গে করে যেন নিমেষে হোটেলে এলুম। দোতলায় আমার ঘর ঠিক করাই ছিল। ঘরে ঢুকে, সুবর্ণাকে বসতে বললুম। বেয়ারাকে বললুম চা খাবার দিতে।

কিন্তু সুবর্ণাকে দেখলুম, মাথা নত করে টেবিলে আঙুল খুঁটছে এবং হাসছে। জিজ্ঞেস করলুম, কি হোল?

সুবর্ণা প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, ভীষণ লজ্জা করছে।

দেখলুম, সত্যি ও আরক্ত প্রায়।

জিজ্ঞেস করলুম, কেন?

বলল, চিঠিগুলোর কথা মনে করে। আমার চিঠি পড়ে আপনি নিশ্চয় খুব হাসতেন?

বললুম, কাঁদিনি তো বটেই।

সুবর্ণা হেসে উঠল। আবার চোখ নামিয়ে বলল, কিন্তু নিশ্চয় ভেবেছেন, মেয়েটা ভারি বেহায়া।

বললুম, না। ভেবেছি, মেয়েটি ভুবন চৌধুরীকেই বেহায়া করে তুলল। তাই ছুটে এলুম।

সুবর্ণার হাসি যেন চুড়ির নিক্কনে বেজে উঠল। বললে, ইস্?

আমিও হেসে উঠলুম।

কিন্তু সুবর্ণার মুখে একটি করুণ ছায়া পড়ল সহসা। আমি যদিও বয়স এবং মান, দুই-ই বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলুম, তবু জিজ্ঞেস করলুম, কী সুবর্ণা?

সুবর্ণা চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। এবং অসঙ্কোচে বলল, আপনি এত দেরী করে চিঠি দেন, আমার কষ্ট হয়।

সুবর্ণার গলায় তার কষ্ট এমন সহজ ও অনাড়ম্বর ব্যক্ত হল যে, আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম।

সহসা কিছু বলতে পারলুম না। সুবর্ণাই আবার বলে উঠল, কিন্তু আমি ভাবতাম, আপনি আপন মনে ছবি আঁকছেন, আমার কথা আপনার মনে নেই। মনে যখন পড়বে, তখন ঠিক চিঠি দেবেন।

তখন আমার নিজের মুখ আড়াল করতে হয়েছে। ওর অসহায় ব্যথাটা যেন আমাকে চেপে ধরল।

আমি কিছু বলার আগেই, বেয়ারা এসে চা জলখাবার দিয়ে গেল। ফিরে দেখলুম সুবর্ণার পলকহীন চোখের দ্যুতিতে বিস্ময় ও আনন্দ রৌদ্রচকিত দীঘির মত অনায়াস। বললে, আপনাকে দেখার জন্যে কতদিন ধরে বসেছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখলে?

বললে, বলতে পারব না।

সুবর্ণার ঠোঁটে একটা বিচিত্র হাসি ফুটল। তাকাল আমার দিকে। আবার চোখ নামাল হেসে।

বলল, আমার একদম যেতে ইচ্ছে করছে না এখন। কিন্তু এবার যেতে হবে।

যাওয়ার কথা শুনে আমি বিমর্ষ হয়ে উঠলুম। বললুম, যেও, চা খাও আগে। চা খেতে খেতে বারে বারে ওর চোখে সেই ধরা-পড়া লুকোন হাসি আমি দেখতে পেলুম।

সুবর্ণা বললে, আমি এবার যাই?

বললুম, বিকেলে আসছ তো?

ও বললে, নিশ্চয়।

কিন্তু আবার বললে, যাচ্ছি, অ্যাঁ?

বারে বারে জিজ্ঞাসায় ভিতরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। মনে হল সুবর্ণা যেন, রং-এর শেষ প্রলেপের পর, ঘাম তেল মাখা এক অলৌকিক উজ্জ্বল প্রতিমা। আমার হাত ওর হাতের কাছেই। আমার সব রক্ত যেন আমার হাতেই তখন আবর্তিত। কেন, সুবর্ণা এমন বারে বারে যাবার অনুমতি চাইছে কেন?

তারপরে সুবর্ণা যাবার আগে হঠাৎ নীচু স্বরে বললে, আমি বোধ হয় সম্মান করতে শিখিনি। কিন্তু ভাললাগা আর মনের খুশিকে একটুও চাপতে শিখিনি। তাই আমার বুকের মধ্যে কতদিন কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

—কেন সুবর্ণা?

সুবর্ণা বললে, যাঁর ছবি দেখে আমার মন ভরেছিল, সেই মানুষের অন্তরঙ্গ হবার আশায় সব যেন আমার শূন্য ঠেকছিল।

একথা শুনে আমার বুকের রক্ত যেমন চলকে উঠল, তেমনি দিশেহারা হলুম, সুবর্ণাকে ঠোঁটে ঠোঁটে টিপতে দেখে। দেখলুম ; ওর চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। আবার আমি নিঃসঙ্কোচে ওর একটি হাত ধরে প্রায় স্খলিত গলায় ডাকলুম, সুবর্ণা?

সুবর্ণা যেন স্বপ্নের লজ্জা থেকে সহসা জেগে উঠল। যেন নিশ্চিন্ত হল আর

ওর মুখে চকিত হাসির আলো উঠল ঝলমলিয়ে। বললে, এবার তাহলে যাই?

আমি ভুবন চৌধুরী, এত দেখার পরেও সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলতে পারলুম না। হাত ছেড়ে দিলুম ওর। বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে গেল ও। আমি দোতলার বারান্দা থেকে দেখলুম। ও একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে হাসল তারপর হারিয়ে গেল।

আমার ঘরের সমস্ত নৈঃশব্দের মধ্যে একটি লুকানো-প্রাণের হাসি-কান্নার আনন্দধ্বনি আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। আমার ভিতরের রং ও গতি যেন পেল আর এক নতুন মুক্তির সন্ধান।

রাত জাগার ক্লান্তি আমার গেল। কোনো রকমে স্নান খাওয়া সেরে বিশ্রামের ছদ্মবেশে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম।

প্রায় বেলা তিনটের সময় বেয়ারা দরজায় ঘা দিল। বললে, এক মেমসাহেব দর্শনপ্রার্থী। আমর বুকের স্পন্দন বাড়ল। মনে মনে বললুম, মেমসাহেব নয় রে, ও যে মহারাণী। নিয়ে আসতে বললুম।

কিন্তু পর্দা সরিয়ে যে ঢুকল, সে অন্য একটি মেয়ে। যার রূপ আছে, সজ্জা আছে কেশে বেশে নিপুণ। আশাহত বিস্ময়ে বললুম, আমার নাম ভুবন চৌধুরী, আপনি?

বললে, আমার নাম সুবর্ণা রায়। আমি চম্‌কে, প্রতিবাদের সুরে বললুম, না না। মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, আমাকে কিছু বলছেন? আমি সুবর্ণা রায়। আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন আজ পৌঁছুবেন বলে। পাছে ভুল হয়, তাই আপনার চিঠিটাও নিয়ে এসেছি।

চিঠিটাও ওর হাতে দেখা গেল।

তাড়াতাড়ি বললুম, ও!

কিন্তু আমার বুকের ভেতরে ঝড়ের দোলা। বিশ্বাস অবিশ্বাসের এক ব্যথাধরা সংহাত। এও কি কখনো সম্ভব? কেন? তা কেন হবে? তবু, বলতে গিয়ে আমি থমকে গেলুম। যাক্ এখন নয়। হয়তো পরে কিছু জানা যাবে। কিন্তু এক অনিবার্য অসহায় আচ্ছন্নতা আমাকে ঘিরে রইল।

এই সুবর্ণা বললে, দেখি।

বলে নমস্কার করলে পায়ে। আমি প্রাণহীন ভাবে বাধা দিলুম। আর সকালবেলার সুবর্ণার নমস্কার আমার মনে পড়ে গেল।

এই সুবর্ণা বললে, আমাদের বাড়ি যাবার সম্মতি দিয়েছিলেন পত্রে। যাবেন তো?

মনে পড়ল, সকালবেলার সুবর্ণার কথা, আমি কিন্তু বিকেলবেলা আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব।

সে সুবর্ণা নয়? সে তবে কে? সে কে? আমাকে নিয়ে এমন খেলা তবে কে খেলেছে? সে যদি সুবর্ণা নয়, না-ই বা হল। সহস্র ছদ্মবেশ তার থাকুক।

তবু সে কি আসবে না আর? আমি তো শুধু তার কথাই শুনিনি। আমি যে তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। আমার হাতে যে এখনো তার স্পর্শের অনুভূতি তীব্র হয়ে আছে।

এই সুবর্ণা উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে বললে, আপনার শরীর খারাপ না কি? থতমত খেয়ে বললুম, অ্যাঁ? উঁ, হাঁ।

এই সুবর্ণা বললে, তাহলে আপনি আজ বিশ্রাম করুন। কাল সকালে কিন্তু নিয়ে যাব।

আমি হেসে সম্মতি দিলাম, কিন্তু চলে যেতে ওকে বাধা দিলুম না।

তারপর শেষ ফাল্গুনের বাতাসে ভর করে কখন রাত এসে পড়ল, জানতে পারিনি। কিন্তু সকালবেলার সুবর্ণা এল না। সন্দেহ গেল, কিন্তু আমার বিনিদ্ররাত শুধু একটি প্রশ্নে মথিত হতে লাগল, সে কে? সে তবে কে?

আর কোন দিনই তার জবাব পেলুম না। তার পরেও চারদিন আগ্রায় ছিলুম। বিকেল বেলায় সুবর্ণাদের বাড়ি গিয়েছি, আলাপ করেছি সকলের সঙ্গে, খেয়েছি, তাজে এবং দুর্গে আর ফাতেপুরসিক্রীতে বেড়িয়েছি। পথে পথে যত মেয়ে দেখেছি, চমকে চমকে তাকিয়েছি সকলের দিকে। আর কেবলি মনে হয়েছে, সকাল বেলার সুবর্ণা যেন অদৃশ্যে আমারই আশেপাশে ফিরছে আর মুখে আঁচল চেপে হাসছে।

কিন্তু কেন? কেন এই নিষ্ঠুর খেলা? সে কে? তার কাছে আমি কী অপরাধ করেছি? যত ভেবেছি, ততই সেই সকালবেলার কয়েকটি মুহূর্ত আরো স্পষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছে। চার মাস ধরে বন্ধ ঘরে শুধু এই ভেবেছি। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা?

মনে মনে অনেক রাগ করেছি, ঘৃণা করেছি সকালবেলার সুবর্ণাকে। কিন্তু মিথ্যে বলব না, তারপরেও কান পেতে আমি আমার কান্নাও শুনতে পেয়েছি।

ভাই, এ যাত্রা আর তোর সঙ্গে দেখা হল না। পরশু ফ্রান্সে রওনা হচ্ছি। হয়তো যেতে পারতুম না। কিন্তু চার মাসের বন্ধ ঘরের অন্ধকার আমাকে একটি সত্যের আলোর বাইরে এনেছে। তা হল, আমাদের জীবনে দু'জনের আগমন এমনি ঘটে। যারা আসবার পূর্ব মুহূর্তেও কোনো জানান দেয় না। ছায়া যদি বা ফেলে, আমরা টের পাইনে। একজন আসে জীবনে একবার। আর একজন হয়তো নানান বেশে একাধিকবার।

একজন মৃত্যু, আর একজন আমাদের মহাপ্রাণের চিরপ্রার্থিত স্পর্শমণি, মনের মানুষ। তারা আমাদের সীমানায় থাকে কিন্তু প্রত্যহের কুলায় ওরা কুলোয় না। আজ এই এখানেই ইতি করলুম।

—তোর ভুবন

ভুবনের চিঠিপড়া হল, কিন্তু সকালবেলার সুবর্ণা ভাসতে লাগল আমার মানসপটে।

স্বামী হওয়া

বুদ্ধদেব গুহ

মহুয়া মিলন থেকে আসা ট্রেনটা টোরী স্টেশনে ঢুকছিল। স্মিতা এবং আমি নীচু প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজ হাটবার। খুব ভিড় প্ল্যাটফর্মে। নানা জায়গা থেকে হাট করতে এসেছিল ওঁরাও-মুণ্ডা-ভোগতা-কোল-হো-রা।

সুমন স্যুটকেসটা হাতে করে নামল। নেমেই দৌড়ে এলো আমাদের দিকে। এসে স্মিতাকে বলল, কেমন আছে বউদি?

স্মিতা বলল, কেমন করে ভালো থাকি বল? তুমি এতদিন কাছে ছিলে না।

সুমন হাসল। আমিও হাসলাম।

এর পর সুমন আমাকে বলল, রোলস রয়েসটা এনেছো তো?

বললাম, এনেছি।

তবে, চল।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আমার লজঝড় অস্টিন গাড়িটার পিছনের দরজা খুলে সুমন উঠে বসল। পাশে স্মিতা। আমি ড্রাইভিং সিটে আসীন হলাম।

বসন্তের দিন। হু হু করে হাওয়া আসছিল। পড়ন্ত রোদ্দুর সেগুন গাছের বড় বড় হাতির কানের মতো পাতার পেছনে পড়াতে সিঁদুর-রঙা দেখাচ্ছিল পাতাগুলোকে। মহুয়ার গন্ধ ভাসছিল। ঠোঁট মুখ চড় চড় করছিল রুখু বাতাসে।

স্মিতা বলল, তারপর? মা-বাবা বিয়ের কথা কি বললেন?

সুমন বলল, ধ্যুত। সে মা-বাবাই জানেন।

আহা! লজ্জায় যেন মরে গেলে তুমি।

ওকে গালে টুশ্‌কি মেরে বলল স্মিতা।

আমি লাতেহারের দিকে মোড় নিলাম। কিন্তু লাতেহার যাবো না।

চাঁদোয়ারই এক প্রান্তে আমার কোয়ার্টার। সুমনেরও পাশাপাশি। সরকারী চাকরীতে এইরকম জঙ্গুলে জায়গায় যেমন কোয়ার্টার হতে পারে, তেমনই।

কোয়ার্টারে পৌঁছে গাড়িটা খাপরার চালের একচালা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিলাম।

স্মিতা সুমনকে বলল, তোমার বাহন ছোটুয়াকে বলে দিয়েছি কাল ভোরে চলে আসতে। আজ সকালেও একবার এসে ঘর-দোর ধুয়ে-মুছে গেছে। চানুকে টুল পেতে

সামনে বসিয়ে রেখেছিলাম সব সময়। পাছে কিছু খোয়া যায় তোমার।

সুমন উত্তেজিত হয়ে বলল, চানু কোথায়? চানু?

ততক্ষণে সুমনের গলা শুনতে পেয়ে চানু টাল-মাটাল পায়ে দৌড়ে এল বুধাই-এর মায়ের হেপাজত থেকে ছাড়া পেয়ে। বলল, সুমন কাকু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

সুমন স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখেই চানুকে এক ঝট্‌কায় কোলে তুলে নিয়ে বলল, তা হলে আমি মরেই যাবো। তোমার সঙ্গে আড়ি করে কী আমি বাঁচতে পারি? তোমার মা-বাবা পারলেও বা পারতে পারে। আমি কখনও পারব না।

চানু অত বোঝে না। চার বছর বয়স তার মোটে। সে বলল, আড়ি, আড়ি, আড়ি।

স্মিতা, সুমন এবং আমিও হেসে উঠলাম।

স্মিতা বলল সুমনকে, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। দুপুরে খেয়েছিলে কোথায়?

দুপুরে আবার কোথায় খাব! যা হতচ্ছাড়া লাইন। এ সব জঙ্গলের জায়গা তোমাদের মত কবি কবি লোকের পক্ষেই ভালো লাগার। সাতসকালে বাড়কাকানাতে খাওয়ার খেয়েছিলাম। ম্যাকলাস্কিগঞ্জে চা, কার্নি মেমসাহেবের দোকানের আলুর চপ। কালাপাত্তি জর্দা দেওয়া পান গোটা আষ্টেক। সারা পথে।

স্মিতা বিরক্তির গলায় বলল, তাই-ই। ঠোঁট দুটোর অবস্থা দেখেছ কী হয়েছে। এখানের ফাটা লাল মাটির মত।

সুমন বলল, কথা না বলে শিগ্‌গিরি খেতে দাও তো!

আমি আমার ঘরে গেলাম। আমার প্রিয় ইজিচেয়ারটাতে বসলাম। আমার সাম্রাজ্যে। আমার বই, বইয়ের আলমারি, গড়গড়া। ছুটির দিনে গেঞ্জি আর পাজামা পরে সারা দিন বই পড়েই কাটে আমার। আমি বড় কুঁড়ে লোক। স্মার্ট, এনার্জেটিক, সামাজিক বলতে যে সব গুণ বোঝানো হয়, তার কোনো গুণই আমার নেই। আক্ষেপও নেই না-থাকার জন্যে।

তবে এই চাঁদোয়া-টোরীতে সরকারী কাজে বদলি হয়ে এসে পড়ার পরই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। স্মিতার জন্য। আমি তো সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে থাকব। অবসর সময় বই পড়ব। কিন্তু আমার চেয়ে দশবছরের ছোট সম্বন্ধ করে বিয়ে করা স্ত্রী স্মিতা? তার সময় কী করে কাটবে? ভাগ্যিস চানু হয়েছিল। এখানে যখন আসি চানুর বয়স পনেরো মাস। তবুও একটা নরম খেলনা ছিল স্মিতার। যে খেলনাকে খাইয়ে দাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, চোখ রাঙিয়ে ওর সময় কেটে যেত।

সময় তবুও কাটতো কী না জানি না, যদি সুমন এখানে বদলি হয়ে না আসত। বয়সে সুমন আর স্মিতা সমানই হবে। পাশের কোয়ার্টারে ও একা এসে উঠল। প্রথম প্রথম হাত পুড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অভ্যেস ছিল না রান্না করার। অচিরে স্মিতার সঙ্গে ওর একটা প্রগাঢ় সখ্যতা গড়ে উঠল। যদিও বউদি বলে ডাকত সুমন স্মিতাকে কিন্তু ওরা যে কত বড় বন্ধু একে অন্যের তা আমার মত কেউই জানত

না। সুমনকে পেয়ে স্মিতার যত ছেলেমানুষী শখ ছিল সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। পলাশ গাছে উঠে ফুল পাড়ত স্মিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে সুমনের সঙ্গে। কুরুর পথে আমঝরিয়ার বাংলোয় মুনলাইট পিকনিক করত। লাতেহারের কাছে বহু বছর আগে পরিত্যক্ত কলিয়ারির আশেপাশে ঘুরে ঘুরে শীতের দুপুরে ছেলেমানুষী প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ চালাতো।

কখনও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেত ওরা পীড়াপীড়ি করে। আমি না গেলে নিজেরাই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত মনে কলকেতে ডালটানগঞ্জের সাপ্লায়ারের দেওয়া অম্বুরী তামাক সেজে গড়গড়ার নল হাতে একটা বই নিয়ে আরাম করে ইজিচেয়ারে বসতাম। ওদের সঙ্গে যেতে যে হলো না এ কথা ভেবে আশ্বস্ত হতাম।

খাওয়ার টেবিলে ডাক দিলো স্মিতা। আমিও এসে গেলাম। শিঙাড়া বানিয়েছে ও। ক্ষীরের পুলি। লাতেহারের পণ্ডিতজির দোকান থেকে সে ওই আর কালাজামুন আনিয়েছে।

গব্‌গব্ করে খেতে খেতে সুমন বলল, আরো দাও, আরো দাও বউদি। তুমি এমন কিপ্‌টে হয়ে গেলে কী করে এক মাসের মধ্যে?

স্মিতা কপট রাগের সঙ্গে বলল, কিপ্‌টে আমি? মালখাঁনগরের বোসের ঘরের মেয়ে। ঐসব পাবে না আমার কাছে।

সুমন আমাকে বলল, দেখছো রবিনদা। ঐ শুরু হল। সর্বক্ষণ এমন এনিমি-ক্যাম্পে থেকে থেকে আমার হাওড়া জেলার ওরিজিনালিটিটাই মাঠে মারা গেল। বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে বসে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা ছাড়া খেতে পারি না দেখে মা আর দিদির তো চক্ষুস্থির। তোমাদের গল্প করতাম সব সময়। দিদিমা বললেন, সুমন তোকে শেষে ওই রেফিউজিগুলোর আদিখ্যেতায় পেল। ছিঃ ছিঃ।

কি বললে?

স্মিতা এবার সত্যিই বোধ হয় রেগে উঠল।

সুমন বলল, আহা রাগছো কেন, কী বললাম তাই-ই শোন। আমি বললাম, বাঙালদের মন খুব ভালো হয় দিদিমা। খোলামেলা জায়গায় থাকত তো, আকাশ-জোড় মাঠ, আদিগন্ত নদী কত মাছ, কত ঘি, কত কী...।

দিদিমা বললেন, থাক্ থাক্। সব রেফিজিউই জমিদার ছেল। ওসব গল্প আমাকে আর শোনাসনি। বহু শুনেছি।

বলেই সুমন হাসতে লাগল।

ও ছেলেমানুষ। ওর মনে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু ও এ কথাটা না বললেই ভালো করত। সকলেরই জমিদারি বা সচ্ছল অবস্থা না থাকলেও যাদের ছিল এ রকম কথা শুনলে তাদের বড়ই লাগে।

এখন বোধ হয় লাগে না আর। প্রথম প্রথম লাগত। এখন ব্যথার স্থান অবশ হয়ে গেছে। ক্ষত হয়েছে পুরোনো।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম...

...বরিশালে আমাদের দোতলা বাড়ির চওড়া বারান্দায় পূর্ণিমার রাতে বসে আছি ইজিচেয়ারে। থামের ছায়াগুলো পড়েছে বারান্দাতে কালো হয়ে। দীঘির পাড়ের সার সার নারকোলগাছের পাতায় চাঁদের আলো চক্‌চক্‌ করছে। সেরেস্তার দরজা জানালা বন্ধ। কুন্দলালজী তাঁর ঘরের সামনে চৌপায়ায় বসে দিলুরুবাতে বাহারে সুর তুলছেন। গ্রামে সন্ধ্যারতি শেষ করে শাঁখ বাজাচ্ছে। বাতাসে নারকোল পাতার নড়াচড়ার শব্দ। আরো কত কী গাছ। জামরুল গাছ, আমবাগান, লিচু গাছ, জলপাই গাছ, নিচে হাসনুহানা কাঠটগরের ঝোপ। পাশে পাশে হরেক রকমের চাঁপা। আমার দোতলার ঘরের জানালা অবধি উঠে এসেছে একটা কনকচাঁপার গাছ। গাড়ি ঢোকার পথের পাশে ছিল ম্যাগনেলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার সারি।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।

স্মিতা বলল, কী হল? তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সুমন বলল, রবিদাদা রাগ করলে নাকি?

আমি হাসলাম। বললাম, না রে পাগল।

স্মিতা সুমনকে বলল, আর দুটো শিঙাড়া খাবে?

সুমন বলল, দাও। কত্তোদিন পরে তোমার হাতের খাবার খাচ্ছি।

তারপর বলল, আসলে কলকাতায় গিয়ে তোমাদের গল্প, বিশেষ করে বউদির গল্প সকলের কাছে এতই করেছি যে তোমাদের সকলেই হিংসে করতে আরম্ভ করেছে। বউদিকে তো বিশেষ করে।

স্মিতা চায়ের কাপটা মুখের কাছে ধরে ছিল। দেখলাম, কাপের উপর ওর দুটি টানাটানা কালো চোখ সুমনের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেই নিথর হয়ে গেল।

চা খাওয়ার পর আমি আবার ঘরে ফিরে এলাম।

সুমন চানুকে কাঁধে করে স্মিতার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারে গেল। স্মিতা সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে। খাওয়ার সময় হয়ে যাবে চানুর।

ওরা দুজন যখন ফিরল সুমনের কোয়ার্টার থেকে তখন রাত গভীর। আমি এডওয়ার্ড জোস্টিং-এর লেখা হাওয়াই-এর ইতিহাস পড়ছিলাম। ইতিহাস পড়তে পড়তে হাজার বছরের ব্যবধান এত সামান্য মনে হয় যে ঘণ্টার খবর রাখতে তখন আর ইচ্ছে করে না।

দুপুরেই রান্না সেরে রেখেছিল স্মিতা। বুধাই-এর মা গরম করে দিলে খাওয়ার-দাওয়ার।

স্মিতা খাবার সাজিয়ে ও এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দ্যাখো, সুমন কত কী এনেছে আমাদের জন্যে। এইটা আমার শাড়ি। বলেই চেয়ারের উপর থেকে শাড়িটা তুলে দু হাতে মেলে ধরে দেখালো। তারপর বলল, এরকম একটাও শাড়ি তুমি আমাকে কিনে দাও নি।

আমি বললাম, এটা তো দারুণ দামী শাড়ি।

সুমন বলল, বউদি কী আমার কম দামী?

স্মিতা আবার আমাকে বলল, এই যে, তোমার পাঞ্জাবী ও পায়জামা। এই চানুর জামা প্যান্ট।

আমি রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললাম, করেছো কী সুমন, এই রকম নকশা কাটা চিকনের পাঞ্জাবি কি আমাকে মানায়? এ তো ছেলেমানুষদের জন্যে।

সুমন বলল, আপনি তো প্রায় তিন বছর কলকাতা যান না। এখন তো এই-ই ফ্রেজ। ঘাটের মড়ারা পর্যন্ত পরছে আর আপনি তো কিশলয় এখনও।

স্মিতা নরম গলায় বলল, এই যে শুনছ, দ্যাখো।

আমি বললাম, কি?

অ্যাই দ্যাখো, আমার জন্যে আরো কী এনেছে?

বলেই ছোটো দুটো প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। দেখি, এক জোড়া বেদানার দানার মত রুবির দুল, আর একটা ইন্টিমেট পারফ্যুম। ছোট্ট।

আমি সুমনকে বকলাম। বললাম, তুমি একটা স্পেন্ডথ্রিপট্ হয়ে গেছো। দিস ইজ্ ভেরি ব্যাড। সারা জীবন পড়ে আছে সামনে। বিয়ে করবে দুদিন পরে। এমন বেহিসাবীর মত খরচ করে কেউ?

স্মিতা বলল, দ্যাখো না, বেশি বেশি বড়লোক হয়েছেন!

সুমন বলল, বড়লোকদের জন্যে বড়লোকি না করলে কী চলে?

খেতে খেতে আমি ভাবছিলাম সুমন বেশ সুন্দর সপ্রতিভ কথা বলে, যা আমি কখনোই পারিনি পারবো না। স্মিতার যে ওকে এত ভালো লাগে তার কারণ অনেক। চিঠিও নিশ্চয়ই ভালোই লেখে। আমার তো এক লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। আমাকে অবশ্য কখনও লেখেনি ও অফিসিয়াল ব্যাপারের চিঠি ছাড়া। তবে স্মিতাকে প্রায় তিন-চারটে করে চিঠি লিখত প্রতি সপ্তাহে। যতদিন ছিলো না এখানে। এখানে ডাকপিওনে চিঠি বিলি করে না। আমার অফিসের পিওন ছেদীলাল মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে ডাক নিয়ে আসে রোজ। কোনোদিন ছেদীলাল পোস্ট অফিসে যেতে দেরি করলে বুধাই-এর মাকে পাঠাতো স্মিতা আমাকে মনে করিয়ে দিতো চিঠি আনার জন্যে।

যে ক'দিন সুমন ছিলো না, লক্ষ্য করলাম স্মিতা কেমন মনমরা হয়ে থাকত। বেলা পড়ে এলে, গা-টা ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, শালজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্মিতা বাইরের সিঁড়ির উপর বসে থাকত। শেষ বিকেলের আলোর মতো নরম হয়ে আসত ওর মুখের ভাব সুমনের চিঠি পড়তে পড়তে। ঘর থেকে আমি ডাকতাম ওকে, ও শুনতে পেত না। কোথায়, যেন কত দূরে চলে যেত ও মনে মনে।

২

সুমন শিগ্‌গিরি কলকাতা যাবে। ওর বিয়ে ঠিক করেছেন মা-বাবা। সকালে রাঁচি গেছে ও নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিতে।

অফিস থেকে ফিরছিলাম হেঁটেই। আমাদের অফিসটা কোয়ার্টারের কাছেই। দু'ফার্লং মত। অফিস যাতায়াতের জন্যে গাড়ি কখনোই নিই না এক বর্ষাবাদলের দিন ছাড়া। আকাশে তখনও আলো আছে। জঙ্গল থেকে শালফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে মহুয়া এবং করৌঞ্জের গন্ধ। পথের পাশে, জঙ্গলের সারির পাড়ে ফুলদাওয়াই-এর লাল ঝাড়ে মিনি লঙ্কার মত লাল লাল ফুল এসেছে। মাঝে মাঝে কিশোরীর নরম স্বপ্নের মতো ফিকে বেগুনী জীরহুলের ঝোপ।

লাতেহারের দিক থেকে একটা ট্রাক জোর চলে গেল চাঁদোয়ার দিকে। লাল ধুলো উড়ল, মেঘ হল ধুলোর: তারপর আলতো হয়ে ভাসতে ভাসতে পথের দু পাশের পাতায় গাছে ফিস্ ফিস্ করে চেপে বসল।

মিশিরজী আসছিলেন সাইকেল নিয়ে বস্তির দিক থেকে। হাওয়াতে তাঁর টিকি উড়ছিল, দেহাতী খদ্দরের নীল পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে। দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন, পরনাম্ বাবু।

আমি বললাম, প্রণাম।

হিন্দীটা আমি তখনও যথেষ্ট রপ্ত করতে পারিনি। সেদিকে সুমন পটু। পানের দোকানের সামনে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জর্দা পান খেতে খেতে ওর সমবয়সী স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে এমন ঠেট হিন্দীতে গল্প করে অথবা হিন্দী সিনেমার গান গায় যে, কে বলবে ও স্থানীয় লোক নয়। সব মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতা আছে সুমনের। ওর মধ্যে অনেক কিছু ভালো জিনিসই আছে যা আমার মধ্যে নেই।

মিশিরজী সাইকেলের টায়ারে কিরকির শব্দ করে নামলেন। বললেন, হালচাল সব ঠিক্কে বা?

আমি বললাম, ঠিক্কেই হ্যায়।

সুমনবাবু কি কোলকাত্তাসে শাদী করিয়ে আসলেন এবার?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো!

মিশিরজী অবাক হয়ে বললেন, আভ্‌ভি যাত্তে দেখা উন্‌কা স্কুটারমে। পিছুমে কই খুবসুরত্ আওরত থী। বড়ী প্যায়ারসে সুম্মনবাবুকো পাকড়কে বৈঠী হুয়ী থী।

আমি অবাক হলাম। বললাম, নেহী তো। বিয়ে তো করেনি।

তাজ্জব কি বাত্। তব্ সুমনবাবুকা সাথ্‌মে উও ক'ওন থী?

আমার মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, মেরা বিবি ভি হো সক্‌তি। দুজনের

মধ্যে খুব দোস্তী।

মিশিরজী বললেন, অজীব আদমী হায় আপ্ বড়াবাবু। দোস্তী উর পেয়ার কখনও এক হয়? আর মরদ ও আওরতের মধ্যে কী দোস্তী হয় বড়াবাবু? খালি পেয়ারই হোবে।

তারপরই হো হো করে হেসে বললেন, আপ্ বড়ী হিউমারাস আদ্মী হেঁ। নেহী তো, নিজের ধরম পত্নী কি বারেমে অ্যায়সী মজাক্ কেউ করতে পারে কভ্ভী?

আমার মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল, যে, মজাক্ করিনি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল, স্মিতা সব সময় আমাকে বলে তুমি খুব বোকা। কোথায় কী বলতে হয় জানো না।

সত্যি বড় বোকা আমি।

বাড়ি ফিরেই জানতে পেলাম যে, সত্যিই আমি মজাকী করিনি। রাঁচি থেকে নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিয়ে এসেই সুমন তার বউদিকে পিছনে চড়িয়ে টোড়ী থেকে বাঘড়া মোড়ে যে পথটা চলে গেছে তার মাঝামাঝি জায়গায় গভীর জঙ্গলের মাঝে বড়্হা-দেওতার থানে পুজো চড়াতে গেছে।

চানুটা কান্নাকাটি করছিল। আমাকে বলল বল খেলতে। আমি এসব পারি না। তবুও চা-টা খেয়ে বুধাই-এর মাকে বাড়ির কাজ করতে বলে আদর্শ বাবার মত চানুর সঙ্গে ওর লাল রবারের বল নিয়ে কোয়ার্টারের পিছনের মাঠে বল খেলতে লাগলাম।

আমার মন পড়েছিল হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহার রাজত্বে। অন্যমনস্ক থাকায় অচিরে বলটা লাফাতে লাফাতে কুঁয়োয় গিয়ে পড়ল। বালতি নামিয়ে অনেক চেষ্টা করেও উঠোতে পারলাম না বলটাকে, চানু কাঁদতে কাঁদতে বলল, সুমনকাকা তুলে দিয়েছিল, তুমি পারলে না। তুমি কিচ্ছু পারো না বাবা।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, সুমনকাকা এসেই তুলে দেবে।

তারপর চানুকে আবার বুধাই-এর মার জিম্মাতে দিয়ে আমি আমার ইজিচেয়ারে শায়িত হয়ে রাজা কামেহামেহার কাছে ফিরে গেলাম।

ওদের ফিরতে বেশ রাত হল। স্মিতার শাড়ি এলোমেলো, ধুলোলাগা বিস্রস্ত চুল। খোঁপায় দলিত জংলী ফুল আর মুখে কী এক গভীর আনন্দের ছাপ।

সুমন বলল, স্কুটারটা খারাপ হয়ে গেছিল বাঘের জঙ্গলে। কী ভয় যে করছিল, কী বলব। বাঘের জন্যে নয়, পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত হল বলে।

আমি বললাম, ফাজিল।

চানু বলল, এক্ষুণি আমার বল তুলে দাও সুমনকাকু। বাবাটা কিছু পারে না। বল পড়ে গেছে কুঁয়োর মধ্যে।

সুমন ঐ অন্ধকারেই টর্চ হাতে করে কুঁয়ো-পাড়ে গিয়ে চানুর বল তুলে নিয়ে

এলো। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেল।

সে রাতে স্মিতাকে আদর করতে যেতেই ও বলল, আজ থাক লক্ষ্মীটি। আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

ওর সুন্দর, ছিপছিপে এলানো শরীর, গভীর নিঃশ্বাস, ওর বুকের ভাঁজে সুমনের দেওয়া ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ সব মিলেমিশে ওকে বিয়ের রাতের স্মিতার মতো মনে হচ্ছিল।

আমি আর কিছু বলার আগেই স্মিতা ঘুমিয়ে পড়ল। চাঁদের আলোর এক ফালি জানালা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছিল। স্মিতার মুখে বড় প্রশান্তি দেখলাম। খুব, খুব, খুউব আদর খাওয়ার পর, আদরে পরম পরিতৃপ্ত হবার পর মেয়েদের মুখে যেমন দেখা যায়।

আমার ঘুম আসছিল না। মিশিরজীর দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক। পান খেয়ে খেয়ে কালো হয়ে গেছে সেগুলো। গায়ে দেহাতি ঘামের পুরুষালী গন্ধ। হঠাৎ মিশিরজীর উপর খুব রাগ হল আমার। আমি ইজিচেয়ারে শুয়ে টেবল-লাইট জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহার ও রাণী কাহুমানুর কাছে ফিরে গেলাম। খুব প্রশান্তি। ইতিহাসের মতো আনন্দের, শান্তির আর কিছুই নেই।

পরদিন চা খেতে খেতে স্মিতা বলল, সুমনের বিয়ের কথা লিখে আবার চিঠি দিয়েছেন ওর বাবা। কাল-পরশু ওর এক কাকা আসবেন রাঁচি হয়ে, ওর কাছে ঐ ব্যাপারে আলাপ, আলোচনা করতে। আমি কিন্তু খেতে বলে দিয়েছি তাঁকে। যেদিন আসবেন, সেদিন রাতে।

আমি বললাম, বেশ করেছো। না বললেই অন্যায় করতে।

৩

সুমনের কাকার চেহারাটা আমার একটুও ভালো লাগল না। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমেই সকালের বাসে এসে নাকি এখানের লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন। সুমনের কাছে যখন অফিসে এসে পৌঁছন, তখন বিকেল চারটে! রাতে যখন খেতে এলেন আমাদের বাড়ি, তখনই তাঁকে দেখলাম। অশিক্ষিত বড়লোকদের চোখে মুখে যেমন একটা উদ্ধত নোংরা ভাব থাকে, এই ভদ্রলোকের মুখেও তেমন। বালিতে থাকেন। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করেন। কালোয়ার ভদ্রলোক কেবলই স্মিতাকে লক্ষ্য করেছিলেন। বেশ অভব্যভাবে।

আমার মনে হল, উনি আসলে সুমনের বিয়ের কারণে আসেন নি। এসেছেন স্মিতাকে দেখতে।

খেতে খেতে অসম্মান ও অপমানে কান লাল হয়ে উঠল।

সেই রাতেই আমি প্রথম স্মিতাকে কথাটা বললাম। না বলে পারলাম না। মিশিরজীর কথা বললাম। সুমনের কাকার কথা বললাম। বললাম, ছোট জায়গা, অশিক্ষিত অনুদার সব লোকের বাস, বাড়ির বাইরে একটু বুঝে শুনে চলাফেরা করতে।

স্মিতা চুপ করে আমার কথা শুনল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুই বলল না।

আমি বললাম, তোমার ব্যবহারে সুমনকে যদি তোমার স্বামী বা প্রেমিক বলে ভুল করে বাইরের লোকে, তাহলে আমার পক্ষে তা কী খুব সম্মানের?

স্মিতা রেগে উঠল। বলল, আচ্ছা! তুমি কী? স্কুটারে বসলে যে চালায় তাকে না জড়িয়ে ধরে কেউ বসতে পারে?

তারপর বলল, মিশিরজী বা কে কী বলল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তুমি কী বলো সেটাই বড় কথা।

আমি বললাম, আমি কি কখনও কিছু বলেছি? কিন্তু নিজের সম্মানের কারণে না বলেও তো উপায় দেখছি না এখন। তোমাকে যদি লোকে খারাপ বলে তা কি আমার ভালো লাগবে?

স্মিতা বলল, নিজের মনের কথাও যে ঐ, তা তো বললেই পারো। অনেকদিন আগে বললেই পারতে। নিজের কথা অন্যের মুখের কথা বলে চালাচ্ছো কেন?

আমি স্মিতার কথায় ব্যথিত হলাম। কিছু না বলে ইজিচেয়ারের নিরুপদ্রব রাজত্বে ফিরে গেলাম।

কয়েকদিন পরেই সুমনের খুব জ্বর হল। আমি বলেছিলাম, ও আমাদের বাড়িতেই এসে থাকুক। ছেলেমানুষ বিদেশে বেহুঁশ অবস্থায় একা বাড়িতে থাকবে কি করে? তা ছাড়া ক'দিন পরেই ওর বিয়ে। কী অসুখ থেকে কোন্ অসুখে গড়ায় তা কে বলতে পারে?

স্মিতা জেদ ধরে বলেছিল, না। আমাদের বাড়িতে ও মোটেই থাকবে না।

বলেছিলাম, তাহলে ওর সেবা-শুশ্রূষা করো। রাতে না হয় আমিই গিয়ে থাকবো। তুমিও থাকতে পারো ইচ্ছে করলে।

স্মিতা বললে, থাক্, এত ঔদার্য নাই-ই বা দেখালে। তোমার মিশিরজীরা কী তাহলে চুপ করে থাকবে?

সারাদিন স্মিতাই দেখাশোনা করল। রাতে আমিই গেলাম সুমনের বাড়ি। ওর শোবার ঘরে ক্যাম্পখাট পেতে থার্মোমিটার, ওষুধ, ওডিকোলন সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল স্মিতা।

নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না আমার। অনেকক্ষণ জেগে বসে বসে সিগারেট খেলাম। তারপর পাশের ঘরে গেলাম। সুমন তখন ঘুমোচ্ছিল। পাশের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি পড়েছিল। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা। সুমনের নামের। সুমনের

মায়ের চিঠি।

কেন জানি না, ঐ নিস্তব্ধ রাতে, ঝিঁঝিঁর ডাকের মধ্যে আমার মন বলল, এই চিঠির ভিতরে এমন কিছু আছে যা স্মিতা ও সুমনের সম্পর্ক নিয়ে লেখা। টেবল-লাইটের সামনে চিঠির ভিতরে আঙুল দিয়ে চিঠিটা গোল করে ধরে পড়তে লাগলাম চিঠিটা। যতটুকু পড়তে পারলাম, তাই যথেষ্ট ছিল।

সুমনের মা লিখেছেন, সুমনের কাকার চিঠিতে জানতে পেরেছেন তিনি যে, সুমন একটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে। এক ভেড়ুয়ার বউ সে। সুমন জানে না যে, সুমনের কত বড় সর্বনাশ সেই মেয়ে করছে ও করতে চলেছে। সুমন ছেলেমানুষ। মেয়েদের পক্ষে কী করা সম্ভব আর কি অসম্ভব সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই নেই। সুমনের ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকদের কোনো আত্মীয়ের কাঠের ব্যবসা আছে লাতেহারে। তাঁরাও খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, সুমনের কাকা যা জানিয়েছে তা সত্যি। পাত্রীপক্ষ বেঁকে বসেছে যে, ঐ বজ্জাত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ না করলে এবং বিয়ের পরেই ওখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসার চেষ্টা না করলে এ বিয়ে হবে না। এত সুন্দরী ও বড়লোকের মেয়েও আর পাওয়া যাবে না। তাদের দেয় পণের টাকাতেই সুমনের বোন মিনুর বিয়ে হয়ে যাবে। যদি সুমনের তার বাবা, মা, বোন তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তার নিজের সম্বন্ধেও কোনো মমত্ব থাকে তাহলে এই রেফিউজি ডাইনির সঙ্গে সব সম্পর্ক এক্ষুণি ত্যাগ করতে হবে। সুমনের ট্রান্সফারের জন্যে অথবা সেই ডাইনির ভেড়া স্বামীর ট্রান্সফারের জন্যেও পাটনাতে তাঁরা মুরুব্বি লাগিয়েছেন। সুমনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ও তার কচি মাথা ঐ ডাইনি কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। অমন ছেনাল মেয়েছেলের কথা ওঁরা জন্মে শোনেনি।

বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। হাওয়াই-এর ইতিহাসটা বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। আমার ঘুম হবে না। কামেহামেহার সঙ্গে থাকলেই ভালো করতাম।

পরে মনে হল, এ চিঠিটা স্মিতাকে দেখানো উচিত। আমার মতো স্বামী বলে কী আমার চোখের সামনে যা নয় তাই করে বেড়াবে। ওদের মধ্যে সম্পর্ক কতদূর গড়িয়েছে তা কে জানে? এই সম্পর্কে সুমনের উৎসাহই বেশি ছিল, না স্মিতার নিজের; তা ভগবানই জানেন। এ সংসারে ভালোমানুষির শাস্তি এইভাবেই পেতে হয়। ভালোমানুষ মানেই বোকা মানুষ। যে নিজের জরু-গরু শক্ত হাতে পাহারা দিয়ে রাখতে না পারে তার মান-সম্মান এমনি করেই ধুলোয় লুটোয়। বড় বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, এই পৃথিবী; এই মেয়েছেলের জাত। এরা কার ছেলে কখন কোলে করে বড় করে ফেলে তা আমার মতো ভেড়া স্বামীর জানার কথা নয়।

দ্যা ল্যাম্ব্। ভেড়া। সত্যি সত্যিই আমি একটা ভেড়া!

৪

সুমনের জ্বর যেদিন ছাড়ল সেদিনও লিকুইডের ওপর রাখল স্মিতা ওকে। পরদিন সুমন যা যা খেতে ভালোবাসে—সুজির খিচুড়ি, মুচ্‌মুচে বেগুনী, কড়কড়ে আলু ভাজা, হট্ কেসে ভরে খাওয়ার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এল স্মিতা।

জ্বর ভালো হতেই সুমন আমাদের কাউকেই কলকাতায় যেতে বলল না। আমাদের নামে ওদের বাড়ি থেকে কোনো কার্ডও এলো না। সুমনই একটা কার্ডে কালি দিয়ে আমাদের নাম লিখে পাঠিয়ে দিল ছোটুয়ার হাতে।

স্মিতা আমাকে বলল, বিয়ে করতে যাচ্ছেন, ভারী লজ্জা হয়েছে বাবুর। বিয়ে যেন আর কেউ করে না। নিজে হাতে কার্ড দিতেও লজ্জা!

সুমন যেদিন যায়, রাঁচি হয়ে গেল ও। আমরা বাস স্ট্যান্ডে ওকে তুলে দিয়ে এলাম। চানু বলল, কাকীমাকে নিয়ে এসো কিন্তু সুমনকাকু, আমরা খুব বল খেলবো।

স্মিতা হেসে বলল, তোমার ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখবো, স্টেশনে তোমাদের আনতে যাব আমরা। সেদিন তোমার বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট রেখো না। আমাদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে; থাকবে সারাদিন।

সুমন জবাব দিলো না কোনো।

শুধু বলল, চলি।

বাসটা ছেড়ে দিলো।

সুমন চলে যাওয়ার পরই আমাদের বাড়িটাতে আশ্চর্য এক বিষাদ নেমে এল। সুমন এর আগেও অনেকবার ছুটিতে গেছে। কিন্তু এবারের যাওয়াটা অন্যরকম। যে সুমন বাসে উঠে চলে গেল সেই সুমন আর ফিরবে না এই টোড়িতে। আমি সে কথা জানতাম। স্মিতাও জানতো। যদিও ভিন্নভাবে।

এবারে গিয়ে অবধি একটাও চিঠি দিলো না সুমন স্মিতাকে। আমাকে না জানিয়ে ছেদীলালকে পোস্টাপিসে পাঠাতো স্মিতা চিঠির খোঁজে। স্মিতার মানসিক কষ্ট দেখে আমি এক পরম পরিতৃপ্তি পেতাম। যে নিজে কাউকে আঘাত দিতে শেখেনি, দুঃখ দিতে জানেনি, তার অদেয় আঘাত ও দুঃখ যে অন্যজনকে অন্য কোণ থেকে এসে বাজে এই জানাটা জেনে ভারী ভালো লাগছিল আমার।

মনে মনে বললাম, শাস্তি সকলকেই পেতে হয়। তোমাকেও পেতে হবে, স্মিতা।

স্মিতা আমার সঙ্গে কোনোদিন সুমনের এই হঠাৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেনি। সুমনের সঙ্গেও করেছিল বলে জানি না। করলেও তা আমার জানার কথা নয়। ওদের সম্পর্কটা গভীর ছিল বলেই সুমনের হঠাৎ পরিবর্তনের আঘাতটা স্বাভাবিক কারণেই বড় গভীরভাবে বেজেছিল ওর বুকে।

এ কথা বুঝতাম।

স্মিতা মুখ বুজে সংসারের সব কর্তব্যই করত। আমাকে খেতে দিত। জামা-কাপড় এগিয়ে দিত। লেখাপড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখত। শোওয়ার সময় মশারি গুঁজে দিত। তারপর নিজে বারান্দায় বসে থাকত। মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যেতে গিয়েও দেখতাম স্মিতা বারান্দায় বসে আছে অন্ধকারে।

বলতাম, শোবে না?

পরে। অস্ফুটে বলত ও।

শুধোতাম, মশা কামড়াচ্ছে না?

ও বলত, নাঃ।

আমি মনে মনে বলতাম, পোড়ো, নিজের কৃতকর্মের আগুনে পুড়ে মরো নিজে।

ব্যাটারীতে-চলা একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিল আমাদের বাড়িতে। বিয়ের সময় কে যেন দিয়েছিল। তাতে ঐ সময় একটা গান প্রায়ই চাপাত স্মিতা। রবিঠাকুরের গান ঃ "মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়.." ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম লাইন ঃ পুরানো সেই দিনের কথা...

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো আসক্তি নেই। খুব বেশি শুনিও নি। কিন্তু ঐ গানটার মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিল। সেটা আমার অসহ্য লাগত।

একদিন স্মিতা সন্ধ্যাবেলায় পাণ্ডে সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিল চানুকে নিয়ে তাঁর মেয়ের জন্মদিনে। সেই সময়ে তাক থেকে বই নামাতে গিয়ে আমার হাতের ধাক্কা লেগে রেকর্ডটা মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে গেল।

আমি কি অবচেতন মনে রেকর্ডটাকে ভাঙতেই চেয়েছিলাম? জানি না।

বুধাই-এর মা শব্দ শুনে দৌড়ে এল। আমি বললাম, বই নামাতে গিয়ে পড়ে গেল। এগুলো তুলে রাখো। বউদি এলে দেখে যে কী করবে, বউদিই জানে।

স্মিতা ফিরে এসে শুনল। ও ভাঙা টুকরোগুলোকে ফেলে না দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখল। আমাকে কিছুই বলল না। জবাবদিহিও চাইল না।

"আরেকটি বার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয়,
মোরা সুখের দুখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তায়"...

খেতে দাও বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। কখনই চেঁচাই না আমি। কিন্তু সে রাতে চেঁচালাম। কি জানি, কেন?

স্মিতা আমাকে খেতে দিলো। চানুকে খাওয়ালো।

আমি বললাম, খাবে না?

নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, তোমরা খাও। এই-ই তো খেলাম। খিদে নেই। পরে খাবো।

আমি বুঝতে পারছিলাম স্মিতা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

বুধাই-এর মা বলল, তুমি বিমার পড়বে, মাঈজী। কিছুই খাওয়া-দাওয়া করছো না তুমি!

স্মিতা ওকে ধম্‌কে বলল, তুমি চুপ করো তো! অনেক খাই।

আমি আঁচাতে আঁচাতে ভাবছিলাম সুমন চলে যাবার পর সত্যিই অনেক রোগা হয়ে গেছে স্মিতা। কিন্তু কী বলব, কেমন করে বলব ঃ ভেবে পেলাম না। শুধু বলতাম নিজের শরীরের অযত্ন করলে নিজেই ঠকবে।

স্মিতা আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। আমার হাতে লবঙ্গ দিলো। রোজ যেমন দেয়। তারপর আমার সামনে থেকে নিঃশব্দে চলে গেল।

কাল সুমনরা আসবে।

স্মিতা আর আমি দুজনেই গাড়ি নিয়ে রাঁচী গিয়ে ফিরায়েলালের দোকান থেকে সুমন আর সুমনের স্ত্রী অলকার জন্যে আমাদের সাধ্যাতীত প্রেজেন্ট কিনে এনেছি। ফুলের অর্ডার দিয়ে এসেছি। কাল সকালের বাসে টাটকা মাছ, ফুল, রাবড়ি, সন্দেশ সব নিয়ে আসবে বলে বাসের ড্রাইভারকে টাকা এবং বকশিশও দিয়ে এসেছি।

স্মিতারও ভাই নেই; আমারও নেই। বেশ ভাইয়ের বিয়ে, ভাইয়ের বিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের।

ভোর পাঁচটা থেকে উঠে পড়েছে স্মিতা। এ ক'দিনে অ-নেক রোগা হয়ে গেছে ও সত্যিই। কিন্তু চেহারাটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। চোখ দুটি আরও বড় বড় কালো; কাজল টানা। বিরহ মানুষকে সুন্দর করে। চোখের সামনে দেখছি।

অন্যান্য রান্না করতে-না করতেই মাছ এসে গেল। দই-মাছ করেছে কাতলা মাছের। খুব ভালবাসে সুমন। মুড়িঘণ্ট। মাছের টক। মুরগীর কারি। পোলাও। সঙ্গে তো মিষ্টি ও রাবড়ি আছেই। রাতের জন্য আরও বিশেষ বিশেষ পদ। ফিশ্‌ রোল।

আমি অফিসে একবার বুড়ি-ছুঁয়েই চলে এসেছি। অফিসে সুমনের সব সহকর্মীরাও উৎসুক হয়ে কখন ওরা এসে পৌঁছায় তার প্রতীক্ষায় ছিল। আমার এখানেই চলে আসতে বলেছি সক্কলকে সুমনের "বড়ো-ভাই" হিসেবে। ওদের সকলের জন্যে মিষ্টি-টিষ্টিও এনে রেখেছি। বউ দেখে মিষ্টিমুখ করে যাবে বলে।

স্মিতা রান্না-বান্না এগিয়ে নিয়েই সুমনের কোয়ার্টারে গেল ফুলশয্যার ঘর সাজাতে। নিজের আলমারী খুলে নতুন ডবল বেডশীট, বেডকভার, ডানলোপিলো বালিশ, মায় আমার সাধের কোলবালিশটিকে পর্যন্ত ধোপাবাড়ির ওয়াড় টোয়ার পরিয়ে ভদ্রস্থ করে নিয়ে চলে গেছে।

এমনই ভাব যে, সুমন নতুন বউ-এর সঙ্গে শোবে না তো যেন স্মিতার

সঙ্গেই শোবে।

মেয়েদের ভালোবাসার রকমটাই অদ্ভুত!

যে সময়ে ওদের আসবার কথা, সে সময়ে ওরা এলো না। আমি দুবার খোঁজ নিলাম অফিসে কোনো ফোন এসেছে কি না রাঁচী থেকে তা জানার জন্যে। রাঁচী এক্সপ্রেস ভোরেই পৌঁছয়। রাঁচী থেকে আসা সব বাসও চলে গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার সব তৈরি, এমন সময় আমাদের চৌধুরী এসে বলল যে, তার কাছে সুমন চিঠি লিখেছে যে, প্লেনে আসছে কোলকাতা থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আসবে এখানে। বিকেল বিকেল পৌঁছবে, রাঁচীর মেইন রোডের কোয়ালিটিতে লাঞ্চ করে। আমাকে কিছুই জানায়নি শুনে চৌধুরীও খুব অবাক হল।

স্মিতাকে জানালাম। বললাম, চলো, তাহলে বসে থেকে আর লাভ কী হবে? আমরা খেয়েই নিই।

স্মিতা আমাকে খেতে দিলো। কিন্তু নিজে খেলো না। বলল, সারাদিন রান্নাঘরে ছিলাম, গা-বমি-বমি লাগছে।

স্মিতা এই খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ওর আনত চোখে বড় ব্যথা দেখলাম।

সন্ধ্যের মুখে মুখে সুমন আর অলকা এল ট্যাক্সিতে করে। সঙ্গে কোয়ালিটির খাবারের প্যাকেট। রাঁচীর কোয়ালিটি থেকে তন্দুরী চিকেন আর নান্ নিয়ে এসেছে রাতের খাওয়ার জন্যে।

এ খবরটা আমি আর স্মিতাকে দিলাম না।

ওরা যেহেতু আমাদের বাড়িতে এলোই না, অফিসের সকলে ওখানেই গেল।

বুধাই-এর মা এবং আমি নিজে মিষ্টি-টিষ্টি সব বয়ে নিয়ে গেলাম ওর কোয়ার্টারে। সুমনের দাদা হিসাবে সকলকে যত্ন-আত্তি করলাম।

সকলে বলল, বউদি কোথায়? ভাবিজি কোথায়?

আমি বললাম, আসছে।

তারপর আমি নিজেই স্মিতাকে নিতে এলাম। দেখলাম, স্মিতা চান করে সুমনের কোলকাতা থেকে আনা সেই সুন্দর লাল আর কালো সিল্কের শাড়িটা পরেছে। কানে সুমনের দেওয়া বেদানার দানার মত রুবির দুল। গায়ে সুমনেরই ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ।

আমি বললাম, চলো স্মিতা।

স্মিতা বলল, সুমনের স্ত্রী কেমন দেখলে?

আমি বললাম, দেখিনি এখনও।

চানু আগেই বুধাই-এর মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। আমি আর স্মিতা এগোলাম।

আমাদের দেখে সুমন উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, এই যে রবিদা আর বউদি।

সুমনের স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার করল। স্মিতার দিকে ফিরেও তাকাল না।

সুমন ঠাণ্ডা নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, বউদি! কেমন হয়েছে আমার বউ?

স্মিতা মুখ নীচু করে বলল, ভালো ; খুব ভালো।

বলেই বলল, তোমরা খেতে রাতে আমাদের ওখানে যাবে তো?

অলকা কাঠ-কাঠ গলায় সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, রাতের খাওয়ার তো নিয়ে এসেছি রাঁচী থেকে। কষ্ট করার কী দরকার ওঁদের?

স্মিতা কিছুই বলতে পারল না।

আমি বললাম, তোমরা যা ভালো মনে করো, করবে।

অফিসের সহকর্মীরা হই হই করে উঠলো। বলল, ইয়ার্কি নাকি? দাদা বউদি কাল রাঁচী থেকে বাজার করে আনলেন, সারা দিন ধরে রান্না করলেন বউদি, আর তোমরা খাবে না মানে? এ কেমন কথা?

অলকা আমাকে বলল, তাহলে এখানেই যদি পাঠিয়ে দ্যান। আমরা বড় টায়ার্ড!

চানু কিছুক্ষণ সুমনের কোলের কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে বুঝলো যে, সুমনের ওপর তার যে নিরঙ্কুশ দাবি ছিল তা আর নেই। শাড়ি-পরা একজন নতুন মহিলা এখন তার সুমনকাকুর অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। সুমনকাকু বল খেললো না, তাকে কাঁধে চড়াল না, তাকে তেমন আদরও করল না দেখে সে তার মায়ের আঁচলের কাছে সরে গেল। শিশুরা আদর যেমন বোঝে, অনাদরও।

স্মিতা সুমনকে বলল, তাহলে তাই-ই হবে। খাওয়ার সব এখানেই পাঠিয়ে দেবো। ক'টায় পাঠাবো? ন'টা নাগাদ?

সুমন এই প্রথমবার চোখ তুলে তাকাল। স্মিতাকে দেখল। ওর ভালোবাসায় মোড়া শাড়িতে, ওর আদরে দেওয়া রুবির দুল পরা স্মিতা। কিন্তু স্মিতা যে খুব রোগা হয়ে গেছে তাও নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়ল। সুমনের চোখ দুটি এত আনন্দের মাঝেও হঠাৎ ব্যথায় যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্মিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই চোখ নামিয়ে বলল, আচ্ছা বউদি, ন'টার সময়ই পাঠিও।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনের স্ত্রী সুমনের দিকে তাকাল।

স্মিতা চানুকে নিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল। আমি রয়ে গেলাম, তক্ষুণি চলে গেলে খারাপ দেখাতো। চেনা-জানা এত লোক চারপাশে।

কত লোক কত কথা বলছিল, রসিকতা, হাসি ঠাট্টা। ওদের শোবার ঘর ভারী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে একথা সকলেই বলল।

অলকা কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, কে সাজালেন শোওয়ার ঘর?

তিনি বললেন, রবিদাদার স্ত্রী, স্মিতা বৌদি।

অলকা বলল, তাই-ই বুঝি!

অতিথিরা একে একে সকলেই চলে গেলেন। বুধাই-এর মা আর ছোটুয়া যতক্ষণ না ওদের খাওয়ার নিয়ে এলো ততক্ষণ আমাকে থাকতেই হলো। বুধাই-এর মা এসে বলল, বউদির শরীর খারাপ—সারাদিন রান্নাঘরে ধকল গেছে—বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়েছিল। এই খাবার-দাবার কোনোরকমে বেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

তারপর বুধাই-এর মা সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল, বউদি আসতে পারলো না।

সুমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

অলকা আমাকে বলল, আপনি তাহলে যান ওঁনার কাছে। শরীর খারাপ যখন।

আমি বললাম, আপনারা একা একা খাবেন?

চৌধুরী বলল, আরে দাদা, ওরা তো এখন একাই থাকতে চাইছে। দেখছেন না, আমাদের সকলকে কীভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

আমি হাসলাম। হাসতে হয় বলে। তারপর বললাম, আচ্ছা! তাহলে তোমরা ভালো করে খেও।

দু-একজন কৌতূহলী, অত্যুৎসাহী মহিলা বাসরে বর-বউ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে রয়ে গেলেন।

সুমন দরজা অবধি এলো একা একা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে কী যেন বলবে বলবে করল; তারপর বলল না। শুধু বলল, আচ্ছা রবিদা।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। চানু ঘুমিয়ে পড়েছে। বুধাই-এর মা একা বসে আছে খাওয়ার ঘরে, মোড়া পেতে; দেওয়ালে মাথা দিয়ে।

বুধাই-এর মা বলল, দাদাবাবু, আপনি খাবেন না?

বউদি খেয়েছেন?

বউদির শরীর ভালো না। শুয়ে রয়েছেন।

আমি বললাম, আমাকে এক গ্লাস জল দাও বুধাই-এর মা। আমিও খাবো না। শরীর ভালো নেই।

বুধাই-এর মা জল এনে দিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

আমি চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে। তার চোখেও দেখলাম বড় ব্যথা।

বললাম, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো বুধাই-এর মা।

বুধাই-এর মা বলল, আমার খিদে নেই একদম।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি স্মিতা সেখানে নেই। পাশের ঘরে ঢুকলাম। দেখি, চানুর পাশে স্মিতা উপুড় হয়ে সন্ধ্যেবেলার সেই লাল-কালো সিল্কের শাড়িটা পরেই শুয়ে আছে। ওর হালকা ছিপছিপে গড়ন চানুর পাশে অল্পবয়সী ওকে

চানুর মা বলে মনেই হচ্ছিল না।

আমি কাঠখোট্টা লোক। বুঝি কম। ভাবি কম। কিন্তু কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট আর ছেলেমানুষ স্ত্রীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম দরজায় দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরে আমি ইজিচেয়ারে শুলাম।

অন্ধকার রাতে তারারা সমুজ্জ্বল। জঙ্গলের দিক থেকে মিশ্র গন্ধ আসছে হাওয়ায় ভেসে। শিয়াল ডাকছে লাতেহারের দিকের রাস্তা থেকে। গোঁ গোঁ করে মাঝে মধ্যে দুটি একটি মার্সিডিস ডিজেল ট্রাক যাচ্ছে দূরের পথ বেয়ে। আজ বাইরেও রাত বড় বিধুর। রাতের পাখিরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। ঝিঁঝির একটানা ঝিনঝিন রবের ঘুমপাড়ানি সুর ভেসে আসছে জঙ্গলের দিক থেকে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আমি কত কি ভাবছিলাম। এমন সময় ঘরে একটা মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ হল। পারফ্যুমের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। স্মিতা কথা না বলে সোজা এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমার মধ্যে যে খারাপ মানুষটা বাস করে সে বলল, আঘাত দাও ওকে। এমন শিক্ষা দাও যে, জীবনে যেন এমন আর না করে! ওর প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও অনীহাতে আমার মন ভরে উঠল। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল আমার মধ্যের সেই আমিত্বময় সাধারণ স্বামী।

কান্নার বেগ কমলে আমি বললাম, কি হলো?

ও বলল, আমার জন্যে আজ তোমার এত লোকের সামনে...আমার জন্যেই। আমি জানি।

আমি চুপ করে রইলাম।

আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

কিসের শাস্তি?

ভুলের শাস্তি।

আমি বললাম ব্যঙ্গাত্মক স্বরে, ভালোবেসেছিলে বলে অনুতাপ হচ্ছে?

স্মিতা এবার মুখ তুলল। আমার পায়ের কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে বলল, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা...

আমি বললাম? আমিই কি বললাম, আমার কী এমন রূপ গুণ আছে যাতে তোমার শরীরে ও মনে চিরদিন একা আমি সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারি? সংসারের একজন স্বামীরই কী আছে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমার ভাগে যা পড়েছিল তাই-ই তো যথেষ্ট ছিল। সেই ভাগের ঘরে কোনো শূন্যতা তো কখনও অনুভব করিনি স্মিতা! সত্যিই করিনি।

স্মিতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার বোকা, অগোছালো, ভুলোমনের স্বামীর দিকে।

দূরের ঝাঁটি জঙ্গল ভরা মহুয়াটাঁড়ে চম্‌কে চম্‌কে রাতচরা টি-টি পাখিরা ডেকে ফিরছিল। হাওয়া দিয়েছিল বনে বনে। কারা যেন ফিস্‌ফিস্‌ করছিল বাইরে!

ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে আর একজন মানুষ সুমন তার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। স্মিতারই ভালোবাসার হাতে-পাতা বিছানাতে।

সুমন এখন কী ভাবছে কে জানে? কিন্তু যদি স্মিতার কথা সুমন একবারও ভাবে তাহলে আমার মতো সুখী এ মুহূর্তে আর কেউই হবে না।

অনেক বছর আগে বিয়ের রাতে যজ্ঞের ধোঁয়ার মধ্যে বসে যেসব সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম তার বেশিরই মানে বুঝিনি। সেদিন আমি আমার কোনো যোগ্যতা ব্যতিরেকেই স্বামী হয়েছিলাম স্মিতার।

স্মিতা কাঁদছিল নিঃশব্দে। আমার বুক ভিজে যাচ্ছিল ওর চোখের জলে। কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগছিল।

স্মৃতিতে হঠাৎই বউভাতের রাতটা ফিরে এল। তখন মা বেঁচে ছিলেন। জ্যাঠামণি, রতনমামা। স্মিতার বাবাও। আরো কেউ কেউ। আজ যাঁরা নেই। আমার পুরোনো বন্ধুরা, কত আনন্দ, কল্পনা সে-রাতে; সুগন্ধ সানাই...।

স্মিতার মাথায় হাত রেখে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎই মনে হল যে-আমি টোপর মাথায় দিয়ে সমারোহে গিয়ে স্মিতাকে একদিন তার পরিবারের শিকড়সুদ্ধু উপড়ে এনেছিলাম তার সঙ্গে যে মানুষটা তার স্ত্রীর সুখে দুঃখে জড়াজড়ি করে অনেক অবিশ্বাস ও সন্দেহ পায়ে মাড়িয়ে বিবাহিত জীবনের কোনো বিশেষ বিলম্বিত মুহূর্তে সত্যিই স্বামী হয়ে উঠলাম, তাদের দুজনের মধ্যে বিস্তরই ব্যবধান।

"বর হওয়া" আর "স্বামী হওয়া" বোধহয় এক নয়।

ফ্রিস্টাইল

সমরেশ মজুমদার

মেয়েটি হাঁটছিল। টাইট জিনস আর টপে চমৎকার মানিয়েছে। চুলে সিল্কি ঢেউ কোমর অবধি নেমেছে। চোখে রোদ চশমা।

একটি যুবক মেয়েটিকে অনুসরণ করছিল। ব্যবধান কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাশে চলে আসতে পারল। মেয়েটি তাকে দেখছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে যুবক বলল, 'এক্সকিউজ মি' তার গলা শুকনো।

ক্ষমা করার কোন ইচ্ছে মেয়েটির না থাকায় সে হেঁটেই যাচ্ছিল।

যুবক আবার কথা বলল 'আচ্ছা আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো।'

মেয়েটি গম্ভীর গলায় বলল 'পুরোন হয়ে গিয়েছে। বস্তা পচা। ঠাকুমা ঠাকুর্দ্দার আমলের সংলাপ। বোকা বোকা।'

'তাহলে'?

'নতুন কিছু স্টকে না থাকলে কেটে পড়াই ভাল।' মেয়েটি বলল।

'ও। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।' যুবক মরিয়া হল।

'ট্র্যাস! বাবাদের আমলের কথাবার্তা।' মেয়েটি চেয়েও দেখল না।

যুবক ঢোক গিলল। তারপর বলে চলল, 'ওয়েল, তুই কি এখন খুব ব্যস্ত? এক মিনিট দাঁড়াতে পারবি?'

মেয়েটি আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়ে যুবককে আপাদমস্তক দেখল, 'গুড! এত দ্রুত ইমপ্রুভ করলি কি করে?'

যুবক মেয়েটির চোখ দেখতে পাচ্ছে না। উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল।

মেয়েটি বলল, 'বাঃ। নাচতে পারিস বলে মনে হচ্ছে?'

'শিখিনি তবে পারি। পাড়ায় পুজোয় ধুনুচিনাচ নেচে প্রাইজ পেয়েছি। একবার রিহার্সাল দিলেই গোবিন্দার মত নাচতে পারব।'

যুবক খুব আত্মবিশ্বাসী গলায় জবাব দিল।

'কি করিস? বেকার?' মেয়েটি ঠোঁট মোচড়ালো।

'দুমাস আগে ছিলাম। তুই?'

'এম বি এ দিয়েছি। বাইরে যাব। সিগারেট দেতো।'

'তুই সিগারেট খাবি?' যুবক হতভম্ব।

'ফোট। কেটে পড়।' মেয়েটি আবার পা বাড়াচ্ছিল, যুবক দ্রুত বলে উঠল, 'দাঁড়া দাঁড়া। দিচ্ছি।' সে একটা উইলসের প্যাকেট বের করে।

একটি সিগারেট টেনে বের করল মেয়েটি প্যাকেট থেকে, 'ধরিয়ে দে।'

যুবক সিগারেটের মুখে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছোঁয়াতেই সে ধোঁয়া ছাড়ল, ধ্যা...।

যুবক চোরের মত চারপাশে তাকাল। দুই ফুটপাত দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা মেয়েটিকে তো বটেই এই সিগারেট খাওয়াও উপভোগ করছে।

'আমার নাম স্বাহা, তোর নাম?' মেয়েটি আবার ধোঁয়া ছাড়ল।

'অর্জুন।'

'খুব প্রেম করে বেড়াস, না?'

'ধ্যেৎ' লজ্জা পেল।

'অর্জুন মানে মহাভারতের অর্জুন তো খুব প্রেম করত। আচ্ছা, তুই একসঙ্গে কটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে পারবি?' স্বাহা সিগারেট নিভিয়ে দিল জুতোর তলায় ফেলে।

'একটাই জোটেনি আজও।'

'তার মানে তোর মধ্যে গোলমাল আছে। চেহারায় তো বেশ মাঞ্জা দিয়েছিস। তাহলে মেয়েরা তোর কাছে আসে না কেন? গল্পটা কি?'

'আসলে আমি একটু শাই টাইপের।'

'এম্মা! তুই ঢপ মারছিস? আমার সঙ্গে যেভাবে আলাপ করলি তাতে লজ্জার ল ছিল? পাঁচ পাবলিককে ডেকে বলব?'

'এই না। সত্যি বলছি, কোন মেয়ে আমার জীবনে আসেনি।'

'আচ্ছা। চল হাঁটি।'

ওরা হাঁটতে শুরু করল। স্বাহা বলল, 'জানিস, এখন পর্যন্ত আমি সাতাত্তরটা প্রেম করেছি। ব্যাপারটা এত ইন্টারেস্টিং না! একজনের সঙ্গে আর একজনের মিল দেখতেই তার একটি X দিয়ে দিয়েছি। রিপিট করতে কারও ভাল লাগে বল?'

'সেতো নিশ্চয়ই। কিন্তু সাতাত্তরটা?' অর্জুন হতভম্ব।

'আমি তো কম। আমার বন্ধু চীকা নাইনটি নাইনে আছে। ও এখন প্রেম করা স্টপ রেখেছে। যাকে তাকে তো সেঞ্চুরির নাম্বার দিতে পারে না। এ্যাই তুই চীকার সঙ্গে কথা বলবি?'

'কি দরকার। মিছেমিছি।' মৃদু আপত্তি জানাল অর্জুন।

'আচ্ছা তুই আমার সঙ্গে আলাপ করলি কেন? প্রেম করার জন্যে তো?' মুখ ঘুরিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল স্বাহা।

হাসল অর্জুন। হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কিভাবে প্রেম করতে হয় জানিস?'

'মানে আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করব,—করব, সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব, আমাদের পৃথিবী এক হবে।' অর্জুন বলল। 'হয়ে গেল। আমরা কেউ কাউকে জানি না আর পৃথিবীটা এক হয়ে যাবে? মামদোবাজী।' চেঁচিয়ে উঠল স্বাহা। 'তারপর কোন মেয়ে প্রপোজ করেছে? তোর এবিলিটি তো এখনও প্রমাণিত হয়নি। নাঃ। তোর একটা টেস্ট দরকার। তুই চল চীকার কাছে।' স্বাহা বলল।

চীকার ঘর দারুণ সাজানো। অর্থের প্রাচুর্য আন্দাজ করা যায় না। বারমুডা আর গোল গলার গেঞ্জি পরে সে বসে বলল, 'টিভি দেখতে আর ভাল লাগছিল না। তোরা এসে বাঁচালি।'

স্বাহা বলল, 'এর নাম অর্জুন।'

'ফাইন। আমি চীকা'। হাত বাড়াল সে। অর্জুন মুখ তুলতে পারছিল না। এই প্রথম সে কোন বারমুডা পরা যুবতীর এত কাছে এসে বসেছে। তাকাতেই চোখ চলে যাচ্ছে ওর থাই এর দিকে। এমন মসৃণ সুডৌল পা মানুষের হয়! সিল্কের মত চামড়া। হাত মেলালো সে। চীকার হাত কি নরম।

চীকা জিজ্ঞাসা করল, 'বল স্বাহা, হঠাৎ এলি?'

'অর্জুনকে নিয়ে এলাম। যদি তোর কাজে লাগে।'

'যাব্বাবা। অর্জুন তোর প্রেমিক নয়?'

'না না। আজই আলাপ। কিন্তু বলছে একদম নবিশ। এই বয়সের পুরুষ যদি ভার্জিন হয় তাহলে সন্দেহ হবেই। তাই না?'

'দ্যাটস ট্রু। অর্জুন তুই ভার্জিন?' চীকা জিজ্ঞাসা করল।

'আসলে পড়াশুনা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম।'

'নেকু। ব্লু-ফিল্ম দেখিসনি?'

'না। বিশ্বাস কর।' অর্জুন মাথা নাড়ল।

চীকা বলল, 'স্বাহা ও যদি ঠিক বলে তাহলে ছটা পয়েন্ট দেওয়া যেতে পারে। তোর প্রফেসান কি?'

'এ্যাড এজেন্সিতে কাজ করি।'

চীকা বলল, 'এরকম কারও সাথে আমার পরিচয় হয়নি। এ্যানাদার টু পয়েন্টস। এর আগে কোন মেয়েকে এ্যাপ্রোচ করিসনি?'

'না'।

'তাহলে স্বাহাকে করলি কেন?'

'জানিনা। দেখে কি রকম হয়ে গেলাম।'

'কি দেখে?'

'ওর সব। কেমন রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল স্বাহা, 'ট্র্যাস।'

'ধর এক ফুটপাতে স্বাহা আর অন্য ফুটপাতে আমি হাঁটছি। তুই মাঝখানে। কার দিকে যেতিস কথা বলতে?' চীকা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দুহাত পেছনে রেখে মাথা হেলালো।

'আমি দুদিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটতাম।

'সাবাস। আরও দুই পয়েন্ট'। চীকা বলল, 'শোন, আমি নিরানব্বইটা ছেলেকে দেখেছি। কেউ ভাল কেউ ক্যালাস। একশ নম্বর যাকে করব তাকে আলাদা হতে হবে। যাকে ট্রাই করছি দেখছি সে কারও না কারও ডুপ্লিকেট। লাস্ট প্রশ্ন। এর জন্যে বার পয়েন্ট। তুই আমাকে কতক্ষণ চুমু খেতে পারবি?'

চোখ বন্ধ করল অর্জুন, 'তেইশ ঘণ্টা।'

স্বাহা চেঁচিয়ে উঠল উৎসাহে। চীকা চোখ ঘোরালো। 'চব্বিশ ঘণ্টা নয় কেন?'

'বাঃ আধঘণ্টা টয়লেটে লাগবে না?'

'ও মাই গড। কিন্তু বাকি আধঘণ্টা?' চীকা নাছোড়বান্দা।

স্বাহার দিকে তাকাল অর্জুন, 'ওর কথা মনে আসবে।'

চীকা কাঁধ ঝাকালো। তারপর বলল, 'না আমি শেয়ার করতে পারব না।'

পাঁচ মিনিট পরে অর্জুন আর স্বাহা নিচে নেমে এলে অর্জুন বলল, 'তাহলে যাই।'

ঠোঁট মোচড়ালো স্বাহা, 'এত তাড়াতাড়ি। আমরা একটু কফি খাবো এখন। চল।'

অর্জুন স্বাহার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটতে লাগল।

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

বিমল কর

নদীর চড়ায় শিবানীর চিতা জ্বলছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলগাছের তলায় বসেছিলাম। ফাল্গুনের শেষ, উল্টো টান ধরে গিয়েছিল দুপুরে। রোদ পাখা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে, নদীর বাঁকের মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।

ভুবন গোরুর গাড়ির উপর বসে, গাড়িটা অর্জুনগাছের ছায়ায় দাঁড় করানো, গোরু দুটো গাছগাছালির ফাঁকে শুয়েছিল। শিবানীর মুখাগ্নি শেষ করে ভুবন খানিকক্ষণ চিতার কাছে দাঁড়িয়েছিল, রোদ আর আগুনের ঝলসানি গায়ে মাখে নি, তারপর গাড়িতে গিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মুখ আড়াল করে সে বসেছিল, কদাচিৎ মুখ তুলছিল, তুলে শিবানীর চিতা দেখছিল।

চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চার-পাঁচটি ছেলেছোকরা আর নিত্যানন্দ। তারা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিজে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুকে বুলিয়ে শবদাহের তদারকি করছিল। পুরুতমশাই আর ছোকিলাল অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সরা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছের ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

আমরা মাঝদুপুরে এসেছি। তখন চতুর্দিক ধূ ধূ করছিল। গরম বাতাস গায়ে মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে যেন সব ক্রমশ জুড়িয়ে আসার মতন ভাব হয়েছে। বালিভরা নদীর তাপ মরে আসছিল, শীর্ণ জলের ধারাটি শিবানীর চিতার পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কদাচিৎ বাতাসে কিছু শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলতলায় বসে শিবানীর সৎকার প্রত্যক্ষ করছিলাম।

সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অনাদি বলল, 'শেষ, হতে হতে বিকেল পড়ে যাবে।' বলে সে শিবানীর চিতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলেন্দু পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসেছিল, সে আস্তে আস্তে মাটিতে

শুয়ে পড়ল, আকাশমুখো হয়ে বোধহয় শিমুলের ফুল দেখবে।

আমি আর-একবার ভুবনের দিকে তাকালাম। ভুবন কুঁজো হয়ে বসে, হাঁটুর ওপর মাথা, দু'হাতে মুখ আড়াল করা। অনেকক্ষণ সেই ওই একইভাবে বসে আছে। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক ঃ শিবানী ওর স্ত্রী। তবু আমার মনে হল, ভুবনের এতটা শোকাভিভূত ভাব ভাল দেখাচ্ছে না। সে জোর করে তার শোকের মাত্রার গভীরতা দেখাতে চাইছে। এতটা শোক পাবার কারণ তার নেই। তবু এই শোক কেন? সে কি আমাকে ঈর্ষান্বিত করতে চায়? কিংবা আমাদের তিনজনকেই।

কথাটা আমার এখন বলা উচিত নয় বুঝতে পেরেও যেন ভুবনের শোকে খুঁত ধরাতে বললাম, 'শিবানীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে মাসখানেক আগে। ভুবনের ওপরে কি জান্যে যেন রেগেছিল। ওর শরীর স্বাস্থ্যের কথায় দুঃখ করছিল...'

আমার কথায় অনাদি মুখ ফিরিয়ে দূরে ভুবনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'আমরা বোধহয় না এলেই ভাল করতাম।'

আমরা চুপচাপ অনাদির কথাটা ভাবছিলাম। সবুজ একটা বুনো পাখি চিকির চিক করে ডাকতে ডাকতে চোখের পলকে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কমলেন্দু সব জেনেশুনে বুঝে হঠাৎ বলল, 'কেন? আমরা না এলে কি ভালো হত?'

অনাদি ধীরস্থির প্রকৃতির, আস্তে আস্তে নীচু গলায় সে কথা বলে। সামান্য অপেক্ষা করে সে বলল, 'ভুবন হয়তো অস্বস্তি বোধ করছে। ঠিক এ সময়ে সে বোধহয় আমাদের বাদ দিয়েই তার স্ত্রীকে ভাবতে চেয়েছিল।'

'ভাবুক, কে তাকে বারণ করেছে—' খানিকটা অবহেলা, খানিকটা উপহাসের গলায় আমি বললাম।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'আমরা ওর চোখের সামনে বসে থাকলে ভুবনের পক্ষে আমাদের বাদ দিয়ে শিবানীকে ভাবা মুশকিল।'

কমলেন্দু শুয়ে শুয়ে বলল, 'বেশ তো, তা হলে সাত-সকালে লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে শিবানীর মারা যাবার খবর পাঠানো কেন! না পাঠালেই পারত।'

'কিংবা বলে দিলেই পারত আমরা যেন না আসি,' আমি বললাম।

'খবর না দিলে খারাপ দেখাত, বোধহয় ভদ্রতা করে...'

'আমরাও ভদ্রতা রক্ষা করছি। শিবানী আমাদের বন্ধুর স্ত্রী, তার সৎকারে না আসাই কি ভালো দেখাত।' কমলেন্দু বলল।

'বন্ধুর স্ত্রী শুধু কেন, শিবানী আমাদের...কি বলব...বান্ধবী, যাই বলো...সেও তো আমাদের কিছু একটা ছিল। সে মারা গেছে, আমরা শ্মশানে আসব না?'

আমি বললাম।

অনাদি আর কথা বাড়াল না। পকেট হাতড়ে আবার সিগারেট বের করল। আমাদের দিল। নিত্যানন্দ চিতার কাছে গিয়ে খোঁচাখুঁচি করতে কাঠ ফেটে শব্দ হল। সে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, তার সহচর দুটি ছেলে তার কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। চিতার ওপর কয়েকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন আতসবাজির মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল, সামান্য ছাই উড়ল। একটি ছেলে কয়েকটি কাঠের টুকরো ফেলল চিতায়।

ভুবন চিতার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উদাসভাবে নদীর আকাশ আর জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর এক সময় আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। আমাদের মধ্যে দূরত্ব সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। ভুবন মুখ ফিরিয়ে নিল ; নিয়ে হাঁটুর ওপর কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর এই ভঙ্গি আমার ভালো লাগছিল না। মনে হল, আমাদের যেন সে আর দেখতে পাচ্ছে না, বা দেখেও দেখতে চাইছে না— উপেক্ষা করছে।

বাড়াবাড়ি দেখলে আমার রাগ হয়, ভুবনের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমার কেমন রাগ আর বিরক্তি হচ্ছিল। আতিশয্য কেন? আমরা কি জানি না শিবানীর সঙ্গে ভুবনের সম্পর্ক কি ছিল? তবে? তবু ভুবন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা কিছু জানি না, যেন শিবানী তার সর্বস্ব ছিল, শিবানীর মৃত্যুতে তার বিশ্বভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে।

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছিল। ভুবনের বোকামির শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ ভুবন, তবু যদি শিবানীর ভালোবাসা পেতে! শিবানী তোমায় ভালোবাসে নি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায় বিয়ে করেছিল। তুমি স্বামী হয়েছিলে বলে যা পাবার পেয়ে গেছ, তা ভেব না। বরং শিবানীর ভালোবাসা বলতে যা, তা আমি পেয়েছিলাম।

ফাল্গুনের দমকা বাতাস এল। দক্ষিণ থেকে নদীর তপ্ত বালির ওপর দিয়ে ঘূর্ণি তুলে ঘোলাটে বাতাসে নাচতে নাচতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভুবন আবার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাত আড়াল করে বসল। যেন সে কাঁদছে।

ভুবনের এত অতিশয্য আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। অনাদি আর কমলেন্দুকে বললাম, 'আমরা একটু আড়ালে গিয়ে বসি না হয়—' বলে উপহাসের গলায় মন্তব্য করলাম, 'ভুবনবাবুর আমাদের হয়তো সহ্য হচ্ছে না, অনাদি যা বলল।'

কমলেন্দু শিমূলফুল দেখছিল, নাকি আকাশ, কে জানে! সে বলল, 'তাতে যদি ভুবন শান্তি পায় আমার আপত্তি নেই। ...আমার বরং শিবানীর চিতার কাছে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগছে।'

কমলেন্দু কথার জবাব দিল না।

অনাদি এবার বলল, 'আমারও কেমন অস্বস্তি লাগছে। একটু আড়ালে দূরে গিয়ে বসাই ভালো। তাছাড়া এবার এদিকে রোদ ঘুরে গেছে, বসে থাকা যাবে না।'

আমরা আরো অল্পক্ষণ বসে থেকে শিমুলতলা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তারপর তিনবন্ধু শিবানীর চিতা এবং ভুবনের দৃষ্টি থেকে সরে অন্য দিকে চলে যেতে লাগলাম।

খানিকটা দূরে এসে আমরা বসলাম। এখানে ঘন ঝোপঝাড় আর ছায়া, মাথার ওপর নিমগাছ, সামনে কুলঝোপের ওপর দিয়ে নদী দেখা যায়। মাঝে মাঝে পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু কানে যাচ্ছে না। নদীর বালি ছাড়া অন্য কিছু চোখেও পড়ছে না। এখানে যে যার মতন আরাম করে বসলাম, বসে নিশ্চিন্ত হলাম।

কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে ছোটোখাটো দু-চারটি কথার বিনিময় হল, শিবানী এভাবে, আচমকা একটা অসুখে মারা যাওয়ায় আমরা দুঃখিত। শেষে আমরা একে একে কেমন নীরব হয়ে গেলাম। নদীর দিকে অপরাহ্নের স্তিমিত ভাব নামছিল। আমরা তিনজনেই কখনো নদী, কখনও শূন্যতা, কখনও গাছপালা, কখনও পায়ের তলায় ঘাস-মাটি দেখছিলাম। এবং পরিপূর্ণ নীরব হয়ে গিয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ কমলেন্দু কেমন করে যেন নিশ্বাস ফেলল। দীর্ঘনিশ্বাস নয়, তার চেয়েও যেন গম্ভীরতাপূর্ণ কিছু ; তার নিশ্বাসের শব্দে আমরা ওর দিকে হতচকিত হয়ে তাকালাম।

কমলেন্দু সুপুরুষ। তার মুখ এখনো দু মুহূর্ত তাকিয়ে দেখার মতন। লম্বা ধরনের কাটাকাটা মুখ, রঙ ফর্সা, নাক ও চোখ বেশ তীক্ষ্ণ। তার ফরসা সুন্দর মুখে আমরা কোথায় যেন এক বেদনা দেখতে পেলাম।

অনাদি বলল, 'কি হল?'

কমলেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আমাদের দিকে তাকাল। শেষে বলল, 'না, কিছু নয়।... কই, দেখি একটা সিগারেট...'

পকেট থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওকে দিলাম। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ও আমাদের দু'জনকে দুটো সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া গলায় নিল। তারপর আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এদিকটায় পালিয়ে এসে ভালোই হয়েছে। সামহাউ, আমার শিবানীর চিতার সামনে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না।... হতে পারে, তখন আমি বোকা ছিলুম, বয়স কম ছিল, তবু এ কথা তো ঠিক, শিবানী আমাকে ভালোবেসেছিল।... আমার চেয়ে বেশী সে আর কাউকে কখনো ভালোবাসে নি।'

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু পরস্পরের কথা জানতাম এবং ভুবন, আমাদের

চতুর্থ বন্ধুও সব জানত। কমলেন্দুর সঙ্গে শিবানীর মেলামেশা ভালোবাসার কথা আমার অজানা নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সে যে দাবিটুকু জানাল তাতে আমার আপত্তি হল না। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার কথা উঠলে শিবানীর কাছে আমার চেয়ে আর কেউ বেশি পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস করি না। একেবারে সরাসরি না হলেও, কমলেন্দুকে শোনাবার জন্যে, ঠাট্টার একটু গলা করে বললাম, 'আমার তো মনে হয়, ওটা আমিই এক সময়ে পেয়েছি।'

ধীরস্থির শান্তশিষ্ট মানুষ হলেও অনাদি এখন হঠাৎ কেমন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হল। ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল, 'এ-সব তোমাদের মনের ধারণা, কল্পনা। আমার পক্ষে শিবানীর ঘনিষ্ঠতা এমন সময়ে হয়েছে যখন আমরা দুজনে কেউই বাচ্চা ছিলাম না। সিরিয়াসলি যদি কাউকে সে ভালোবেসে থাকে, আমি সে দাবি সবচেয়ে বেশি করতে পারি।'

অনাদির কথায় আমি বা কমলেন্দু , আমরা কেউই খুশি হলাম না। আমাদের কথায় অনাদিও হয়নি। তিনজনে আজ আমরা যে দাবি করছি সে দাবি ছেড়ে দেওয়া কেন যেন আমাদের সাধ্যাতীত বলে আমার মনে হল। আমাদের তিনজনেরই বয়েস হয়েছে, চল্লিশের এপারে চলে এসেছি। আমাদের তিনজনেরই স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। আজ শিবানীর সঙ্গে আমাদের প্রেম নিয়ে অকারণ গল্প করার বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করার কোনো অর্থ ছিল না। তবু আমরা তিনজনেই এমন এক দাবি জানাচ্ছিলাম যেন সে দাবি প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে আমাদের কোনো বিশেষ সুখ ও অহংকার প্রকাশ করা যায় না।

কমলেন্দু ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল সিগারেটে, সে অনাদির দিকে এবং আবার দিকে বার বার তাকাল, তারপর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে শিবানীর ওপর-ওপর মেলামেশা তোমরা দেখেছ, আমি তোমাদের সে-সব গল্পও বললাম, চিঠিপত্রও দেখিয়েছি, কিন্তু ভেতরে আমাদের কি হয়েছিল তোমরা কি করে জানবে?'

'ভেতরে ভেতরে যা হয়েছে তা তো পরে তুই বলেছিস,' আমি বললাম।

'না আমি সব বলিনি। কিছু না-বলা আছে, সামথিং সিকরেট...'

'সে-রকম গোপনীয়তা আমারও আছে, কমল।' অনাদি বলল।

আমার গোপনীয়তা ছিল। আমরা তিন বাল্যবন্ধু পরস্পরের কাছে জীবনের কোনো কিছুই বড় একটা অগোচর রাখতাম না। শিবানীর বেলায়ও কিছু রাখিনি রাখতে চাইনি, তবু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কিছু রেখেছিলাম, নয়তো আজ এ-কথা উঠত না। শিবানীর সঙ্গে মেলামেশার সময়ও আমরা কেউ কারুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইনি। কেন না—কমলেন্দু শিবানীর সঙ্গে কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মেলামেশা করেছিল, করে শিবানীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। শিবানীর

সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা একেবারে যৌবনবেলার ; আমার সঙ্গে শিবানীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর অনাদির সঙ্গে শিবানীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। শিবানীও আমাদের বাল্যকালের বান্ধবী। তার সঙ্গে আমাদের যা যা হয়েছে তা পরস্পরকে আমরা জানিয়েছি। স্বভাবতই কোনো ইতর ঈর্ষা আমাদের থাকার কথা নয়, তবু যদি কোনো ঈর্ষা থেকে থাকে বা হয়ে থাকে তা তেমন কিছু নয়। নয়তো আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাকত না। এতকাল যা হয়নি, তা হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শিবানীকে নিয়ে কোনো বিরোধ আমাদের মধ্যে হয়নি ; সে জীবিত থাকতে যা হল না, আজ যখন সে আমাদের মধ্যে নেই—তখন তা হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

আমার কি রকম যেন মনে হল। কমলেন্দুর দিকে তাকালাম, তারপর অনাদির দিকে। আমার মনে হল, নিজেদের গোপনীয়তা তাদের প্রতি শিবানীর চরম ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে মনে করছে। আমি নিজেও প্রায় সেইরকম মনে করছিলাম। যদিও আমার আরো কিছু মনে হচ্ছিল।

কেমন এক অস্বস্তি এবং কাতরতাবশে আমি বললাম, 'একটা কথা বলব?'

ওরা আমাকে দেখল।

'আমাদের সব কথাই সকলের জানা।' ধীরে ধীরে আমি বললাম, 'আমরা কিছুই লুকোচুরি রাখিনি ; তবু আমাদের তিনজনেরই কিছু গোপনতা আছে। আজ সেটা বলে ফেলা কি ভালো নয়?'

কমলেন্দু অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। অনাদি চোখের চশমাটা ঠিক করে নিল। আমার মনে হল ওরা অনিচ্ছুক নয়।

কমলেন্দু বলে, 'বেশ। তাই হোক। কথাটা আজ বলে ফেলাই ভালো।'

অনাদি বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবানীর চিতা এখন জ্বলছে, আমরা শ্মশানে। এই সময় সে-সব কথা বলা কি ভালো দেখাবে!'

'খারাপই বা কি!' আমি বললাম, 'আমার বরং মনে হচ্ছে বলে ফেললেই স্বস্তি পাব।'

অনাদি আস্তে মাথা নাড়ল। সে সম্মত।

কমলেন্দুর দিকে আমি তাকালাম। সেই বলুক প্রথমে। শিবানীর জীবনে সেই প্রথম প্রেমিক।

'সব কথা বলার কোনো দরকার নেই কমল, আমরা জানি। আমরা যা জানি না তুমি শুধু সেটুকুই বলো।'

কমলেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'তাই বলব।'

কমলেন্দু বলল : 'তোমাদের নিশ্চয় মনে নেই, আমি একবার মাস দেড়েক কি দুয়েকের জন্যে মোতিহারিতে ছোটকাকার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে

এলাম যখন, তখন বর্ষার শুরু, আমাদের ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে। বাবা পাটনায় মেসোমশাইকে আমার কলেজে ঢোকার সব ব্যবস্থা করতে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট কি হয়েছিল তোমরা তা জানো। কলেজে পড়তে যাবার আনন্দে তখন খুব মশগুল হয়ে আছি, বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা আদরের ঘটা চলছে। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন গলায়-গলায়। মোতিহারিতে সে আমায় চিঠি লিখত। তার মা-বাবার কথা তোমরা জান, পয়সাকড়ি থাকার জন্যে, আর তার বাবা মনোজকাকা বেভিন-স্কীমে বিলেত ঘুরে আসার পর আরো একটু সাহেবী হয়ে গিয়েছিলেন। শিবানীকে শাড়ি ধরাতে ওঁরা দেরী করেছিলেন। আমি যখন মোতিহারিতে তখন শিবানী শাড়ি ধরেছে। চিঠিতে আমায় লিখেছিল। ফিরে এসে দেখলাম, ছিপছিপে শিবানীকে শাড়ি পরে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে—বেশ বড় হয়ে গেছে—বেশ বড়।...কই, আর একটা সিগারেট দাও তো...।'

অনাদি কমলেন্দুকে সিগারেট দিল। সিগারেট ধরিয়ে কমলেন্দু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকল সামান্য, তারপর বলল :

'একদিন বিকেলবেলা নাগাদ সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। এক একটা বাজ পড়ছিল—যেন মনে হচ্ছিল ঘরবাড়ি গাছপালায় আগুন ধরিয়ে ছাই করে দেবে। আর তেমনি আকাশ, পাকা জামের মতন কালো।...দেখতে দেখতে যেন সন্ধ্যা। দোতলায় আমার ঘরে আমি দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে। একটা জানলা, যেটা দিয়ে ছাট আসছিল না জলের, খুলে রেখেছিলাম। উলটো দিকে শিবানীদের বাড়ি। শিবানীর মা—লতিকা-কাকিমার শোবার ঘরের গায়ে শিবানীর ঘর। আমার ঘর থেকে শিবানীর ঘর দেখা যায়...কিন্তু খানিকটা দূর। আমরা আমাদের ঘরে বসে বসে জানলায় দাঁড়িয়ে হাত-টাত নেড়ে হাসি-তামাশা করছিলাম। কখনো কখনো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলছিলাম, শব্দ বড় একটা পৌঁছচ্ছিল না।

'আমি অনেকক্ষণ ধরে শিবানীকে ডাকছিলাম। ইয়ার্কি করেই। তাকে ইশারা করে বলছিলাম শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে আসতে। শিবানী আমায় বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল। এইরকম করতে করতে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এল। পেয়ারাগাছের ডালের পাশ দিয়ে শিবানীর ঘরের অনেকটাই চোখে পড়ে আমার। সে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে জানলায় বসে চুল বেঁধেছে, একটা শাড়িও আলনা থেকে এনে দেখিয়েছে, দূর থেকে রঙটা বুঝতে পারিনি।...সন্ধের মুখে সব যখন অন্ধকার, আমি নীচে থেকে বাতি আনতে যাব, দরজায় দুমদুম শব্দ। খুলে দেখি শিবানী, হাতে বাতি। সে ওই বৃষ্টির মধ্যে এ বাড়ি চলে এসেছে, নীচে থেকে আসার সময় মা তার হাতে বাতি দিয়ে দিয়েছে। শিবানী এইটুকু আসতেই খানিকটা ভিজে গিয়েছিল, হাত পা মাথা শাড়ির আঁচল বেশ ভিজেছে।

লণ্ঠনটা আমার হাতে দিয়ে শিবানী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। জলের ছাট আসছিল। আমি আলনায় ঝুলানো আমার একটা জামা এনে ওর ভিজে হাত মাথা ঘাড় মুছিয়ে দিতে লাগলাম। ওর মাথার চুল খানিকটা ভিজে গিয়েছিল বলে শিবানী তার লম্বা বিনুনি খুলে ফেলেছিল। ওকে আমি আমার পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ভিজে পা দুটি মুছিয়ে দিতে লাগলাম, ইয়ার্কি করেই। ও পা দুলোতে লাগল, হাসতে লাগল। শিবানী ততক্ষণে মাথার চুল খুলে ঘাড়ে পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আমরা লণ্ঠনের আলোয় বসে গল্প করতে লাগলাম। শিবানীর গানের মাস্টার ছিল, সে যে এক সময়ে মোটামুটি ভালো গাইত তা তোমরাও জানো। শিবানীকে একটা গান গাইতে বললাম। শিবানী যে গানটা গাইল তা আমার এখনো মনে আছে, আমি অনেকবার সে গান শুনেছি, কিন্তু সেদিনের মতন কখনো আর নয়। ঝড়বৃষ্টি, বাইরের দুর্যোগ আর অন্ধকারের মধ্যে আমার ঘরে বসে মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় সে গাইল ঃ 'উতল ধারা বাদল ঝরে...।' ওই গানেরই একটা জায়গায় ছিল, 'ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে, আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে...।' বার বার শিবানী ওই চরণ দুটি গাইছিল, আর আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু করে হাসছিল। অর্থটা আমি বুঝতে পারছিলাম।...গান শেষ হলে আমরা গল্প করতে লাগলাম। এ-গল্প সে-গল্প। শেষে আমরা ছেলেমানুষের মতন হাতের রেখা, কপালের রেখা, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ এইসব কথা নিয়ে মেতে উঠলাম। একে অন্যজনকে সৌভাগ্যের চিহ্ন দেখাতে ব্যস্ত। হঠাৎ শিবানি বলল, তার বুকে নীল শিরার একটা ক্রশ আছে। আমি বললাম, তা হলে সে মস্ত পুণ্যবতী। বলে আমি হাসছিলাম। এরকম যে হয় না, হতে পারে না, তা আমি জানতাম। আমার হাসি দেখে শিবানী বুঝতে পারল আমি তাকে অবিশ্বাস করছি। সে বলল, 'হাসছ কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?' আমি মাথা নাড়লাম, 'তুমি কি যীশু?'...শিবানীর অভিমানে লাগল। বলল, 'আহা, যীশু না হলে বুঝি কিছু থাকতে পারে না?' আমি তাকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বললাম, 'যার কোথাও পাপ নেই তার থাকতে পারে...। মানুষের নয়। যীশুর মতন তুমি মরতে পারবে?'... শিবানী কি ভাবল জানি না, হঠাৎ যে সে তার বুকের জামার ওপরের বোতাম খুলে—জামা অনেকটা সরিয়ে আমায় বলল, 'আলো এনে দেখ।' ...আমি দেখলাম। কি দেখলাম। কি দেখলাম তা তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই। ...বুঝতেই পারছ। তবে শিবানীর বুকে শিরা ছিল, নীলচে রঙের। সেটা ক্রশ কিনা আমি দেখিনি। আমি অন্য জিনিস দেখলাম। ...আজ আমার স্বীকার করতে দোষ নেই, সেই বয়সে শিবানীর সেই ইনোসেন্স ছিল। আমার হাতে সেটা মরে গেল।'

কমলেন্দু নীরব হল। তাকে খুব অন্যমনস্ক ও অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল। নদীর চরের ওপরে রোদ সরে যাচ্ছে, তাপ অনেকটা কমে এসেছে, কোথাও

একটা কাক ডাকছিল, গাছের পাতায় বাতাসের সরসর শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা নিঃঝুম ভাব।

আমরা তিন বন্ধুই নিশ্বাস ফেললাম। কমলেন্দু রুমালে মুখ মুছে নিল।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'শিশির, তোমার যা বলার...'

আমার বলার পালা কমলেন্দুর পর। শিবানীর জীবনে আমি দ্বিতীয় প্রেমিক তার যৌবনের প্রেমিক। আমারও তখন যৌবন। আমাদের তখনকার ঘনিষ্ঠতার কথা কমলেন্দুর অজানা নয়। ওরা যা জানে না, ওদের কাছে থেকে যা আমি গোপন রেখেছিলাম, এবার তা বলার জন্যে আমি তৈরি হলাম। কুলঝোপের মাথা ডিঙিয়ে অপরাহ্নের রোদ এবং নদী দেখতে দেখতে আমি গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, 'আমি খুব সংক্ষেপে সারতে চাই।'

'শুনি...' কমলেন্দু বলল।

'বলছি...। তোমাদের কাছে কোনো ভূমিকার দরকার নেই। তবে তোমাদের জানা দরকার যে, তিন-চার বছর শিবানীর সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি ছিল এটা তার শেষের দিকের ঘটনা—' আমি ধীরে ধীরে বললাম। 'শিবানীর বাবা তখন মারা গেছেন, লতিকা কাকিমারা তাঁদের নতুন বাড়িতে থাকেন। আমি আবার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ করে পাওয়ার হাউসের চার্জে রয়েছি। শিবানীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তখন এমন অবস্থায় যে, তোমরাও ভাবতে, আমি তাকে বিয়ে করব। লতিকা কাকিমাও ভাবতেন। শিবানীরও তাতে সন্দেহ ছিল না। সন্ধেবেলা ওদের বাড়ি গিয়ে আমাকে তখন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে হত না, সোজা ড্রয়িংরুমের পরদা সরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে শিবানীর শোয়ার ঘরে চলে যেতে পারতাম। গল্পগুজব, গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া সেরে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন রাত হয়ে যেত। শিবানী আমায় ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। আর প্রায় রোজই ফেরার সময় ফটকের কবরীঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আমায় চুমু খেত।... শিবানীকে যে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তা আমার কখনো মনে হয়নি। তার গায়ের রঙ, চোখমুখের ছাঁদ আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তার শরীর আমার ভীষণ পছন্দ ছিল, তাদের বাড়ির আবহাওয়ায় যে স্বাধীনতা, সপ্রতিভ ভাব, খোলামেলা আচরণ ছিল, তাও আমার খুব পছন্দ ছিল। নতুন ধরনের রুচি, পরিচ্ছন্নতা, বেশবাসের সৌন্দর্য।... এ-সবের জন্যে, আর শিবানীর তখনকার শরীরের জন্যে তাকে আমার ভালো লাগত। শিবানীর সেই যৌবন বয়সে তোমরা জানো, মনে হত তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ছে। ...একদিন, সেটা শীতকাল, লতিকা-কাকিমা তাঁদের মহিলা সমিতির মিটিঙে গিয়েছিলেন। বাড়িতে চাকর আর ঝি ছিল। ঝি-টার ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে। শিবানীর শোবার ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলাম। জানুয়ারী মাস, প্রচণ্ড শীত। ঘরের জানলা-টানলা সবই বন্ধ ছিল।...সাধারণ একটা কথা নিয়ে আমরা দু'জনেই

হাসছিলাম, হাসতে হাসতে শিবানী বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এমনভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে তার একটা হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশে পড়েছে, অন্য হাতটা তার কোমরের কাছে বিছানায় অলসভাবে পড়ে আছে, তার মুখ সিলিংয়ের দিকে, মাথার ওপর হাত থাকার জন্যে তার বুকের একটা পাশ আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিবানীর কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত বিছানা থেকে মাটিতে ধনুকের মতন বেঁকে—কিংবা বলা ভাল—ঢেউয়ের মতন ভেঙে পড়েছে। বিছানার ওপর সুজনিটা ছিল কালচে লাল, তাতে গোলাপের মতন নকশা, শিবানীর পরনের শাড়িটা ছিল সিল্কের, তার রঙ ছিল সাদাটে। ওর ভাঙা শরীরের বা আছড়ে পড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার আত্মসংযম নষ্ট হয়ে গেল। ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি যখন তার গায়ের পাশে, সে আমায় যেন কেমন ফিসফিস গলায় গরম নিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমি কবে তার মাকে কথাটা বলব।... আমি তখন যে-কোনো রকম ধাপ্পা দিতে রাজি। বললাম, কালই বলব, কাল পরশুর মধ্যে। শিবানী যেন অন্ধকারের মধ্যে সুখে আনন্দে উত্তাপে সর্বাঙ্গে গলে গলে যেতে শুরু করল।... সে কতবার করে বলল, সে আমায় ভালোবাসে। আমি কতবার করে বললাম, আমি তাকে ভালোবাসি। ...তারপর ঘরের বাতি জ্বালা হয়ে গেলে আমি শিবানীর ময়লা রঙ, ছোট কপাল, মোটা নাক, সামনের বড় বড় দাঁত, পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে পালিয়ে এলাম। ...তারপর থেকেই আমি পালিয়েছি...'

আমি থেমে গেলাম আমার গলার কাছে একটা সীসের ডেলা যেন জমে গিয়েছে। চোখ ফেটে যাচ্ছিল। কী যে অনুশোচনা আজ, কেমন করে বলব!

নদীর ওপারে বনের মাথায় রোদ চলে গেছে। ছায়া পড়ে গেছে নদীর চর জুড়ে। ফাল্গুনের বাতাস দিচ্ছিল। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসতে শুরু করেছে। সমস্ত জায়গাটা অপরাহ্নের বিষণ্ণতায় ক্রমশই মলিন হয়ে আসছে।

আমাদের তিন বন্ধুর নিশ্বাস পড়ল।

আমি সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম। মুখ মুছলাম কোঁচায়। তিনজনে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। এবার অনাদির পালা। শিবানীর জীবনে তৃতীয় প্রেমিক। অনাদির দিকে তাকালাম আমরা।

অনাদি প্রায় আধখানা সিগারেট শেষ করল, কোনো কথা বলল না। শেষে মাটির দিকে তাকিয়ে তার কথা শুরু করল :

'শিবানীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা যখন হয়েছে তখন আমরা কেউ বাচ্চা নেই। আমার বয়স তেত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছিল, শিবানী প্রায় তিরিশ। লতিকা-মাসির তখন আর ঠিক বেঁচে থাকার মতন অবস্থায় নেই। সেই আরথারাইটিসের অসুখে পঙ্গু, শয্যাশায়ী। আমি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েছি নতুন... তোমরা ভাই জানো,

মহেশ্বরী যখন কনট্রাকটারী ব্যবসায় নামল তখন আমি তার পেছনে ছিলাম, তার সঙ্গে আমার ভেতরে ভেতরে কথা ছিল, তার লাভের একটা পার্সেন্টেজ আমায় দেবে, আমি ব্যাঙ্কে তার সবরকম সুবিধে করে দেবো। প্রথম প্রথম মহেশ্বরীর কাছ থেকে বেমক্কা দু'চারশো পেতাম। ব্যাঙ্কে আমি তার সুবিধে-টুবিধের মাত্রাও বাড়াতে লাগলাম। মামা ম্যানেজার, যদিও নিজের মামা নয়। মামাকে আমি নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতাম। কিন্তু মহেশ্বরী শেষে আমায় ডুবিয়ে দিল। বিশ্রী এক অবস্থায় পড়লাম। ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে, আমার পক্ষে কোথাও আর আইনের ফাঁক থাকল না। শিবানীর সঙ্গে আমার তখন মেলামেশা। সত্যি কথা বলতে কি আমার তখন এমন কাউকে দরকার, যে আমায় অর্থ সাহায্য করতে পারে। অন্তত একটা জামিন থাকলেও আমার পক্ষে একটু সুবিধে হয়। শিবানীদের নিজের বাড়িঘর, জমি, লতিকা-মাসিমার—আমি তাঁকে মাসিমা বলতাম—কিছু টাকা এবং অলঙ্কার ছিল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শিবানীদের শরণাপন্ন হবার কথা ভাবছিলাম। লতিকা-মাসিমা মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তিই হবে। তাছাড়া, লতিকা-মাসিমা বেঁচে থাকতেও যদি শিবানীর সঙ্গে আমার তেমন একটা সম্পর্ক দেখতে পান, তিনি আমায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারেন। বেশি বলে লাভ নেই, আমি শিবানীর সঙ্গে যে-ধরনের সম্পর্ক পাতালাম—তাতে মনে হবে আমরা যেন স্বামী-স্ত্রী। আমি শিবানীর অঙ্গ স্পর্শ করিনি—মানে সেভাবে নয়, আমার তাতে আগ্রহ ছিল না। অথচ আমি শিবানীদের বাড়িতে সারাদিনও থেকেছি। তাদের বাড়িতে থেকেছি, খেয়েছি, বিছানায় শুয়েছি, লতিকা-মাসিমার জন্যে ডাক্তার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছি, শিবানীর ও তাদের সংসারের তদারকি করেছি।...আমার ওপর লতিকা-মাসিমার সুনজর পড়ল, শিবানী প্রথম প্রথম আমায় কি ভাবত জানি না, পরে সে আমার ওপর নির্ভর ও বিশ্বাস করতে লাগল। তখন চাকরিতে আমার গণ্ডগোল বেধে গেছে, মামার জোরে তখনো জেলে যাইনি, কিন্তু মহেশ্বরীকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। শরীর খারাপের অজুহাতে আমি ছুটি নিয়েছি, পুজোর মুখে। আমার বাড়ি বলতে এক মা, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলাম। ছুটি নিয়ে শিবানীদের বাড়িতে পড়ে আছি। দুশ্চিন্তায় খাওয়া নেই, ঘুম নেই, চোখ-মুখ শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন বিকেল থেকে লতিকা-মাসির খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হল। ডাক্তার ডেকে আনলাম, ওষুধপত্র চলতে লাগল নতুন করে। ...সেদিন সন্ধের পর লতিকা-মাসির অবস্থা একটু ভালো হল, আমি বাইরে—শিবানীদের বাড়ির বাগানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, অন্ধকারে। এমন সময় কখন শিবানী পাশে এসে দাঁড়াল। দু'চারটে কথার পর সে বলল, 'আমি আর কতদিন এভাবে দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা নিয়ে বসে থাকব?...' আমি তখন জামিন এবং টাকার কথা বললাম। শিবানী কিছু না ভেবেই বলল, লতিকা-মাসির কাছে সে সব বলবে।... আমরা দুজনেই

তখন একটা শিউলিগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক দিন পরে হঠাৎ আমার নাকে শিউলি ফুলের গন্ধ লাগল। আমি শিবানীর হাত টেনে কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার সেই কান্না কুকুরের মতন। শিবানী আমায় সান্ত্বনা দিল। পরে বলল, 'এই ঘরবাড়ি টাকা—এ-সব মা আমার ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছে। যার কাছে আমার আশ্রয় জুটবে এ-সবই তার। তুমি তো এসবই তোমার নিজের ভাবতে পার।' আমি সে-রাত্রে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ...লতিকা-মাসিমা আমার তরফে জামিন দাঁড়ালেন, কিছু টাকাও আমায় তিনি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরী মামলায় এমন এক অবস্থায় পড়ল যে তাকে সরিয়ে রাখা টাকা বের করে দিতে হল। আমার গণ্ডগোলটাও মিটে গেল। লতিকা-মাসি অবশ্য আরো মাস কয়েক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শিবানী ভবিষ্যতের জন্য আমার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিল ; সে-ভার আমি নিইনি, তাকে আশ্রয়ও দিইনি। শিবানীকে ঠিক বিয়ে করার মতন মেয়ে আমার কোনোদিনই মনে হয়নি।...

অনাদি চুপ করল।

আমরা চুপচাপ। নিঃসাড় যেন। একটা সাদা ধবধবে বক নদীর ওপর দিয়ে গোধূলির আলোর সীমানা পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

কমলেন্দু বলল, 'লতিকা-কাকিমার টাকাটা তুমি ফেরত দাওনি?'

'পরে মাসিমা মারা যাবার পর শিবানীকে কিছুটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয় নি।'

আর কোনো কথা হল না। আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীর তিন প্রেমিক-পুরুষ নীরবে বসে থাকলাম, কেউ কারো দিকে তাকালাম না। বসে বসে কখন যেন দেখলাম, আকাশ বন নদী জুড়ে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। আমাদের চারপাশে সেই সীসের মতন ছায়া ক্রমশই জমতে-লাগল। আমাদের নাম ধরে চিতার কাছ থেকে ওরা তখন ডাকছে।

দাহ শেষ। চিতা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুরোলো। এবার নদী থেকে মাটির কলসিতে জল ভরে এনে কমলেন্দু শিবানীর ভিজে চিতায় জল ঢেলে দিল। তারপর আমি। কমলেন্দুর হাত থেকে কলসি নিয়ে নদী থেকে জল ভরে আনলাম। এনে শিবানীর চিতায়, তার নিশ্চিহ্ন শরীরের ছাইয়ের রাশিতে জল ঢাললাম। তারপর অনাদি জল দিল। শেষে ভুবন।

কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আর পিছু ফিরে তাকাব না।

আমরা এগিয়ে চলেছি। ওরা পুরুতমশাই আর ছেলেরা আমাদের আগে আগে, গরুর গাড়িটা চলছে, চাকার করুণ শব্দ, আমরা চার বন্ধু পাশাপাশি। ভুবনকে আমাদের পাশে পাশে হেঁটে যেতে দেখে আমাদের অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে হল যেন ঠিক মতন পা ফেলতে পারছে না। আমরা তাকে গরুর

গাড়ির ওপর বসিয়ে দিলাম জোর করে। সে আমাদের দিকে মুখ করে গরুর গাড়িতে বসে থাকল, উদাস দৃষ্টিতে।

এমন সময় চাঁদ উঠে গেল। শুক্লপক্ষ, আজ বুঝি ত্রয়োদশী।

নদী পিছনে, দু'পাশের জঙ্গল গুটোনো পাখার মতন দু'পাশে নেমে গেছে, সামনে উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা। জ্যোৎস্না ধরেছে বনে, ঝিল্লিরব ঘন হয়ে এল, ফাল্গুনের বাতাস বইছে, গোরুর গাড়ির চিকন করুণ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, আর আমাদের পায়ের শব্দ। মাথার ওপর চাঁদ।

যেতে যেতে কমলেন্দু হঠাৎ বলল ভারী গলায়, 'শিবানীর চিতায় জল ঢালার সময় কেমন যেন কান্না এসে গিয়েছিল। আহা, বেচারী। ভাই, আমি আজ তার কাছে, তার চিতায় জল দেবার সময়, মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি।'

অনাদি যে কাঁদছিল আমরা খেয়াল করিনি। সে ছেলেমানুষের মতন মুখে কান্না ও লালা জড়িয়ে বলল, 'আমিও...'

চাঁদের আলোয় আমরা তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনি প্রেমিক চলেছি। আমাদের সামনে ভুবন। পিছনে শ্মশান, শিবানীর ধুয়ে যাওয়া চিতা।

যেতে যেতে সামনে ভুবনের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলুম, আমরা তিনজনে—তিন প্রেমিক শিবানীর নিষ্পাপতা, কৌমার্য নির্ভরতা তো হরণ করে নিয়েছিলাম। নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু তারপরেও আর কি অবশিষ্ট ছিল শিবানীর, যা ভুবন পেয়েছে! কি পেয়েছে ভুবন যার জন্যে তার এত ব্যথা? চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চারপাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি করছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।

লোলিটা

শ্রীমতী বাণী রায়

লোলা সময় পায় না মোটে।

একদা নিম্নবিত্ত পিতার সন্তানরূপে সে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার নাম ছিল লীলা। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল পিতার বাড়ী ও গাড়ী। ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়ে নামটি পাল্টাল সে—'নাম রেখেছে লোলা।"

লোলা নামানুযায়ী কর্ম হল। জীবনের বিন্যাস ওই নামেরি পাকে পাকে। যেমন আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ তরুণী দেখা যায় সমাজের উচ্চস্তরে তেমনি দেখা দিল লীলা 'লোলা' রূপে।

এম-এ পাশ করে সে বসল বাড়ী আলো করে। বর্তমান যুগপরিধিতে সাধারণ এম-এ পাশের মূল্য এত অধিক নয় যে বিশেষ উচ্চপদ লাভ হবে। তাই লোলা গৃহে বসে পুরোপুরি সোসাইটি গের্ল হল।

তবু লোলা সময় পায় না।

নিদ্রাভঙ্গ আটটার পরে। চা-সংবাদপত্র ইত্যাদি নয়টা পর্যন্ত। অতএব সুদীর্ঘ স্নানপর্ব। তারপরে প্রায়শঃ শপিং বা বন্ধুবান্ধব, কিঞ্চিৎ সমাজসেবামূলক কাজকর্মের প্রস্তুতি ও আয়োজন। এর মধ্যে টেলিফোনে কথা বলা, চিঠি লেখা আছে। একটায় লাঞ্চ। তিনটে পর্যন্ত অন্য প্রোগাম না থাকলে বিশ্রাম। তখন বিউটি স্লীপ ও নভেল পাঠ। সন্ধ্যা প্রত্যহ রঙীন। নিদ্রা প্রায় একটা রাত্রে।

এমন করে দিন কাটে—বসন্ত দিনে ফুলফোটা শেষ হয়। প্রথম গ্রীষ্মে ফুল ঝরে। কিন্তু আকাশে নামে না আষাঢ়।

কোন ভোজের আসরে একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হল। নাম হলেও ঠিক ওই সার্কেলের লোক নয় সে ব্যক্তি। গেঁয়ো স্বাদ গায়ে মাখা।

অল্প বয়স তার, লোলার থেকে অবশ্যই ছোট। চোখে গভীরতা, অধরে তারুণ্য। প্রশস্ত ললাটে তার এখনও দীপ্তির ছাপ। প্রত্যেক দিনের একঘেয়েমির মধ্যে পথচলার আঘাতে সে দীপ্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—যাবেও একদিন।

খাবার টেবিলে ভয়ে ভয়ে চলছে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে আনাড়ি হাতে মাছের ছুরি, মাংসের ছুরি বেছে সন্তর্পণে তুলছে। সামনে তার জীবন্ত আধুনিকতা লোলা

রায়।

ফ্রুট-স্যালাডে চামচে ডুবিয়ে লোলা স্থির সোজা লক্ষ্যে তাকাল তার দিকে। সারাক্ষণ ওই দুটি চোখের লক্ষ্য হয়েছিল লোলা। এবার লক্ষ্যকে লক্ষ্যভেদ করল।

লোলা পুরুষদৃষ্টি-পূজায় অভ্যস্ত। কারণ রূপ না থাকলেও দীপ্তি ছিল লোলার। কিন্তু সেই পূজা শাসিতরূপে প্রকাশ। পূজার যুগ চলে গেছে এখন। তবু বহু যুগের ওপার থেকে চিরন্তন পূজা বিংশ শতাব্দীর জর্জরিত বক্ষে ফিরে এল বুঝি।

খাবার পরে পানীয় গ্লাস হাতে পায়ে পায়ে চলে এল তরুণ। চেখে চেখে সুরাপানের মত কাপ্তেন নয় সে। একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে। অথচ ঈষৎ হলুদ পানপাত্রের ওপরে চোখে তার নীলাভ আকাশ—সেখানে ছায়া পড়েছে লোলার।

কৃষ্ণাভ বাদামী চুলের গোছা আস্তে আস্তে রূপালী হাত দিয়ে পাণ্ডু দালিমের মত কপালের পাশ থেকে সরাল লোলা। সোফায় হাত রেখে বলল, "বসুন না।"

গ্লাস নামিয়ে রেখে সঙ্কুচিত তরুণ সন্তর্পণে লোলার পাশে বসল। চুল তার এখনও আঙ্গুরের গুচ্ছের মত। বাতাস বইলে হয়তো সেই চুলের বাসা এলোমেলো হয়ে যায়। হয়তো বা সেখানে পলাতক কোন পাখী নামতে পারে। চুলের আড়ালে চঞ্চু তার ডুবে যায়। আবার পাখীর বাসা সেখানে বাঁধা হয়।

শীতের দিনে সে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এসেছে। একটা হলুদে শাল পিঠের ওপর এলানো। শালের গাঢ় বাদামী রঙের লাল কাজগুলো এখন উজ্জ্বল নয় আর। হয়তো অনেকদিন আগের বস্তু।

লোলা চোখ নামিয়ে বসে রইল। গাঢ় ছাই রঙের শাড়ীটি টেনে কাঁধের ওপরে দিয়ে নামিয়ে আনল। হঠাৎ বুঝি শীত শীত করছে। চোখের পল্লব দীর্ঘ লোলার। কিন্তু এখন সেখানে অন্ধকার ছায়া। জীবনে বুঝি বিষাদ ওর চোখের পল্লবগুলো অমন কালো করছে। সোসাইটি গের্ল-এর একঘেয়ে জীবন বোধহয় অনেকদিন হয়েই গেছে।

"আপনার পুরো নামটি জানতে ইচ্ছে হয়।"

"আমার নাম লোলা রায়।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন গান বেজে উঠল। তরুণের কণ্ঠে সুর জেগে উঠল ঘরের সামান্য সাধারণ পরিবেশে। সেই সুর হ্যাটর‍্যাকে—সেই সুর ডিভানের গায়ে।

"লোলা? বা, বা! লোলা! লোলা—ললিটা!"

লোলা চমকিত হল। নবোকভের নায়িকার সঙ্গে তার নামের মিল আগে কেউ দেখেনি।

টুক্ টুক্ পি-আনোর ঝঙ্কারের মত টুক্‌টুক্ করে আল্‌গা আল্‌গা সুর বেজে বেজে একটা গান আবার লোপ হয়ে গেল। তারই রেশ বাজতে লাগল এখানে ওখানে।

পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় বসে লোলা বলে উঠল, "কেন যে চা খাওয়াতে

নিমন্ত্রণ করলেন, বুঝলাম না।"

কাঁপা-ভাঙা গলায় সম্বরণ বলল, "ইচ্ছে হয়েছিল, তাই।"

চা ঢেলে নিয়ে বাঁ হাতে স্যান্ডউইচ-এ কামড় লাগাল লোলা। আস্তে ফুলকাটা রুমাল বার করে ঠোঁট মুছল। ঠোঁটের রং আর নখের রং ডালিমফুলী। আজ শাড়ীখানাও তার জয়পুরী—হাল্কা রংয়ের ডালিম সে শাড়ীর গায়ে গায়ে ফেটেছে। নিজের নিভন্ত দিনে একটা রংয়ের পাড় বসাতে চেয়েছে লোলা। অনেক দেখার শ্রান্তিতে শ্রান্ত চোখের তারায় রং জ্বালার বাসনা তার।

"আপনার পরিচয়ের মধ্যে জানলাম শুধু আপনি 'দিগন্ত' পত্রে আছেন।"

"ওই সমস্ত পার্টিতে আমি যাবার ছাড়পত্র পাই না। সেদিন হঠাৎ ওপরের সকলেই অন্যত্র আবদ্ধ ছিলেন—তাই আমাকে যেতে হল।"

বাঁকা চোখে চেয়ে দেখল লোলা। বেশ-ভূষায় সাধারণ ছাপ। এত দামী চা-করে ডাকা তার পর্যায়ের লোকের পক্ষে উচিত হয়নি।

এ কে, উদ্বাহু বামন কিম্বা চালিয়াৎ?

অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মিথ্যাবাদীর কপট পরিচয়ে ও কি লোলার সমাজপরিধির দিকে হাত বাড়াচ্ছে?

"কিন্তু লোকের অন্য পরিচয়ও তো থাকে?" লোলা কথা টেনে নিয়ে গেল।

"কি পরিচয় চান আপনি?" হাসিমুখে সম্বরণ জিজ্ঞাসা করল।

"পরিচয় সামাজিক আছে, পারিবারিক আছে, সাংস্কৃতিক আছে।"

"সামাজিক, নিম্নমধ্যবিত্ত"—ভীরু গলায় বলে চলল সম্বরণ, "পারিবারিক, বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। একান্নবর্তী পরিবারের নাম শুনে আজকাল লোকে ভয় পায়। সাংস্কৃতিক, বিশেষ কিছুই নয়। আপনার কাছে মিথ্যা বলব না এম-এ'টা পাশ করিনি। তবু তো আপনাকে খুজে বার করলাম।"

এ কী ভাষা! সোজা-সহজ। কিন্তু দৃঢ়প্রত্যয়শালী। বিমনা হয়ে লোলা ছোট টেবিলটায় চোখ নামিয়ে রইল। নবোকভের ললিটা সে নয়—হবেও না কোনোদিন। তরুণ কিশলয় বয়স বহুদিন পার হয়ে গেছে। পাপের হস্তলিপি হয়ে কালের বুকে ফুটে উঠতে সে সুযোগ পায়নি। সাধারণ নারীর যা চাহিদা, তারও তাই।

ইতস্তত করে সে বলল, "বাড়ীতে কে কে আছেন?"

'মা, দাদারা, কাকারা, আর আমি। সকলেরি নিজস্ব একটি করে ইউনিট আছে। বাবা মারা যাওয়ায় মা ইউনিট ভ্রষ্ট।"

"আপনার?" সাগ্রহে লোলা প্রশ্ন করল।

"আমার ইউনিটে আমার স্ত্রী আর ছোট মেয়েটি।".

পি-আনোর কর্ড এবার ভাঙ্গাসুরে শেষ হল।

তবু তো—

লোলা, ললিটা!

আমার স্বর্গ ও নরক, আমার পাপ, আমার মুক্তি।

দিনগুলো লোলার বিরক্ত হয়ে ওঠে। কি করে সে বোঝাবে সম্বরণকে তার সময় নেই? খেলাধূলার দিন তার শেষ হয়েছে। যেখানে পরিণতি নেই, সেখানে লোলা আর সময় কাটাতে পারে না।

সম্বরণের ডাকার বিরতি নেই।

টেলিফোনে সে শতবার ডাকে লোলাকে, চিঠি লেখে ক্রমাগত। উত্তর না দিলে অভিমান হয় তার। চায়ের নিমন্ত্রণ জানায় ক্রমাগত।

দুই-চারবার লোলাকে চা-খাওয়াবার পরে লোলা লক্ষ্য করে দেখল হাতে পাথরের আংটিটা নেই তার। লাল একটা পাথর বসানো মরা সোনার আংটি ছিল। হয় পৈতে নয় বিবাহ উপলক্ষে পাওয়া।

তারপরে সম্বরণ চায়ে ডাকলে কোন না কোন অজুহাতে লোলা না করত। সে নিয়ে মানাভিমানেরও অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে বাধ্য হয়ে তাকে ডাকতে হত লোলার।

ভিখারীর মত যে লোক চেয়ে থাকে লোলার দিকে, লোলার সামান্য ভ্রূকুঞ্চনে যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তাকে নিয়ে চলা বিপদ। অথচ ছাড়বে না সে লোলাকে।

"আপনি বিবাহিত। আপনি পিতা। এভাবে আমার সঙ্গে—"

একদিন দ্বিধার বাধা কাটিয়ে লোলা বলেছিল, "আপনার স্ত্রী জানেন যে আপনি আমার সঙ্গে মিশছেন এত?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কিছু মনে করেন না?"

"না তো। আমি অনেক লোকের সঙ্গেই মিশি ওভাবে হয়তো তাই।"

"আপনি এত—বাইরে ঘোরা ছাড়ুন।" লোলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল।

গায়ের জামার মত শাদা হয়ে উঠল সম্বরণের মুখ।

"না, না। না।" বলে উঠল সম্বরণ।

"না কি। আমার সঙ্গে মেশা হবে না আপনার।" তর্জন করে বলে উঠেছিল লোলা।

"লোলা, ললিটা! আমাকে দয়া কর। এমন কথা বলো না।"

শিহরিতা লোলা চুপ করে গিয়েছিল।

তারপরে?

দিনগুলো জট বেঁধে গেল লোলার। হাল্কা মেঘে ভাসা দিনগুলো শ্রাবণের বর্ষণবিকারে ভারী হয়ে উঠল।

যে প্রেমে শেষ দিগন্ত দেখা যায় না, কুয়াশায় আবৃত যার দিগন্ত, তেমন প্রেমে মনে শুধু আসে নৈরাশ্য। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের স্বল্পবিত্ত ছেলে স্ত্রী আর মেয়েকে

নিয়ে ঘর বেঁধেছে। সে ঘর ভাঙ্গতে চায় না লোলা।

ভেঙ্গে যা পাবে, তাতে লোলার চলবে না।

অথচ সম্বরণ বারণ শোনে না। এড়ানো যায় না তাকে।

ধর্মতলা দিয়ে গাড়ী চলছিল সেদিন লোলার বালিগঞ্জের দিকে। বাবাকে হাওড়ায় তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল বাড়ীতে।

একটু বিষণ্ণ ঔদাস্যে রাস্তার দু'পাশে পেভমেন্টের দোকান দেখতে দেখতে চলেছে লোলা। চৌরঙ্গী পাড়ার এধারে বাজার করতে আসে না সে। এখানে নাকি খুবই সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যায়, বন্ধুরা বলেছে।

আজকাল মন ভালো থাকে না লোলার। সম্বরণ তার প্রেমকে সম্বরণ করবে না, বারণ শুনবে না। ও রকম 'ড্যাম্পিশ নোবাডি' লোককে লোলার দারোয়ান ও বেয়ারাই আদেশ পেলে ঠেকিয়ে রাখত। কিন্তু লোলা সে আদেশ দেয়নি। কেন লোলা সস্তা সাংবাদিককে সরাতে পারছে না, জানে না সে।

শুধু মন তার অবসাদে নিভে আসছে। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে আছে লোলা।

রাস্তার বেসাতির ওপর ঝুকে সম্বরণের মত দর্শনধারী এক ব্যক্তি কি যেন কিনছেন। ঠিক যেন সম্বরণ।

ও তো সম্বরণই। আরে! সোজা হয়ে বসল লোলা। বেলা প্রায় এগারোটা। ফুটপাতের সস্তা পশরা মেলার ধারে উবু হয়ে বসে সম্বরণ কি কিনছে?

হয়তো পত্নীর জন্য সস্তা প্ল্যাস্টিকের চিরুণী কিম্বা কন্যার জন্য খেলনা। এখানে? এই পরিবেশে?

এই তো ওর যোগ্যস্থান। একান্ত সংসারী লোকটি ছিটকে এসেছে লোলার কাছে। সে প্রেমিক নয়, সুবিধাবাদী।

বিষণ্ণ মন লোলার শক্ত হয়ে উঠল। আত্মগ্লানির উদয় হল।

তারপরে কয়েকদিনের মধ্যে লোলা চলে গেল বোম্বাই শহরে পিসতুতো দিদির বাড়ী। জামাইবাবু আধুনিক ও ধনী, দিদি স্নেহশীলা। এখানে সম্বরণকে জানিয়ে গেল না।

চন্দ্রালোকে জুহু বীচ, প্রমোদ ভ্রমণের স্বর্গ।

শীতের সন্ধ্যা, কিন্তু শীতের চিহ্ন নেই এখানে। চির বসন্ত বিরাজমান। ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে সমুদ্র সমতল বালির বিছানায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। আধো অন্ধকারে দলে দলে লোকের সেখানে নানা আনন্দের আবর্তে গতায়াত। কলেজের ছাত্রছাত্রী স্ল্যাকস সালোয়ার পরা খালি পায়ে সোনার মত উজ্জ্বল মিহি বালু ঠেলে ঠেলে জলের ধারে নেমে আসছে। ঝিরঝিরে জল তাদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে, জামা-কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। কল কোলাহলে ছুটে তারা পালাচ্ছে, আবার জলের বুকে নেমে আসছে।

প্রবল বাতাসে জামা-কাপড় গায়ে লেগে যায়, গঠন-শ্রী ফুলে ওঠে। কামনার স্বর্গ জুহুসৈকত।

লোলা এসেছে এখানে, পরিবারের সঙ্গে। দিদি জামাইবাবুর বন্ধুর দল এসেছে।

হৈ-চৈ চলছে কলিকাতাবাসিনী অনূঢ়া, আধুনিকা লোলাকে কেন্দ্র করে। পুরুষের ছোট একটি দল ঘিরে আছে ওকে।

"লোলা, বল তো কাকে পছন্দ তোমার? এরা সবাই যে শেষে ডুএল লড়ে ধ্বংস হবে।" জামাইবাবু সহাস্য প্রশ্ন করলেন। "কি যে বলেন, অসিতদা!" লোলা অনুযোগে স্বর অসহিষ্ণু করে তুলল।

এদের সঙ্গে সামান্য আলাপ তার, গভীরতার প্রশ্ন ওঠে না। তবু তার সমাজে এমন রসিকতার চালান আসে অবিরত।

এদের কাউকে ভাল লাগে না। মনে হয়, বাইরে পোষাক পরানো ডামি। অন্তঃসারশূন্যতা কথাবার্তায়, চলাফেরায় প্রকট হয়ে উঠছে।

"না, না, বেছে নিতে হবে, নিন একজনকে।" হাল্কা পরিহাসটাকে বিলম্বিত করে নূতন রসক্ষেত্র সৃষ্টি করল তারা। চাঁদের আলোয়, শান্ত সমুদ্রের মৃদু ঘুমপাড়ানিয়া গর্জনে যেন নেশা জমে উঠেছিল।

ব্যারিষ্টার অমরেশ বসু এগিয়ে এল। আস্তে কাঁধে হাত রাখল তার, পাইপ-ধরা ঠোঁটে টিপে টিপে বলল, "না হে না, তরুণের দল। আমরা দু'জনই পৃথিবী বহুদিন দেখেছি। লোলা ইজ মাই গের্ল।"

অমরেশ বসুর সম্প্রতি দ্বিতীয়া পত্নী শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছে। বয়স হয়েছে তাঁর চল্লিশ! মেদসম্পন্ন বেঁটে চেহারা, কালবর্ণ, বর্তুলাকার মুখে মেচেতার ছাপ।

লোলার মুখ চাঁদের আলোয় নীলাভ হয়ে গেল অপমানে। তখনি উঠে এল অন্ধকার সমুদ্র কিনারা থেকে অস্পষ্ট যেন জলদেবতা কোনো। দু-একটি লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল সে এতক্ষণ দূরে।

বালি বেয়ে আসতে হচ্ছে, পায়ে জোর লাগছে। তাই দেহ ঈষৎ অবনত তার। বাতাসে গায়ের জামা ফুলে ফুলে উঠছে। স্থির লক্ষ্যে সে দৃঢ়ভাবে জটলার দিকে এগিয়ে এল।

লোলার কাঁধে তখনও প্রৌঢ় লম্পটের হাত থাবার মত আঁকড়ে আছে। হাসছে সকলে তাদের ঘিরে।

কঠিন হাতে লোলার মণিবন্ধ চেপে ধরল আগন্তুক, দৃপ্ত গলায় বলল, নো, শী ইস মাই গের্ল।"

তরুণ সুন্দর একখানা মুখ। চুলের থোকায় তার সামুদ্রিক বাতাসের খেলা। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ অঙ্গ তার। লোলা চমকে উঠল। সারা জটলায় তখন চমক লেগেছে। লোলার দিদি জামাইবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। হাসিঠাট্টার কথার মধ্যে

সম্পূর্ণ বাইরের ব্যক্তি চলে এল কেন?

"তুমি? এখানে এসেছ?" লোলার প্রশ্নে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। অল্প টাকার একটা ট্যুরের লোভ ছাড়তে পারিনি। তুমি এখানে আছ, তা অবশ্য জানতাম না। জুহুতে এসে পেলাম।"

"সম্বরণ,—তুমি কি একা—?" প্রশ্ন পাঠাল লোলা।

"না, একা নই।" অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে সম্বরণ বলল, "আমার স্ত্রী ও মেয়েও এসেছে। ঐ যে ওখানে তারা দাঁড়িয়ে।" জলের দিকে আঙ্গুল দেখাল সে।

জলের ধারে বালির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সজীব পোঁটলা একটি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অশিক্ষিতা ঘরোয়া বৌ। ভুল হবে না কারুর যে জড়দগবকে টেনে এনেছে উৎসাহী স্বামী। সস্তা পোষাকে মোড়া সন্তানটি গেঁয়ো মেয়েদের মত ট্যাঁকে গোঁজা।

এরই স্বামী সকলের সম্মুখে লোলার হাত ধরে টেনে বলতে সাহস পায় লোলা তার প্রিয়া!

অসহ্য রাগে লোলার সভ্যতার বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ঝাঁকুনী দিয়ে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল সে, "কী আস্পার্ধা! আমার কাজ নেই তোমার মত একটা লোকের—তায় আবার বিবাহিত, মেয়ের বাবা! আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখো না। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।"

লোলা নিজেই গট্‌গট্ করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল উঠে বালি পেরিয়ে পথের দিকে।

পেছনে জটলা শতধা হাসিতে ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

কিছুদিন পরে অনেক দূর থেকে একখানা চিঠি এল—"লোলা আমার পাপ, আমার স্বর্গ! তেরো হাজার ফিট উঁচু থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। আমি এখন নেফা এলাকায়। বাড়ীতে মিথ্যা বলে পালিয়ে এসেছি এখানে আমি। সাংবাদিক হিসাবে দেশের প্রতি আমার কর্তব্য করা হয়নি।

আমি নবোকভের নায়ক নই। স্ত্রীর প্রতি উদাসীন না হয়েও তোমাকে ভালবেসেছিলাম সত্য। সেজন্য আমাকে তুমি ঘৃণা করেছ, তা-ও জানি। আমি চরিত্রহীন নই। দুটো ভালবাসাই আমার কাছে সত্য। কিন্তু তারা বিভিন্ন রকম।

আজ এখানে এসেছি আর এক ভালবাসার টানে। আমার চারদিকে নির্মম—বিশ্বাসঘাতক শত্রু। যে কোন উপায়েই পররাজ্যগ্রাসী, লোলুপ পরদেশী ড্রাগনের গ্রাসে হয়তো আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই এসেছি। তবু এই ভালবাসা আমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছে।

লোলা, ললিটা! আমার জীবনে এই তিন ভালবাসার সমন্বয়ে গড়া মানুষ আমি। কোন্ ভালবাসা আমার কাছে শ্রেষ্ঠ এখনও জানা হয়নি।

—সম্বরণ

প্রেমিক ও স্বামী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যুবকটির সঙ্গে দোকানটায় ঢোকার মুখেই দেখা হয়েছিল নিখিলের। তখন যুবকটি নিখিলের চোখের দিকে দু'এক পলক তাকিয়ে থেকেই চোখ ফিরিয়ে নেয়। কোনো কথা বলেনি।

নিখিলও ঠিক মনে করতে পারলো না যুবকটিকে আগে কোথাও দেখেছে কিংবা তার নাম কি। অথচ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যাকগে, নিখিল আর ও নিয়ে মাথা ঘামালো না। সিঁড়ির ওপর একটা লোহার টুকরো পড়েছিল, নিখিল শান্তাকে বলল, দেখো, হোঁচট খেয়ো না।

রবিবারের সকাল। নিখিল শান্তাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের, একটা নিলামের দোকানে এসেছে। বিশেষ কোনো কিছু যে কেনার উদ্দেশ্য আছে তা নয়। যদি হঠাৎ কিছু চোখে লেগে যায়। এখানে সাহেব বাড়ির রুপো বাঁধানো আয়না থেকে শুরু করে শ্বেতপাথরের টেবিল পর্যন্ত অনেক কিছুই পাওয়া যায়। সবাই বেশ সেজেগুজে আসে, কিছু না কিনেও দু'একবার দাম হাঁকতে মন্দ লাগে না।

রোজউডের একটা ছোট্ট বেডসাইড টেবল্ খুব পছন্দ হয়েছে শান্তার ; সে দাম বলতে শুরু করেছে। আরম্ভ হয়েছে পনেরো টাকা থেকে—একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারী এবং একজন গম্ভীর চেহারার পার্শী মহিলা অনবরত দাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন—পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত দর ওঠার পর নিখিল ইশারা করলো শান্তাকে। এরপর জেদাজেদির জন্য দাম বেড়ে যাবে—সাধারণতঃ এইরকম হয়। শান্তা তবু বললো, ষাট টাকা। তারপর থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত পার্শী মহিলাই সেটা কিনে নিলেন একানব্বই টাকায়।

শান্তা নিখিলের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, তুমি বারণ করলে কেন? জিনিষটা ভাল ছিল কিন্তু!

নিখিল বললো, তা বলে অত দাম দেবার কোনো মানে হয় না। রোজউড হোক আর যাই হোক—ঐটুকু তো জিনিষ, পঞ্চাশ টাকার বেশী দাম হয় না।

এই সময় সেই যুবকটি এসে ওদের পাশে দাঁড়ালো। শান্তার দিকে তাকিয়ে বললো, কেমন আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

শান্তা চিনতে পেরেছে। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, ওমা, আপনি? বাঃ, কেন চিনতে পারবো না! আপনি এখন কলকাতায় আছেন?

যুবকটি এবার নিখিলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রতাসম্মত হাসি দিয়ে বললো, আপনি ভালো?

নিখিল এবার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলো ওকে। ছেলেটির নাম অলোক ব্যানার্জি, দু'বছর আগে দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ।

নিখিল চট্ করে একটা মজার ব্যাপার ভেবে নিল। মজাটা হচ্ছে এই, দোকানে ঢোকার মুখে সে ছেলেটিকে চিনতে পারেনি—ছেলেটিও নিশ্চয়ই চিনতে পারেনি। —তা হলে কথা বলতো। ছেলেটি তখন শান্তাকে দেখেনি। কিন্তু ছেলেটি শান্তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে—এবং শান্তাও চিনতে পেরেছে ওকে। অথচ একসঙ্গেই তো আলাপ।

দেখা হয়েছিল দার্জিলিং-এ। নিখিল আর শান্তা সদ্য বিয়ে করে গিয়েছিল হনিমুনে। তখন বর্ষাকাল—বিশেষ লোকজন নেই। হোটেলের পাশের ঘরটাতেই থাকতো এই অলোক ব্যানার্জি। নিজে থেকেই যেচে আলাপ করেছিল।

অলোক শান্তাকে বললে, টেব্‌লটা না কিনে ভালই করেছেন। ওর লক্‌টা খারাপ, আমি আগেই দেখেছি।

শান্তা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কলকাতায় থাকেন?

অলোক বললো, হ্যাঁ, আপাততঃ দু'এক বছরের জন্য কলকাতায়।

দার্জিলিং-এ যখন প্রথম আলাপ হয়, তখন অলোক বলেছিল, ও জামসেদপুরে থাকে। একলা একলা দার্জিলিং-এ গিয়েছিল কেন? সে সম্পর্কে অলোক জানিয়েছিল যে, প্রায়ই সে একা একা নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কোন এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে তার ভালো লাগে না। কখনো পাহাড়ী জায়গায় কখনো সমুদ্রের ধারে ছুটি পেলেই সে চলে যায়।

ব্যাপারটা খুব রোমান্টিক মনে হয়েছিল ওদের কাছে। যুবা বয়েসে সাধারণতঃ কেউ একা একা বেড়াতে যায় না। নিখিল যেমন কখনো যায়নি। হয় যাওয়া হয় বন্ধু-বান্ধব মিলে দল বেঁধে—অথবা বিবাহিত হলে স্ত্রীর সঙ্গে।

একদিন জলাপাহাড় অঞ্চলে একটা পাথরের ওপর একা অলোক ব্যানার্জিকে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকতে দেখে শান্তা পরিহাসের সঙ্গে বলেছিল, দ্যাখো, দ্যাখো, ভদ্রলোক নিশ্চয় ব্যর্থ প্রেমিক। কিংবা কবি-টবি নয় তো! নইলে সন্ধ্যেবেলা কেউ ঐরকম একা বসে থাকে?

শান্তা আর নিখিল দার্জিলিং-এ ছিল দশদিন। এর মধ্যে অলোক ব্যানার্জির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে। কখনো বেড়াতে যাবার মুখেই দেখা হওয়ায় অলোক ব্যানার্জি বলেছে, কোন্ দিকে যাচ্ছেন? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

নতুন বিয়ের পর যারা হনিমুনে গেছে—অন্যদের উচিত নয় তাদের সঙ্গে

বেশী দেখা করা। তাদের নিরালায় থাকতে দেওয়া উচিত। কিন্তু অলোক ব্যানার্জি তা বোঝেনি। এ নিয়ে শান্তা প্রথম প্রথম দু'একবার বলেছে, ভদ্রলোক বড্ড গায়ে পড়া-আমরা আলাদা কোথাও যাবো—তার উপায় নেই। ঠিক ওর সঙ্গে দেখা হবেই! নিখিল উদারভাবে বলেছে তাতে কি হয়েছে, লোকটা তো খারাপ নয়! কথাবার্তা বেশ ভদ্র! পৃথিবীতে একেবারে নিরালা জায়গা আর তুমি কোথায় পাবে?

কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য শান্তা লোকটিকে মোটামুটি সহ্য করে নেয়। অলোক ব্যানার্জি সবসময় বেশ ফিটফাট সেজেগুজে থাকে, ব্যবহার খুবই ভদ্র, নানারকম বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারে। এরকম লোক গায়ে পড়া হলেও এড়ানো যায় না।

নিখিল দু'চারদিনের মধ্যেই একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলেছিল। অলোক ব্যানার্জি পেশায় সেল্‌স্ রিপ্রেজেন্টেটিভ। নানা জায়গায় ওকে একা একা ঘুরে বেড়াতে হয় চাকরির কারণে। সেটাকেই ও একটু রোমান্টিক রূপ দিয়ে বলেছে। হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে অলোক ব্যানার্জির কথাবার্তা শুনে নিখিল বুঝতে পেরেছে—এই হোটেলেই সে বছরে দু'তিনবার আসে। অথচ শান্তার কাছে কথায় কথায় ও একবার বলেছিল, দার্জিলিং-এ এই ওর প্রথম আসা। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘুম-এ গিয়েছিল, শুধু ওদের সঙ্গ পাবার জন্যই। নইলে দার্জিলিং-এ বারবার এসে কেউ প্রতিবার ঘুম কিংবা টাইগার হিল্‌স দেখতে যায় না।

নিখিল অবশ্য এ কথাটা বলেনি শান্তাকে। ঐটুকু মিথ্যে কথা বলে লোকটি এমন কিছু দোষ করেনি। শুধু ওর সম্পর্কে শান্তার ধারণা খারাপ করে দেবার কোন মানে হয় না। নিখিল শান্তার স্বামী, আর অলোক ব্যানার্জির চোখে শান্তা একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলা। একজন সদ্য পরিচিতা সুন্দরী মহিলার কাছে নিজেকে কিছুটা উল্লেখযোগ্য করে তোলার জন্য ওরকম একটু আধটু মিথ্যে কথা সব পুরুষ মানুষই বলে! নিখিলও হয়তো বলতো। সংসারে মন টেকে না এমন একজন যুবক সমুদ্র কিংবা পাহাড়ী জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—এই চরিত্রটি মেয়েদের পছন্দ হবে। তার বদলে, চাকরির জন্য নানা জায়গায় ট্যুরে যেতে হয়—এই সাদা সত্যি কথাটা এমন কিছু না।

যুবকটি শেষপর্যন্ত শান্তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। শেষের দিকে শান্তাকে দেখলেই একটা গদ্‌গদভাব এসে যেত। মাথা নুইয়ে নুইয়ে এমনভাবে কথা বলতো যে দেখলেই প্রেমিক প্রেমিক মনে হয়। কখন নিখিল একটু দূরে যাবে—শান্তার সঙ্গে একটু নিরালায় কথা বলা সম্ভব হবে—সেই সুযোগ খুঁজতো।

সদ্য বিবাহিতা এবং স্বামী সঙ্গে উপস্থিত—এমন মেয়ের প্রেমে পড়া যে উচিত নয় সেটা বুঝতে পারেনি ছেলেটি। তা আর কি করা যাবে। প্রেমে তো সবাই হিসেব করে পড়ে না! ভালবাসা অন্ধ—একথা আর তাহলে বলে কেন? নিখিল

এইসব ভাবতো। নিখিল মনে মনে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতো। হঠাৎ বেড়াতে এসে দেখা, একটু সুন্দরী মেয়েকে দেখে মনটা একটু নরম হয়ে যাওয়া—তার সঙ্গ পাবার একটি ইচ্ছে—এর বেশি কিছু তো নয়! এতে দোষের কিছু নেই।

নিখিল অবশ্য মনে মনে বুঝতে পারলো, অলোক ব্যানার্জি মনে মনে তাকে অপছন্দ করে। তা তো করবেই। মনে মনে কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে তার স্বামীকে কেই বা পছন্দ করে। স্বামীরা অত্যন্ত দুর্ভাগা প্রাণী। তাদের কেউ-ই পছন্দ করে না। নিখিল মাঝে মাঝে নিজেকে অলোক ব্যানার্জির জায়গায় বসিয়ে ভাবতো, সে যদি শান্তার মতন কোনো মেয়ের সঙ্গে এইরকম প্রেমে পড়তো তাহলে সেও কি মনে মনে চাইতো না—স্বামীটা এখানে না থাকলেই ভালো হয়! বস্তুত এরকম ঘটনা তো নিখিলের জীবনেও ঘটেছে।

নিখিল অবশ্য অলোক ব্যানার্জিকে খুব বেশী খুশী করতে পারেনি। অলোকের সঙ্গে শান্তাকে বেশীক্ষণ একা থাকার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সদ্য বিবাহিত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে পরপুরুষের কাছে রেখে দূরে সরে থাকা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সেটা কি ভাল দেখায়? ভদ্রতা সভ্যতা মেনে যতদূর যা করা যায়, নিখিল তাই করেছে।

শান্তাও কি ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। নিশ্চয়ই বুঝেছিল এবং বুঝেও না বোঝার ভান করেছিল। একটা ফিটফাট চেহারার সুদর্শন যুবক সবসময় খাতির করে, প্রশংসা করে কথা বলছে—এটা কোন্ মেয়ের না ভালো লাগে? এমন কি সদ্য বিবাহিতা মেয়েদেরও ভালো লাগে। এর প্রতিদান হিসাবে শান্তা আর কি-ই বা দিতে পারে, টুকরো টুকরো হাসি আর দু'চারটে রহস্য ঘেঁষা সংলাপ। মেয়েদের বিশেষ কিছু দিতে হয় না। মেয়েরা যে মেয়ে—এটাই তাদের মস্তবড় গুণ, ছেলেদের কাছে। সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। নিখিল জানতো, শান্তা কক্ষনো চুপিচুপি রাত্তির বেলা অলোক ব্যানার্জির ঘরে ঢুকবে না। শান্তা ভালো মেয়ে এবং সে নিখিলকে সত্যই ভালোবাসে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে এই রকম দু'একটা ছোট-খাটো প্রেমিক-প্রেমিকার সাইড ক্যারেক্টার এলেও কোন ক্ষতি হয় না।

জলাপাহাড়েই আর একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। সেদিনও ওখানে অলোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নিখিল অবশ্য বুঝতে পেরেছিল অলোক ইচ্ছে করেই সেখানে আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। অলোক জানতো ওরা ওদিকেই আসবে। এরকম অনেকেই করে। অলোক ওদের দেখে বললো, আরেঃ! আপনারাও আজ এদিকে এসেছেন? আমার কিছু করার উপায় নেই, তাই ঘুরতে ঘুরতে এদিকটায় এলাম।

নিখিল বলল, চলুন, একসঙ্গে বেড়ানো যাক।

শান্তা বললো, বেড়াবার কি উপায় আছে? সারাদিন ধরেই তো বৃষ্টি! এতদিনে একবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম না।

অলোক বললো, আজ মেঘ সরে যাচ্ছে! দেখনু, দেখুন-কি রকম উড়ে যাচ্ছে হালকা হালকা মেঘ। আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেতে পারে।

নিখিল ওকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি রেন-কোট কিংবা ছাতা আনেন নি কেন? শুধু শুধু ভিজছেন।

অলোক বললো, একটু ভিজলে কি আর হবে!

নিখিলদের সঙ্গে একটা মাত্র ছাতা। তাতে তারা স্বামী-স্ত্রী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে গেলে কোন দোষ নেই। হনিমুনের সময় সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাশাপাশি আর একজন ভিজতে ভিজতে গেলে অস্বস্তি লাগে। নিখিল বললো, আপনিও আসুন না!

অলোক খুব আপত্তি করা সত্ত্বেও নিখিল তাকে টেনে আনলো। তবে, এক ছাতার তলায় স্বামী-স্ত্রী আর স্ত্রী-র প্রেমিক কিছুতেই ধরানো যায় না—তাতে তিনজনেরই অসুবিধে। যাই হোক একটু বাদে বৃষ্টি কমে গেল অনেকটা। পাউডারের মত মিহি মিহি বৃষ্টি এসে লাগছে গায়ে—নিখিল ছাতা গুটিয়ে ফেলেছে। বহুদূর পর্যন্ত নিচু উপত্যকায় যেন হালকা একটা জাল বেছানো রয়েছে।

এদিকটা খুবই নির্জন, আর কোন ভ্রমণ-পিপাসুকে দেখা যায় না। এই সময় শান্তার হঠাৎ বাথরুম পেয়ে গেল। সৌভাগ্যের বিষয় ছোট বাথরুম। শান্তা ইশারায় নিখিলকে জানালো সে কথা—এখন নিখিলকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কথা শৌখিন প্রেমিকদের কাছে বলা যায় না, স্বামীকেই বলতে হয়।

এমনিতে কোনো অসুবিধা ছিল না। কাছাকাছি মানুষজন নেই—একটা কোনো গাছের আড়ালে শান্তা বসে পড়তে পারতো। নিখিল দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। কিন্তু অলোক রয়েছে যে। অলোকের সামনে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করাই যে লজ্জার ব্যাপার। নিখিল শান্তাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলো, হোটেলে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না। শান্তা অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না। ওরা অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

অগত্যা নিখিলকে ব্যবস্থা করতেই হলো। একটা সুবিধামতন গাছ দেখে নিখিল গম্ভীর মুখ করে শান্তাকে বললো, তুমি কোথায় যাবে বলেছিলে যাও, আমি আর অলোকবাবু রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি।

অলোক প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। অবাক হয়ে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাগ্যিস কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অলোক যেমন সব সময় শান্তার জন্য কিছু না কিছু করার জন্য ব্যস্ত, এ ব্যাপারেও সে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে ফেললে হয়েছিল আর কি। যাই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বেচারা খুব লজ্জা পেয়ে

গেল।

নিখিল অলোককে নিয়ে একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে বললো, এই নিন, সিগারেট নিন।

তারপর আজেবাজে কথা বলতে লাগলো। দু'জনের মধ্যে কোনোরকমে মতের মিল নেই—কথাবার্তা আর কি হবে। নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো, অলোক বেশ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। কথা বলায় তার একটুও মন নেই। যেন তার ভেতরের একটা দুর্বার ইচ্ছে চাইছে একবার মুখ ফিরিয়ে দেখতে শান্তাকে। এটাও তো স্বাভাবিক। নিখিল তার স্ত্রীকে প্রতি রাত্রে দেখে—তার এখন ওরকম ইচ্ছে জাগবার কথা নয়! কিন্তু একজন সুন্দরী মহিলা সম্পর্কে একজন অনাত্মীয় পুরুষের তো সেরকম মনোভাব হবে না। ভদ্রতা সভ্যতার মোড়ক দিয়ে এটাকে যতই ঢেকে রাখা যাক—ব্যাপারটা তো জলের মত সোজা। বেশ কৌতুক বোধ করে নিখিল মিটিমিটি হাসতে লগলো।

যাইহোক, সেবার নিখিলরা চলে আসবার পরও অলোক ব্যানার্জি দার্জিলিং-এ থেকে যায়। অলোক ওদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিল। ঠিকানা বিনিময়, আবার দেখা হবার আশ্বাস ইত্যাদি যা যা হয়—সেবার তো হয়েছিলই। অলোক জামসেদপুরে বেড়াতে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল ওদের। নিখিলও বলেছিল, কলকাতায় এলে অলোক যেন নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে আসে। চিঠিপত্রেও নিশ্চয়ই যোগাযোগ থাকবে ইত্যাদি। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরও নিখিল দেখলো, অলোক তখনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তার প্রেমিক পেছনে পড়ে রইলো।

চলে আসবার আগের দিন নিখিল টের পেয়েছিল যে অলোক ব্যানার্জি বিবাহিত। কি একটা কথা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল। এটা জানার জন্য নিখিলের কৌতূহল ছিল, অথচ জিজ্ঞেস করাও যায় না সরাসরি—তাই সে প্রসঙ্গটা ধরে ঠিক বুঝে নিয়েছে। অলোক অবশ্য কোনদিনই বলেনি যে সে বিবাহিত নয়—কিন্তু নিজের স্ত্রীর কথা সে একবারও উচ্চারণ করেনি এবং তার ঐ একা-একা ভাবটার জন্য যেন ধরেই নিতে হয় যে সংসারেও সে একা। শান্তার সেই রকমই ধারণা।

নিখিল অবশ্য শান্তার এই ভুলটাও ভেঙে দেয়নি। অলোক ব্যানার্জি এ কথাটা চেপে গেছে, বেশ করেছে। এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বিবাহিত লোকদের কি প্রেমে পড়া নিষিদ্ধ? পৃথিবীতে ঢের ঢের বিবাহিত পুরুষই প্রেম করে। তবে মেয়েরা তাদের প্রেমিক হিসেবে বিবাহিত পুরুষদের চেয়ে অবিবাহিত ছেলেদেরই বেশী পছন্দ করে। প্রেমিক—এই ধারণাটাই বিবাহের সম্পর্কের উর্ধ্বে যেন। নিখিল চেয়েছিল শান্তার এই শৌখিন প্রেম-প্রেম খেলাটুকু অবিকৃতই থাকে। শেষ মুহূর্তে ধারণা ভেঙে দেওয়া নিষ্ঠুরতা।

অলোকের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখা হয়নি অবশ্য। বেড়াতে গিয়ে যাদের সঙ্গে আলাপ—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই আলাপ আর বেশীদূর গড়ায় না। তাছাড়া দার্জিলিং-এ যাকে ভালো লাগে, কলকাতায় তাকে আর ভালো না-ও লাগতে পারে। কখনো কখনো ওরা স্বামী-স্ত্রীতে অলোক ব্যানার্জির প্রসঙ্গ তুলে হাসাহাসি করেছে বটে—তবে তার বেশী আর কিছু না।

আবার হঠাৎ এই নিলামের দোকানে দেখা। অনেকক্ষণ ওরা একসঙ্গে রইলো। অলোক কিনে ফেললো একটা বুক কেস এবং প্রায় তার পেড়াপীড়িতেই শান্তাকে কিনতে হলো একজোড়া ফুলদানি! দার্জিলিং-এর গল্পও হলো অনেকক্ষণ এবং অলোককে একদিন তাদের বাড়ীতে অবশ্যই আসতে বলা হলো।

কিন্তু আসতে বলা মানেই নেমন্তন্ন করা নয়। বিশেষ কোনো দিন ঠিক করে নেমন্তন্ন করা। আর, আপনি একদিন আসবেন—এই বলার মধ্যে অনেক তফাত। নিখিল নেমন্তন্ন করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। শুধু তাই নয়, অলোক ব্যানার্জিকে আজ দেখে সে খুশী হয়নি। শান্তা আর অলোকের মধ্যে কথা হয়। তাকে স্বামী সেজে পাশে সারাক্ষণ বোকা বোকা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাছাড়া ভদ্রলোকের যে রকম প্রেমে পড়ার বাতিক, তাতে বেশী প্রেম জমিয়ে ফেললেই মুশকিল। দার্জিলিং-এ ছুটির সময় সে এ ব্যাপারটাতে মজা পেয়েছিল—কলকাতায় নানা কাজের ঝামেলায় এসব ঠিক সহ্য করা যায় না। কোনো ভদ্রলোক কি তার স্ত্রীকে সব সময় পাহারা দিতে পারে? তাছাড়া, কলকাতায় শান্তার তো পুরনো দিনের দু'তিন জন বন্ধু আছেই—দার্জিলিং-এর বন্ধুকে তার কলকাতায় দরকার নেই।

নিখিল আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিল। অলোক যদিও একবার বলেছে যে সে কলকাতায় ফার্ণ রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কিন্তু সেখানে তাদের একবারও যেতে বলেনি। ভদ্রলোকের স্ত্রী কি খুব কুৎসিত দেখতে?

বাড়ি ফিরে শান্তা বললো, ভদ্রলোক বেশ মজার, তাই না? সবসময় এত বেশী বেশী ভদ্রতা দেখাতে চায় যে বোকা বোকা দেখায়!

নিখিল গম্ভীরভাবে বললো, ও দেখছি, এখনো তোমার প্রেমে পড়ে আছে।

শান্তা চোখ কুঁচকে হাসিমুখে বললো, তবে? তুমি ভাবো কি? এখনো লোকে আমার প্রেমে পড়ে!

নিখিলও না হেসে পারলো না। হাসতে হাসতে বললো, দুপুরবেলা যখন আমি বাড়ি থাকব না—তখন যেন না আসা শুরু করে! দেখো বাবা!

শান্তা নিখিলকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো, তুমি বড় অসভ্য।

আসবার আগেই আর একদিন নিখিলের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। ছুটির দিন, তবু নিখিলের অফিস ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দেখলো, সঙ্গে একজন মহিলাকে নিয়ে অলোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিখিল আগে

দেখেও কথা বলেনি—হয়তো ছেলেটি আর একটি প্রেমিকা জুটিয়েছে—এ সময় কথা বলতে গেলে বিব্রত হবে। মহিলাটি বিবাহিত—বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গেই প্রেমে পড়ার ন্যাক আছে ওর।

অলোক ব্যানার্জিই নিজে কথা বললো। ডেকে বললো, এই যে নিখিলবাবু, কি খবর?

আলাপ হলো। মহিলাটি অলোকের স্ত্রী। মনে হয় সাত আট বছরের পুরনো বিয়ে—এর আগে যে অলোক নিজেকে অবিবাহিত হিসেবে পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে এখন আর তার মুখে কোনো লজ্জার চিহ্ন নেই। কোথাও বসে চা খাবার প্রস্তাব দিল অলোকই—কিন্তু নিখিলের তাড়া আছে। তখন ঠিক হলো, ট্যাক্সি পাওয়া তো একটা সমস্যা—সুতরাং একটা ট্যাক্সি পেলে তাতে ওরা একসঙ্গে যাবে। নিখিলের বাড়িই দূরে, নিখিল ওদের নামিয়ে দেবে।

অলোকের স্ত্রীর নাম মমতা, ভারী সরল আর ছেলেমানুষ ধরনের। খুব সহজেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারে। নিখিলকে বললো, আপনাদের কথা ওর কাছে অনেক শুনেছি। আপনার স্ত্রী তো খুব সুন্দরী। একদিন নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ী।

নিখিল বললে, তার আগে আপনারা একদিন আসুন।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল অতি কষ্টে। নিখিল সামনে বসতে যাচ্ছিল, অলোক বললো, না, না, আপনি ভেতরে আসুন। অনেক জায়গা আছে।

মমতা মাঝখানে বসলো, দু'পাশে দু'জন। কিছুক্ষণ গল্প করার পর নিখিল হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে অলোক খুব কম কথা বলছে। মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে যাচ্ছে শুধু। অথচ দার্জিলিং-এ দেখছে, তার সুন্দর কথার ফোয়ারা ছোটে, এমন কি এ কথাও বোঝা যাচ্ছে, অলোক তার স্ত্রীকে একটু একটু ভয় পায়।

নিখিল হঠাৎ দুম করে মমতাকে বলে ফেললো, আপনি ভারি সুন্দর সেন্ট মেখেছেন তো। চমৎকার গন্ধটা।

মমতা একটু লজ্জা পেল। নিখিল তাকালো অলোকের দিকে। অলোকের মুখখানা উদাসীন ধরনের। ভূমিকা বদলে গেছে—অলোক এখন আর প্রেমিক নয়, সে স্বামী। যে-কোন স্বামীর মতনই গো বেচারা ভঙ্গিতে সে অন্য লোকের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

ব্যাপারটায় নিখিল এত উৎসাহ পেয়ে গেল যে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে মমতাকে বললো, শুনুন সামনের সোমবার আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে আপনারা খাবেন। আসতেই হবে কিন্তু, বুঝলেন!

বাকিটা রাস্তা নিখিল আর মমতাই শুধু কথা বলে গেল। অলোকের আর কোন উৎসাহ নেই, সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো অন্যমনস্কভাবে।

প্রেমিক

দিব্যেন্দু পালিত

বিনয়বাবু ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী ভেবেছ তোমরা! তোমাদের জ্বালায় কি আমার মানসম্মান থাকবে না!'

ভোর হয়ে গেলেও তখনো আলো ফোটেনি ভাল করে। বর্ষার আকাশ অনড় হয়ে আছে মেঘে। শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল।

একটা সময় ছিল তখন বিনয়বাবুর বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করতাম আমি। এতদিনের পরিচয়ে গ্যারাজের ওপর আমার ছোট্ট কিন্তু ছিমছাম ফ্ল্যাটটির হদিশ পাওয়া বিনয়বাবুর পক্ষে অসম্ভব নয়। আমার মনে পড়ল একবার কী কারণে যেন তাঁর গাড়িতে লিফট দিয়েছিলেন আমাকে। এই বাড়িটার রং চিরকেলে লাল, মনে রাখা কী আর এমন কঠিন!

কিন্তু এখন আমি অবাঞ্ছিত। তাই এই সজল ভোরবেলায় আমি হেন অবাঞ্ছিতজনের ঘরে বিনয়বাবুর আবির্ভাবে স্পষ্টই বিচলিত হলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তখন সবেমাত্র খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি, বিছানাটা আগোছালো, আমার বেশবাসও কোনো আগন্তুকের চোখের পক্ষে দুরস্ত নয়।

চেয়ারটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই সকালে আপনি! বসুন, বসুন!'

'বসব না। বসবার জন্যে আসিনি!'

আমার আপ্যায়নে একটুও ভাবান্তর ঘটল না বিনয়বাবুর। যেমন-কে-তেমন, অস্থির দেখাচ্ছিল তাঁকে। ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে বললেন, 'অপর্ণা কোথায়! রাত্রে বাড়ি না ফিরে কোথায় গেছে আমাকে বলো। না হলে পুলিশে খবর দেব।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। ভদ্রলোক কী বলছেন, কেন বলছেন, কিছুই বোধগম্য হল না। অপর্ণা বাড়ি ফেরেনি, সেটা অবশ্যই চিন্তার কথা, কিন্তু তার খোঁজে এখানে আসার কী মানে হয়। কৈফিয়ত তলব করার মতো করে বললাম মনে মনে। কাল রাতের ট্রেনে জামশেদপুর থেকে ফিরেছি কলকাতায়। বিনয়বাবুর কথাবার্তা আমার কাছে ধাঁধার মতো মনে হল।

'অপর্ণা বাড়ি ফেরেনি!' কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললাম, 'তাহলে গেল কোথায়—!'

'সেটা জানতেই ছুটে এসেছি। তোমার মুখ দেখতে আসিনি।'

রাগে উত্তেজনায় বিনয়বাবুর ভরাট মুখে একটা লাল আভা ফুটল। ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়ে বললেন, 'তোমরা কি ভেবেছ আমার মানসম্মান নেই! আমি জানি, ওই স্কাউন্ড্রেলটা ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমিও ছাড়ব না।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিনয়বাবু। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'এ কেমন মেয়ে যে নিজের ভাল বোঝে না! শী মাস্ট কাম ব্যাক। আদারওয়াইজ—'

অবাক হলেও আমি ততক্ষণে ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করতে পারছি। কোনোরকমে তাঁকে নিরস্ত করে বললাম, 'আপনি এখন বাড়ি যান। আমি দেখছি। ও নির্মলের ওখানে যাবে—রাত্রে বাড়ি ফিরবে না, এটা হতে পারে নাকি! কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি টাড়ি—'

আত্মীয় বলতে তো ওর মামাবাড়ি। তারা এখন পুরীতে—'

'আমি দেখছি। খোঁজ নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

'একটা পেটি স্কুলমাস্টারের সঙ্গে, উফ্!' দ্রুত নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে উঠতে বিনয়বাবু বললেন, 'আমার মেয়ে এমন করবে! ছি ছি! ভাবতেই পারছি না।'

বিনয়বাবুর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর আমাকে ক্ষুব্ধ করল। কী করা যায়, কী করে অপর্ণাকে ফিরিয়ে আনা যায়, কিছুই ঢুকছিল না মাথায়। স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তিনি মিথ্যে বলবার লোক নন। তাছাড়া, কোন সমস্যায় পড়ে তাঁর মতো বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক এই সকালে আমার কাছে ছুটে আসতে পারেন—স্পষ্টই তা উপলব্ধি করলাম আমি। অপর্ণা কিছুদিন থেকেই মরিয়া হয়ে উঠছিল, কিন্তু বিনয়বাবুর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে বাড়াবাড়ি করেছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি যুবতীর পক্ষে রাত্রে বাড়ি না ফেরা শুধু তার বাবা-মার পক্ষেই অসম্মানের নয়। জানাজানি হলে অপর্ণার পক্ষেও খারাপ। ও কি সত্যিই এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে!

পুরনো রাগটা চাগিয়ে উঠল মাথায়। ভাবলাম, এ নিয়ে নির্মলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। আমি নির্মলের চেয়ে ওয়েল-অফ। নির্মলকে সন্দেহ করা সত্ত্বেও বিনয়বাবু যে আমার কাছে ছুটে এসেছেন, তারও কি কোনো পরোক্ষ অর্থ থাকতে পারে! এসব ভাবতে ভাবতেই তৈরি করে নিলাম নিজেকে। নির্মল-অপর্ণা-অপর্ণা-নির্মল—নির্মলের ঠিকানার দিকে যেতে যেতে অন্যমনস্কতার ভিতর আমি ওদের কথাই ভাবতে লাগলাম। আজ অনেকদিন পরে আমার বুকের মধ্যে থেবড়ে থাকা ক্ষতটা চিনচিন করছে।

কলেজে এবং ইউনিভার্সিটিতে আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। আমি, নির্মল, অপর্ণা। অপর্ণার মতো সুন্দরী চট করে দেখা যায় না। ও এমন এক ধরনের মেয়ে, যুবক বয়েসের শারীরিক প্রচণ্ডতায় খুব সহজেই যে আগুন জ্বালাতে পারে। যার কণ্ঠস্বর

শুনলে, যাকে দেখলে ভালবাসা প্রখর হয়, কাছে পেতে ইচ্ছে করে—কখনো মনে হয় দুই প্রবল বাহুর নিষ্পেষণে পিষে ফেলি। আবার কখনো—খুব মন খারাপের মুহূর্তে—যাকে একান্তভাবে পেতে ইচ্ছে করে, নৈঃশব্দের মধ্যে।

অপর্ণাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে রেষারেষির অন্ত ছিল না। অপর্ণার মন পাবার জন্য কী অসম্ভব চেষ্টাই না করেছিলাম আমি! গোড়ার দিকে ওর সম্পর্কটা ছিল আমারও সঙ্গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সব চেষ্টা, সব ইচ্ছেয় ছাই চাপা দিয়ে অপর্ণা নির্মলকেই তার দেহমনের একমাত্র দাবিদার ভেবে চলে গেল!

কী পেয়েছিল অপর্ণা নির্মলের মধ্যে! সত্যি বলতে, আমার সঙ্গে নির্মলের কোনো তুলনাই হয় না। হতে পারে না। চেহারায় নিতান্তই সাধারণ, ছাত্র হিসেবেও তেমন ভাল ছিল না নির্মল। এখন বড়িশার দিকে একটা প্রায় গ্রাম্য স্কুলের মাস্টার। থাকে অবশ্য আমারই মতো, একা, একটা অন্ধকার ঘর ভাড়া করে। অন্যদিকে অপর্ণা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, গানটান জানে, কলকাতায় বিশাল বাড়ি, গাড়ি, বিখ্যাত অ্যাডভোকেট বাবা—ইত্যাদি। এসব যতই ভাবি ততই আমার মাথার ভিতর সব হিসেব গণ্ডগোল হয়ে যায়। অপর্ণার কথা ভাবতে ভাবতে আরও ভারী হয়ে এল আমার নিঃশ্বাস। স্পষ্ট অনুভব করলাম, নির্মলের সঙ্গে ও যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, এখনো আমি ভালবাসি অপর্ণাকে, যে কোনো মূল্যেই পেতে চাই ওকে। এখনো ঘুমের মধ্যে সে আমার চুলে বিলি কেটে যায়, তার দীর্ঘ চুম্বনের কল্পনায় অনেক রাতে আমি বিছানায় জেগে উঠে বসি।

ততক্ষণে হালকা রোদ উঠে পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। বিছানায় উপুড় হয়ে পরীক্ষার খাতা দেখছিল নির্মল। আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'আ-রে, তুমি! এসো, এসো—'

নির্মলের ঠোঁটে আলগা হাসি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোনো নৈশ বিনোদনের চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। আড়ষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'নির্মল, অপর্ণা কোথায়?'

'অপর্ণা!' নির্মলকে চিন্তিত দেখাল, 'তুমি কি অপর্ণাকে খুঁজতে এসেছ এখানে!'

'হ্যাঁ।' কোনো দ্বিধা না করে ক্ষুব্ধ গলায় বললাম, 'তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ, নির্মল! বিনয়বাবু আজ সকালে এসেছিলেন আমার কাছে। অপর্ণা রাত্রে বাড়ি ফেরেনি!'

'কিন্তু—' সময় নিয়ে নির্মল বলল, 'অপর্ণার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কাল সন্ধ্যেবেলায়। এখান থেকে ওর মামাবাড়ি যাবার কথা—'

'মামাবাড়ি! ওর মামারা এখন পুরীতে—'

'না, সেটা সত্যি নয়। অপর্ণা মিথ্যে বলবে কেন!'

নির্মলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈর্ষা ও রাগে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। বললাম, 'তুমিই যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ কী?'

নির্মল একটু চুপ করে থাকল, কী ভাবল যেন। তারপর বলল, 'তুমি এটা কেন ভাবছ ও এখানে রাত কাটাবে! আমিই বা তা চাইব কেন!'

নির্মলের শেষের কথাগুলো আমার কাছে তেমন জরুরি মনে হল না। আমার প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই পেয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আমি কিছু ভাবছি না। ভদ্রলোককে ছুটে আসতে দেখে খারাপ লাগল, তাই এসেছিলাম। অপর্ণা তাহলে ওর মামাবাড়িতেই গেছে। যাক, চলি।'

'একটু দাঁড়াও।' নির্মল বলল, 'আমিও বেরুব। কথা আছে।'

খাতাগুলো গুছিয়ে রেখে নির্মল বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি ওর ঘর, ঘরের দীন আসবাব, বিবর্ণ দেওয়াল লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখতে দেখতেই শিথিল হয়ে এল আমার হাত পা। যদি এমন হয়, আমি ভাবলাম, ওদের বিয়ে হল, অপর্ণা এসে উঠল এই ঘরে—ও কি থাকতে পারবে! মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠল বিনয়বাবুর নিউ আলিপুরের বাড়ি—সেখানে অপর্ণার জন্যে আলাদা ঘর, আলাদা বাথরুম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ওই বাথরুমের আয়তনই তো নির্মলের ঘরের চেয়ে কম নয়। অনেকদিন আগে এক সন্ধ্যায় অপর্ণার ঘর থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর শব্দে বেজে উঠেছিল আমার রক্ত। সেই অপর্ণাকে এখানে কল্পনা করা যায় না।

নির্মল বলল, 'চলো। বাইরে বেরিয়ে একটু চা খাই। টানা দু'ঘণ্টা খাতা দেখছি, ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।'

নির্মলই আগে বেরুল। পিছন থেকে আমি ওর ক্লান্ত শরীর লক্ষ্য করলাম। দুঃখী মানুষদের একরকম চেহারা হয়—ভিতর-ফাঁপা গাছের মতো, যে কোনো মুহূর্তেই হেলে পড়তে পারে। কিন্তু সম্ভবত এটা আমার কল্পনা, আমি জানি এই মুহূর্তে নির্মলের চেয়ে সুখী আর কেউই নেই। বন্ধু হলেও ও আমাকে বঞ্চিত করেছে, কোনোই পাত্তা দেয়নি অপর্ণার প্রতি আমার আকর্ষণকে। ওর জন্যে আমি দুঃখিত হব কেন!

কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে মুখোমুখি বসলাম আমরা। নির্মল চা বলল। ক্লান্তির মধ্যেও ওর চোখে একটা সরল হাসি ফুটেছে। আমি ঈর্ষা বোধ করলাম। ওই হাসির উৎস আমি জানি। নির্মল হয়তো আমার আর অপর্ণার আগের সম্পর্ক স্মরণ করে এখনো করুণা করছে আমাকে। ওর চোখে চোখ রাখতেও অস্বস্তি হচ্ছিল আমার।

বয় চা দিয়ে যাবার পর নির্মল হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কিছু খাবে?'

আমি না বললাম।

'খেতে পারো।' নির্মল বলল, 'এখন মাসের শুরু, খুব একটা গরিব অবস্থায় নেই।'

অসহ্য! নির্মল যেন তার দৈন্যকেই সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। ওর সামনে নিজেকে কেমন খেলো মনে হল আমার।

'থাক।' আমি বললাম, 'আমার ফেরার তাড়া আছে—'

কথা এগোচ্ছিল না। খানিক চুপচাপ বসে থাকার পর নির্মল বলল, 'অপর্ণা বিয়ের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুমি কী করতে বলো?'

'বেশ তো!' আত্মরক্ষার চেষ্টায় উল্টো গলায় বললাম, 'এভাবে ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি! অনেকদিন তো হল। যত দেরি করবে ততই ঘোরালো হবে।'

'বাড়িতেও ও খুব শান্তিতে নেই।' নির্মল বলল, 'ওর বাবাকে তো তুমি জানো! আমাকে উনি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন না। অপু কাল আমাকে বলছিল, বাড়িতে থাকা আর ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।'

নির্মলের কথাগুলো আমার বিশেষ অচেনা লাগল না। খেলাটা কি তাহলে শেষ হয়ে গেল, বিচলিত হয়ে আমি ভাবলাম, যা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে কি তাই ঘটতে যাচ্ছে!

কিছু বলতে হবে বলেই বললাম, 'তুমি কী ভাবছ?'

'ভাবা ছেড়ে দিয়েছি, আমি কোনোদিন ভাবিনি, এখনও ভাবছি না। কিন্তু।' নির্মল ঝুঁকে এল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভাবছি, এই বিয়েটা না হলেই ভাল হত। আমার সন্দেহ হয়, শেষ পর্যন্ত অপু হয়তো আমার জীবন সহ্য করতে পারবে না।'

অবান্তর ভেবে জবাব দিলাম না আমি।

নির্মল বলল, 'কাল অনেক বুঝিয়েছি ওকে। শুনতে চায় না। দেখি, আবার বোঝাব। চলো—'

ফেরার রাস্তায় অনুভব করলাম বুকের ভিতর ঘন ও ভারী হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস। ভাবলাম, অপর্ণা যে নির্মলের সঙ্গে রাত কাটায়নি, তার মামাবাড়িতেই গেছে—ওর বাবার কাছে সে খবর পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাকেই বা নিতে হবে কেন!

বস্তুত, এক ধরনের ক্ষোভ পাগল করে তুলেছিল আমাকে। এমন কিছু কি এর মধ্যে ঘটতে পারে না, ভাবলাম, যে-ঘটনা অপর্ণা ও নির্মলকে বরাবরের মতো আলাদা করে দেবে! রোজই তো কলকাতার রাস্তায় কত দুর্ঘটনা ঘটে, কত লোক মারা যায়। তেমনিভাবে, খুব সহজে, আর একজনও তো চলে যেতে পারে! কে যাবে! নির্মল? না অপর্ণা?

না, না, অপর্ণা নয়, অপর্ণা নয়।

কিন্তু আমার কোনো ইচ্ছাই কার্যকর হল না। কিছুদিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করল ওরা।

সাক্ষী হিসেবে নির্মল তার এক দূর সম্পর্কের দাদাকে ডেকে এনেছিল। অপর্ণা এনেছিল ওর বন্ধু শ্যামলীকে। আর আমি—অপর্ণা এবং নির্মল দু'জনেই আমাকেও খবর দিয়েছিল।

আমার সমস্ত ঈর্ষা, দুঃখ ও যন্ত্রণা উসকে দিয়ে সেদিন আরো চমৎকার হয়ে উঠল অপর্ণা। শুধু নিজের জন্যে নয়, আমার কষ্ট হচ্ছিল অপর্ণার জন্যেও। নির্মল তো ওর

যোগ্য নয়, আমিও কি যোগ্য ছিলাম!

এসব দার্শনিক চিন্তার জেরও বেশিক্ষণ থাকল না মনে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় কিছু খাওয়া-দাওয়া হল, খানিক রঙ্গ-রসিকতাও। চোরা চোখে সারাক্ষণ আমি লক্ষ্য করছিলাম অপর্ণাকে—এখন ওকে দেখাচ্ছে রানির মতো, চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পুরুষের অধিকারে চলে যাওয়া নারীর লাবণ্য। আমার বুকের মধ্যে একটা সুন্দর স্বপ্ন ধীরে ধীরে গুঁড়িয়ে যেতে থাকল। এমনই কি হবার কথা ছিল, ভাবলাম, একদিন খুব কাছাকাছি এসেও যে অপর্ণা প্রত্যাখান করেছে আমাকে আমার তো প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল তার ওপর। বদলে আমি সাক্ষী থাকলাম ওর বিয়ের! সম্পর্কটা তাহলে শেষই হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সব সম্ভাবনাও। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীরে ঘনিয়ে এল প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে নির্মলের দাদা আর শ্যামলী চলে গেল। আমিও যাচ্ছিলাম। অপর্ণা যেতে দিল না।

এরই মধ্যে গড়িয়ার দিকে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিল ওরা। এখন সেখানেই যাবে। নির্মল আমাকেও ট্যাক্সিতে উঠতে বাধ্য করল।

ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে সারাক্ষণ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। কঠোর হয়ে উঠল চোয়াল। পিছনে বসে আছে আমার দুই আততায়ী, আমাকে খুন করার পর আজ রাতে ওরা শরীরে শরীর ঘষে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবে।

'কী, চুপ করে আছ কেন!' অনেকটা রাস্তা এগিয়ে এসে অপর্ণা বলল, 'তোমাকে হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর লাগছে!'

'না, কিছু নয়—।' বুঝলাম না অপর্ণা আমাকে ঠাট্টাই করল কিনা।

'আমি জানি তুমি এখন কী ভাবছ!'

অপর্ণার কথা শুনে এই প্রথম পিছনে তাকিয়ে আমি দেখলাম, অপর্ণার ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরে নির্মলের একটা হাত ঘিরে রেখেছে ওকে। অসম্ভব। আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল।

অপর্ণা কী বলবে এরপর? এমন কিছু কি, যা আমাকে আরো ছোট করে দেবে! না, তা আমি হতে দেব না।

আমি বা অপর্ণা কিছু বলবার আগেই নির্মল বলল, 'অপু, তোমার বন্ধুকে একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে ডাকো না?'

অপর্ণা বলল, 'হ্যাঁ, এসো না একদিন! পরশু রবিবার। আসবে?'

অসহ্য! সমস্ত ব্যাপারটাকে অসহ্য মনে হচ্ছিল আমার কাছে। অনুভূতি বলে দিল, আর এক মুহূর্তও এদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিয়ে অন্ধকারেই অপর্ণার মুখের দিকে তাকালাম আমি।

দু'জনেই অবাক হল। অপর্ণা বলল, 'কী হল? নেমে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।' ট্যাক্সি থেকে নামার আগে বললাম, 'তোমরা একটু গুছিয়ে নাও, তারপর একদিন যাওয়া যাবে। আর হ্যাঁ, তোমার অসুখটার ব্যাপারে সাবধান থেকো। এসব চেপে রাখতে নেই। এখন তোমার বাবা তো আর দেখছেন না—নির্মলকে খুলে বোলো সব—'

'অসুখ!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল নির্মল।

'কী বলছ এসব!' চমকে উঠে অপর্ণা বলল, 'আমার তো কোনো অসুখ নেই!'

'লুকিয়ে রেখে লাভ নেই, অপর্ণা। তুমি জানো, কেন তোমার বাবা বিয়েতে রাজি হচ্ছিলেন না। নির্মলের প্রতি তোমার একটা দায়িত্ব আছে।' ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করার আগে আমি বললাম, 'ভয় কি! এখন নির্মলই তোমার সব। একদিন যা আমাকে বলতে পেরেছিলে, তা নির্মলকে বলতে পারবে না কেন!'

দেখলাম, ট্যাক্সির অন্ধকারে স্তম্ভিত মুখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। পরের মুহূর্তে ট্যাক্সিটা আমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল।

অনেকদিন পরে হাসিতে খলবল করে উঠল আমার বুক। চমৎকার, চমৎকার হয়েছে। আমি জানি, অপর্ণার অসুখ কোনো দিনও সারবে না। আর যত দিন যাবে, আমার কথার বিষে অসুখটা নির্মলের মধ্যেও সংক্রামিত হবে ক্রমশ। ও সন্দেহ করবে অপর্ণাকে। তেমন-তেমন হলে অপর্ণাও কি ঘৃণা করতে শুরু করবে না ওকে?

প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দে আমার পা দুটো এরপর সাবলীল হয়ে উঠল।

দ্বিচারিতা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বাড়ি ফেরার পথে মনস্থির করে ফেলল রঞ্জন। অনেক হয়েছে, আর নয়, আজই কথাটা বলে ফেলতে হবে সীমাকে। বলতেই হবে। কতদিন আর এভাবে দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায়! এবার একটা এস্পার ওস্পার দরকার।

ছুটন্ত মিনিবাস এখন ভিড়ে ভিড়। একটু আগেও রঞ্জন স্ট্যান্ড থেকে উঠেছিল। বেশ ফাঁকা ছিল বাস, বসার জায়গাও ছিল এক আধটা, পার্কস্ট্রিট পেরোতে না পেরোতে মানুষ উপচে পড়ছে, কটু ঘামের গন্ধ বিজবিজ করছে চতুর্দিকে। ক'দিন ধরে গরমও পড়েছে খুব, জানলার ধারে বসেও ঠিক যেন আরাম হচ্ছিল না রঞ্জনের। কসরৎ করে পকেট থেকে রুমাল টেনে এনে মুখ মুছল রঞ্জন। এখনও রুমালে গন্ধটা লেগে আছে। মল্লিকার সুবাস। হয়তো বা চোখের জলও। রঞ্জন কাছে থাকলে মল্লিকা কক্ষনো নিজের রুমাল ব্যবহার করে না, রঞ্জনেরটাই তার চাই।

চোখ বুজে মল্লিকাকে চোখে আনল রঞ্জন। মেয়েটা এখনও বড্ড ছেলেমানুষ। বাচ্চা মেয়ের মতো কারণে অকারণে হাসি, কথায় কথায় অভিমান, দ্যাখ না দ্যাখ চোখ টলটল। খুশীও হয় কত সহজে। কে বলবে মেয়েটার ভেতরে অত চাপা কষ্ট আছে? কোন এক মোদো মাতালের সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল, এক বছরের মধ্যে তাকে ছেড়ে চলে এসেছে, ডির্ভোস নিয়েছে, মনের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে চাকরি বাকরি করছে...

নাকি কষ্টটা আছেই? রঞ্জনকে পেয়ে সব কিছু ভুলে থাকে মল্লিকা? নিশ্চয়ই তাই। রঞ্জনই তো তাকে আবার ভালোবাসতে শেখাল, স্বপ্ন দেখাল নতুন করে, জীবনের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনল। রঞ্জন এখন মল্লিকার সব থেকে বড় আশ্রয়।

তবু আজ মল্লিকা দুম করে বলল, —এভাবে আর কতদিন কাটাব আমরা? এরকম ভেসে ভেসে?

রঞ্জন কাছে টেনেছিল মল্লিকাকে, —কেন? হঠাৎ আজ এ কথা মনে হল কেন?

—অফিসে সব জানাজানি হয়ে গেছে। মঞ্জুদি আজ জিজ্ঞেস করছিল, তোদের সম্পর্কের পরিণতি কী?

—তুমি কী বললে?

—কী বলব। আমি তো নিজেই জানি না। মল্লিকা আঙুলে রঞ্জনের রুমালটাকে পাকাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, —ডিভোর্সি মেয়ে আমি, আমায় নিয়ে কত লোক কত কিছু বলে ...মঞ্জুদি বলছিল, রঞ্জন রায় বউ ছেড়ে তোকে বিয়ে করবে না, দেখে নিস। তোকে খেলাচ্ছে।

রঞ্জন গুম হয়ে গিয়েছিল, —তোমারও কি তাই বিশ্বাস? তোমারও কি মনে হয় আমি তোমায় খেলাচ্ছি?

—আমি কি তাই বলেছি! অফিসে সবাই যা বলাবলি করে...

—বলুক যে যা খুশী! ঠিক সময়ে সবাইকে দেখিয়ে দেব আমরা। রঞ্জন একটু দম নিয়ে বলেছিল,

—তুমি তো জানো আমি তোমায় কী ভীষণ ভালোবাসি। তোমায় ছাড়া আমি...। আমাকে আর ক'টা দিন সময় দাও প্লিজ...

টালিগঞ্জ এসে গেছে, হাঁকাহাঁকি করছে কন্ডাকটার। পকেটে রুমাল গুঁজে রঞ্জন উঠে পড়ল। ভিড় ঠেলে এগোল গেটের দিকে। সামনেই মায়ের হাত ধরে একটা বাচ্চা ছেলে, গুঁতোগুঁতিতে ছটফট করছে বেচারা। একদম বাবুনের বয়সী। রঞ্জন টপকে যেতে গিয়েও কী ভেবে ছেলেটার হাত ধরে ফেলল, সাবধানে নামিয়ে দিল বাস থেকে। ছেলেটার মা ধন্যবাদ গোছের কিছু বলল যেন, রঞ্জনের কানে গেল না। অন্যমনস্ক মুখে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। বাবুনের জন্য আজ কী একটা যেন নিয়ে যেতে বলেছিল না সীমা? রঙ পেন্‌সিল? স্টিকার? চার্টপেপার? মনে পড়ছে না। থাক, সীমা নিজেই কিনে নেবে। সীমা যদি বাবুনকে না-ছাড়ে, যদি জোর করে নিয়ে চলে যায়, তখন তো ছেলের জিনিস তাকেই কিনতে হবে। এখন থেকেই বরং অভ্যেসটা তৈরি হোক।

ভাবতে গিয়ে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল রঞ্জনের। সাড়ে চার বছরের বাবুনটা তার বড় আদরের। সীমাকে নয় ছেড়ে দিতে পারবে, কিন্তু বাবুন? ওদিকে আবার ছেড়ে না-দিলে সীমাই বা থাকে কী করে? সমস্যা। সমস্যা। একটা ব্যবস্থা অবশ্য করা যায়। বাবুন নয় মার কাছে কিছুদিন রইল, কিছুদিন বাবার... কিন্তু সীমা তাতে রাজি হবে কি?

যাক গে যাক, তখনকার ভাবনা তখন ভাবা যাবে। রঞ্জন মন্থর পায়ে হাঁটা শুরু করল। হঠাৎ কোথ্‌থেকে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করছে শরীরে। অফিস ছুটির পর প্রতিদিনই প্রায় মল্লিকার সঙ্গে গিয়ে বসে থাকে গঙ্গার ধারে, নদীর স্নিগ্ধ বাতাস আর মল্লিকার টাটকা নিঃশ্বাস সঞ্জীবনী হয়ে সপ্রাণ করে দেয় তাকে। তবু কেন এত শ্রান্তি? তবে কি মল্লিকার কথা সীমাকে বলতে হবে বলে মনে

মনে টেনশান হচ্ছে রঞ্জনের?

বাড়ির দরজায় এসে বেল টিপল রঞ্জন। অন্য দিনের মতো জোরে জোরে নয়, আস্তে। যেন কোনও অপরিচিতের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সীমা দরজা খুলেছে, —এসেছ? দ্যাখো দিদি তোমার জন্য কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

দিদি মানে রঞ্জনেরই দিদি। কাছেই থাকে, রানিকুঠিতে। রঞ্জনের বিয়ের পর ভাইকে কাছাকাছি রাখবে বলে নিজে বাড়ি দেখে দিয়েছিল। আগে প্রায়ই আসত, ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর চাপ বাড়ায় ইদানীং উপস্থিতি একটু কমেছে।

রঞ্জন ঘরে ঢুকতেই দিদি বলল, —হ্যাঁ রে, তুই নাকি রোজই এই সময়ে বাড়ি ফিরিস? কী করিস এতক্ষণ?

রঞ্জন গম্ভীর মুখে বলল, —কাজ থাকে। ওভারটাইম।

—তা বল। তা এই যে রোজ রোজ ওভারটাইম করছিস, টাকাগুলো জমাচ্ছিস তো?

—যেটুকু পারি জমাই।

—হ্যাঁ, জমা। কদ্দিন আর ভাড়াবাড়িতে থাকবি? এবার একটা নিজের ফ্ল্যাট-ট্যাটের চেষ্টা কর।

সীমা রান্নাঘরে গেছে, চায়ের জল বসাচ্ছে বোধহয়। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, —এই কথাটাই তোমার ভায়ের কানে ভালো করে ঢুকিয়ে দাও তো! এইটুকু-এইটুকু দু'খানা ঘরে থাকি... জল নিয়ে নিত্যদিন অশান্তি...

রঞ্জন মনে মনে বলল, অশান্তি তোমার যাবে না সীমা। ফ্ল্যাট হয়তো কোনও দিন আমার হবে, তবে সে ফ্ল্যাট তোমার হবে না।

মুখে বলল, —আমার মাথায় ফ্ল্যাট আছে রে দিদি। চেষ্টাও করছি।

—খুউব ভালো। করতে হলে এই বয়সে করে ফ্যাল। আমাদের তো কিছু হয়ে উঠল না, তোর হলে আমার খুব আনন্দ হবে।

দিদির স্বরে হাল্‌কা বিষাদ। দুঃখবিলাস! নিজের অত বড় শ্বশুরবাড়ি, তবু আপনি কোপনি হয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারেনি বলে হাহাকার।

অনর্থক কথা বাড়াল না রঞ্জন। ঘরের কোণে ছোট ছোট পিচবোর্ডের টুকরো জোড়া লাগিয়ে ছবি বানাচ্ছে বুবুন। পশু পাখি মাছ ফুল পাতা। ছেলেটা বড় শান্ত, নিজের জগতেই তন্ময় হয়ে থাকে সারাক্ষণ। রঞ্জন এগিয়ে গিয়ে ছেলের কোঁকড়া চুলে হাত বোলাল। তারপর ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে সোজা বাথরুম।

বাথরুমটা বেশ ছোট। মলিন। স্যাঁতসেঁতে। এ-বাড়িতে ঢোকার সময়ে বাড়িওয়ালা শাওয়ার লাগিয়ে দেবে বলেছিল, আজও দেয়নি। চৌবাচ্চা ব্যাপারটাকে বড্ড স্থূল গেঁয়ো মনে হয় রঞ্জনের, তবু কী আর করা! সীমার মতো রসকষহীন নারীকে সে যখন এতদিন সহ্য করেছে, চৌবাচ্চাও নয় চলুক আর

কিছুদিন। সীমার মতো শুঁটকো হওয়ার মেয়ে নয় মল্লিকা, দু'জনের চাকরি করা সংসারে স্বচ্ছন্দে একটা আধুনিক ফ্ল্যাট বানানো যাবে। মগে করে হড়াস হড়াস জল গায়ে ঢালল রঞ্জন। মল্লিকার রুচি আছে, ভারি শৌখিন ভাবে সাজাবে সংসারটা।... কিন্তু সীমাকে কথাটা বলা যায় কী করে? ঝপ করে বলে দেবে? আকস্মিক আঘাতে বিবর্ণ হয়ে যাবে কি আটপৌরে সীমা? গায়ে সাবান ঘষল রঞ্জন, ডলে ডলে সারাদিনের ক্লেদ তুলছে দেহ থেকে। রইয়ে সইয়েও বলা যায় সীমাকে, যাকে কিনা বলে আস্তে আস্তে ভাঙো। একথা-সেকথার মাঝে অল্প ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে, তারপর পুট করে একসময়ে...।

তোয়ালেতে গা মুছতে মুছতে রঞ্জন আবার একটা শ্বাস ফেলল। বেচারা সীমা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা খেল রঞ্জন। দিদির সঙ্গে টুকটাক গল্প করল। দিদি চলে যাওয়ার পর আয়েশ করে সিগারেট ধরাল একটা। লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছাড়ছে।

বাবুন টিভিতে মগ্ন এখন। কার্টুন চ্যানেল। চলমান ছবি দেখে ছেলে কখনও হেসে উঠছে নিজের মনে, কখনও বা চোখ বড় বড়।

রঞ্জন ছেলেকে ডাকল, —কী রে বাবুন, আমার সঙ্গে আজ একটাও কথা বললি না যে!

—বারে, তুমি পিসির সঙ্গে কথা বলছিলে!

—এখনও তো বলছিস না?

—বারে, টিভি দেখছি যে।

রঞ্জন বলতে চাইল, আমায় ছেড়ে তুই থাকতে পারবি তো বাবুন? স্বর ফুটল না। ছেলের এই নিমগ্ন ঘোর কাটিয়ে দেওয়া বড় বেশি নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে।

সীমা পাশে এসে বসেছে। ছেলেকে বলল, —তুমি কিন্তু আজ সন্ধে থেকে একটুও পড়াশুনো করলে না বাবুন।

বাবুন-এর চোখ আবার টিভিতে, —বারে, বিকেলে তুমিই তো ওয়ান টু থ্রি ফোর লেখালে।

—আর রাইম্‌স কে মুখস্থ করবে?

—আমি সব রাইম্‌স জানি।

—বল তো দেখি।

—উঁ উঁ উঁ... বাবুন শরীর মোচড়াচ্ছে।

রঞ্জন ইঙ্গিতময় সুরে বলে উঠল, —ছেলে নিয়ে তোমায় অত চিন্তা করতে হবে না সীমা। বাবুন খুব ইন্‌টেলিজেন্ট, দেখো ও একদিন ঠিক সাইন করবে।

—যত ইন্‌টেলিজেন্টই হোক, ঘষামাজা না-করলে কিচ্ছু হয় না।

—সব হয়ে যাবে।

—তোমার তো খালি ওই এক কথা। বাবুনকে সামনের বছর বড় স্কুলে দিতে

হবে সে খেয়াল আছে?

—দিয়ো।

—কোন স্কুলে চেষ্টা করা যায় বলো তো?

—তুমি কোথায় দিতে চাও?

—আমার তো বাবা সেন্ট পিটারস্‌ই বেশি পছন্দ।

শখ কী বাপস্‌। ওই স্কুলে ভর্তি করতে কম করে বিশ হাজার টাকার ধাক্কা, তাও যদি চান্স পাওয়া যায়। সীমা অত টাকা পাবে কোথ্‌ থেকে? অবশ্য রঞ্জনও দিয়ে দিতে পারে। আইন মোতাবেক খোরপোষ তো কিছু দেওয়াই উচিত। তাছাড়া বাবুনকে বড় করার দায় রঞ্জনেরও আছে একথা সে অস্বীকার করেই বা কী করে?

এখনই কি কথাটা বলে ফেলবে সীমাকে? বলাই যায়! এটাই বোধহয় প্রকৃষ্ট সময়ও। রঞ্জন মনে মনে শুরুটা ভেঁজে নিল, —তোমাকে একটা কথা বলার ছিল সীমা।

—কী, সীমা ফিরে তাকিয়েছে।

—কথাটা একটু সিরিয়াস। তোমায় খুব ঠাণ্ডা মাথায় শুনতে হবে।

পলকের জন্য ভুরুতে ভাঁজ পড়ল সীমার, পলকে মিলিয়েও গেল। সহজ স্বরে বলল, —সত্যি সত্যি কোনও ফ্ল্যাট বুক করেছ নাকি?

—না।

—অফিসের কোনও প্রবলেম?

—না। রঞ্জন সামান্য অসহিষ্ণু হল, —অন্য কথা।

—তাহলে পরে বলো। আমি আগে বাবুনকে খাইয়ে দিই। সীমা উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েও থমকাল, —তুমি রুটি খাবে তো? না ভাত?

রঞ্জন হতাশ। চোখ বুজে ফেলেছে, —রুটিই করো।

কাজের পর কাজ চলছে সীমার। বাবুনকে খাওয়ানো রীতিমত সময়সাপেক্ষ কাজ, অনেক সাধ্যসাধনা করে, ছেলেকে বকে-ধমকে সেই পাট চোকাল সীমা, ফের রান্নাঘরে গিয়ে খান আস্টেক রুটি বানাল, ফ্রিজের হিমায়িত খাবার বের করে করে গরম করছে, দুধ জাল দিল, তারপর স্বামী-স্ত্রীর নৈশাহার সাজাচ্ছে ডাইনি টেবিলে। রঞ্জনের সিরিয়াস কথা শোনার তার এখন সময় কোথায়!

নাহ্‌, খেতে বসেও প্রসঙ্গটা তোলা গেল না। রোজ রোজ বাজার থেকে পটল আনছে বলে উষ্মা দেখাতে শুরু করল সীমা, কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বাজারের হাল বাজারদর শোনাতে হল রঞ্জনকে। তার মধ্যে ঝুপ করে সীমা ইলেকট্রিক বিলে চলে গেল, সেখান থেকে রেশনে। এই সপ্তাহে রেশনে নাকি ডবল চিনি দিচ্ছে, রোববারের ভরসায় থাকলে সব চিনি হাপিস হয়ে যাবে, সুতরাং রঞ্জন যেন কালকেই...

রঞ্জন ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। কথাটা কি তবে আজ বলাই যাবে না?

বাবুন ঘুমিয়ে পড়েছে। খাওয়া সেরে ছেলের পাশে এসে আধশোওয়া হল রঞ্জন। চোখের সামনে মল্লিকা হাজির আবার। মল্লিকাকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে সে। বাসতেই পারে। বউ বাচ্চা আছে বলে কি রঞ্জনের আর কাউকে ভালোবাসার অধিকার নেই? একজনকে ভালো লাগছে, আর একজনকে লাগছে না, যাকে ভালো লাগছে তার সঙ্গে থাকতে চাওয়া কি পাপ? অন্যায়? সমাজ চোখ রাঙাবে? সমাজকে কেয়ার করে না রঞ্জন। মল্লিকা মিশে গেছে তার অস্তিত্বে, মল্লিকা বিনা বেঁচে থাকা এখন রঞ্জনের পক্ষে অসম্ভব।

সীমা ঘরে এল। রঞ্জনের জন্য গ্লাসে জল ঢাকা দিয়ে আয়নায় চুল বাঁধতে বসেছে। আড়চোখে রঞ্জন অনুজ্জ্বল চামড়া, টিকটিকির লেজের মতো চুল, গালে মেচেতার দাগ, বুক পিঠ প্রায় একই। কাঠি কাঠি। তুলনায় মল্লিকা তো রাজহংসী। শুধু বাবুনের মা বলে ওই সীমাকে সহ্য করে যাওয়ার আর কোনও মানেই হয় না।

মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল রঞ্জন। ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকল, —সীমা শোনো। এদিকে এসো তো একটু।

চিরুনি হাতে খাটের ধারে এল সীমা, —কী হয়েছে?

—ওই যে তখন বলছিলাম। তোমার সঙ্গে সত্যিই খুব জরুরি কথা আছে।

—আমারও।

—তোমার আবার কী কথা?

—দিদি সন্ধেবেলা কেন এসেছিল জানো? জামাইবাবুর কোম্পানীর হাল খুব খারাপ। যাকে তাকে নাকি ভলানটারি রিটায়ারমেন্টের নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে।

—সে কী? প্রশ্নটা করতে না-চেয়েও করে ফেলল রঞ্জন, —দিদি তো আমায় কিছু বলল না?

—তুমি তখন সবে খেটেখুটে এসেছ... বলবে। মাত্র দু-চার লাখ দেবে। ওতে ওদের কী ভাবে চলবে বলো তো?

—টাকা তো পাবে। জামাইবাবু কোনও ব্যবসা-ট্যবসা শুরু করতে পারে।

—হুম্। ...তুমি কী বলবে বলছিলে?

—বলছি। বিছানায় এসো।

কথাটায় কি কোনও আহ্বান আছে বলে ধরে নিল সীমা? লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপচাপ চলে এসেছে। বাবুনকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে মাঝখানে শুয়ে পড়ল। শুয়েই উঠে বসেছে। সায়ার দড়ি আলগা করল। খুলে দিল ব্লাউজের হুক। এই গরমে এভাবেই শিথিল হয়ে শোয় সীমা।

রঞ্জন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, —তোমাকে যে কথাটা কী ভাবে বলি! আমি... আমি...

—কী তুমি? সীমা ঝুঁকল।

—ধরো... ধরো ... আমি যদি কখনও অন্য কাউকে ভালোবাসি? মানে ...মানে ...এমন তো হতেই পারে। মন তো কোনও বাঁধা নিয়মে চলে না...! এক দমে বলে ফেলেই সীমার চোখে চোখ রেখেছে রঞ্জন, —তেমন হলে তুমি কী করবে?

সীমা স্থির। অপলক চোখে দেখছে রঞ্জনকে।

রঞ্জন তোতলা হয়ে গেল, —ক্‌ক্‌কী? কী দেখছ? আমি কি আর কাউকে ভালবাসতে পারি না?

—পারো কী? সত্যি পারো?

—যদি পারি, তুমি তাহলে কী করবে? বলেই রঞ্জন একটা বোকার মতো কাজ করে ফেলল। খপ করে চেপে ধরেছে সীমার হাত, —তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে?

সীমা ফিক করে হেসে ফেলেছে এবার, —মুরোদটা আগে দেখাও, তখন ঠিক করব। বলতে বলতে আরও ঝুঁকছে। হাত রেখেছে রঞ্জনের খোলা পিঠে, —এমা ...এই ...তোমার এখানে কী হয়েছে?

রঞ্জন আরও বোকা হয়ে গেল, —কী হয়েছে?

—ইশ, একেবারে চাপড় চাপড়া হয়ে গেছে। সীমা হাত বোলাচ্ছে পিঠের মাঝখানটায়

—নির্ঘাৎ গরমের থেকে হয়েছে। ইশ, জ্বালা করে না তোমার? দাঁড়াও, একটু মলম লাগিয়ে দিই।

আঙুল নড়ছে পিঠে? নাকি যাদুকাঠি? রঞ্জনের শরীর অসাড় হয়ে এল। মনটাও।

উফ্, ভালোবাসি বলার থেকেও ভালোবাসি না বলা কেন যে এত কঠিন।

এক কম্বলের নীচে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মাঝে মধ্যে মাঝ রাত্তিরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ ঝগড়া শুরু হবে, এ তো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

বিয়ের প্রথম দু'বছর বাদ, সে তো একটানা পিকনিক। তারপর যদি একটি-দুটি সন্তান জন্মায়, তখন স্ত্রী তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে কয়েক বছর। বাচ্চারা এই পৃথিবীতে জবরদখল করতে আসে, তাদের দাবিও থাকে অনেকরকম। ইংরিজিতে দাম্পত্য জীবনের সেভেন ইয়ার ইচ বলে একটা কথা আছে, তা নিয়ে একটা চমৎকার ফিল্মও হয়েছিল রূপসী-মোহিনী, মেরিলিন মন্‌রো-কে নিয়ে, বাংলায় বলা যায় এক দশকের গাঁট, সেটা পেরুলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনটা হয়ে যায় নদীর মতন, কখনো প্রবল বর্ষায় খরস্রোতা, কখনো শীতকালের শীর্ণ, নিরুত্তাপ চেহারা।

কখনো ঝগড়া হয় না, সব সময় স্বামী আর স্ত্রীর হাসি-হাসি মুখ, পরস্পরের মন জোগানো কথা, সে জীবন খুবই কৃত্রিম। আর সন্দেহজনক।

ঝগড়া তো হবেই। তবে, ঝগড়া অনেকরকম। বেশির ভাগ ঝগড়াতেই আগুন থাকে না। আলেয়ার মতন হঠাৎ হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আবার সকাল হতে না হতেই মিলিয়ে যায়। আগুন-জ্বলা ঝগড়ায় অনেক সংসার পুড়ে যায়। এ গল্প তাদের নিয়ে নয়।

অরূপ আর বিশাখার মাঝে মাঝে আলেয়া-ঝগড়া হয়। সব সময় নিজেদের বাড়িতেই। অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে তারা সামলে-সুমলে থাকে। বিশেষত কোথাও বন্ধু-বান্ধবের কাছে অতিথি হয়ে থাকলে বড় জোর একটু-আধটু কথা কাটাকাটি পর্যন্ত চলতে পারে, তা ছাড়া একেবারে আদর্শ দম্পতির ছবি।

তবু একবার একটু বেশি ঝগড়াই হয়ে গেল।

আগে তার একটু পটভূমিকা দেওয়া দরকার।

অরূপের বন্ধু অগ্নিভ থাকে শিলচরে, ঠিক শহরে নয়, অদূরের চা-বাগানে। অনেকবার সে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ঠিক সুযোগ হয়ে ওঠেনি, এবারে অরূপের অফিসের কাজে মণিপুর যেতেই হল, সুতরাং অতিরিক্ত কয়েকটা দিন বন্ধুর সঙ্গে

কাটিয়ে আসা যেতেই পারে। বিশাখা কলেজে পড়ায়, তারও এখন ছুটি, ওদের ছেলে পড়ে নরেন্দ্রপুরে, সে হস্টেলে থাকবে।

অগ্নিভ চা-বাগানের ম্যানেজার, তার অতি চমৎকার বাংলো, দু-তিনখানা গাড়ি ব্যবহার করতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও দারুণ, অগ্নিভ'র স্ত্রী রীতার স্বভাবটাই হাসিখুশি, খুব ভালো গানও গায়। সুতরাং চারজনে মিলে বেড়ানো, আড্ডা, খাদ্য-পানীয়ের সদ্ব্যবহারেই ছুটির কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির তো প্রশ্নই ওঠার কথা নয়। তবু এক রাত্রে, দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল আলেয়া। এ আলেয়াতে বেশ আঁচও আছে।

ঝগড়ার উপলক্ষ একটি কম্বল।

দ্বিতীয় দিনে অগ্নিভ কাছাকাছি চা-বাগানের কয়েকজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিল সন্ধেবেলা। আরও তিনটি দম্পতি। সবাই উচ্চশিক্ষিত, উচ্চচাকুরে এবং উচ্চবংশের মানুষ। কাবাব ও মাছভাজা সহযোগে প্রিমিয়াম স্কচ, চিতাবাঘ শিকারের গল্প (আসলে লেপার্ড), গান ও হাসিঠাট্টায় কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা, তারপর ডিনার। এসব জায়গায় এরকমই হয়ে থাকে।

অগ্নিভ আর রীতার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু সওকত আর রোশেনারা। চেহারার দিক থেকে অন্তত এমন মানানসই স্বামী-স্ত্রী খুব কমই দেখা যায়। সওকত যেমন সুপুরুষ, রোশেনারা তেমনই রূপসী। যেন সিনেমার নারী-পুরুষ। বস্তুত চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা না হয়ে ওরা দুজন কেন চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ জীবন দিন কাটাচ্ছে, তা বোঝা শক্ত।

রোশেনারা বসেছিল অরূপের পাশে। কেউ পাশে বসলে তার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলা হয়েই যায়। আবার খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করছিল অরূপ, এখন তিলোত্তমার মতন এক নারী তার সঙ্গে বেশি গল্প করছে, এতে অন্য পুরুষদের হিংসে হচ্ছে না তো? বিশাখা কি কিছু মনে করছে? অরূপ তো ইচ্ছে করে রোশেনারার পাশে বসেনি। একটি সুন্দরী মেয়ে পাশে বসলে উঠে যাওয়াটাও তো চরম অভদ্রতা!

সওকত ঘুরে ঘুরে গল্প করছে সকলের সঙ্গে, বিশাখার সঙ্গেও কী নিয়ে যেন আলোচনা করল খানিকক্ষণ। অরূপ এক জায়গাতেই বসে থাকে, সেটাই তার স্বভাব। রোশেনারা একবার উঠে গেল, কী যেন কাজের কথা বলল রীতার সঙ্গে, আবার ফিরে এল অরূপের পাশে। অনেক চেয়ার ও সোফা খালি রয়েছে, রোশেনারা তো অন্য কারুর পাশে বসলেও পারত, তবু সে কেন আগের জায়গাতেই ফিরে এল, তা অরূপ কী করে জানবে? মেয়েটির কিন্তু তার রূপের জন্য একটু গর্বের ভাব নেই, ন্যাকামিও নেই, যৌন ইঙ্গিতও ছড়ায় না, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে কথা বলে।

রোশেনারা গানও জানে। একটি নজরুলগীতি গাইতে গাইতে সে কথা ভুলে

গিয়েছিল মাঝপথে। অরূপের অনেক গান মুখস্থ থাকে, বিশাখা যখন গান গায়, অনেক সময় অরূপ কথা জুগিয়ে দেয়, সেই অভ্যেসে সে রোশেনারার 'কাবেরী নদীজলে কে গো' গানটির দ্বিতীয় স্তবকের বাণী ধরিয়ে দিল, তখন অন্যরা বললেন, আপনিও গান না ওর সঙ্গে, রোশেনারাও মিনতি করল চোখের ইঙ্গিতে।

দু'জনে শেষ করল গানটা। ডুয়েট।

অরূপ রোশেনারার সঙ্গে সুর মিলিয়েছে, গলা মিলিয়েছে, কিন্তু সে একবারও রোশেনারার হাতও স্পর্শ করেনি।

কিছুটা মদ্যপানের পর অন্য মেয়েদের একটু গা ছুঁয়ে কথা বলার ঝোঁক থাকে পুরুষদের, অরূপ কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে। মাঝে মাঝে তার চোখাচোখি হচ্ছিল বিশাখার সঙ্গে, বিশাখা অবশ্য কোনোরকম রাগের ভাব দেখায়নি। অরূপের মনে হল, তার বউও এখনো বেশ সুন্দর আছে।

ডিনারের পর বিদায় নেবার পালাতেও কিছু সময় কেটে যায়। গাড়িতে ওঠার আগেও থেকে যায় গল্পের রেশ। সবাই দাঁড়িয়েছে বাইরের চাতালে। এখানে উজ্জ্বল আলো থাকলেও একটু দূরেই মিশমিশে অন্ধকার। বেশ শীত পড়েছে। দূরে ডাকছে একটা রাতপাখি।

অতিথিরা চলে যাবার পরেই বিশাখা বলল, আমার খুব ঘুম পেয়ে গেছে, আমি শুতে যাচ্ছি।

অরূপ আর অগ্নিভ একটুখানি কনিয়াক নিয়ে আরও বসল খানিকক্ষণ। অরূপের চোখ ঘুমে ঢুলে এল আগে।

ওদের শুতে দেওয়া হয়েছে ডানদিকের একটি কোণের ঘরে। সে ঘরটি খুবই প্রশস্ত, সংলগ্ন বাথরুমটিই বৈঠকখানার মতন বড়। জানলা খুললেই দেখা যায় বাগান, দূরে পাহাড়ের পটভূমিকা। পাহাড়ের চূড়ায় একটা মন্দিরের আলো জ্বলে।

ঘরের মধ্যে একটা আবছা নীল আলো জ্বলছে। কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে বিশাখা, সম্ভবত ঘুমন্ত। পা টিপে টিপে এসে, শব্দ না করে পোশাক বদলে ফেলল অরূপ, বাথরুম ঘুরে এসে শুয়ে পড়ল। কলকাতায় ঘুমের আগে কিছু না কিছু বই পড়া অভ্যেস, এখানে বিছানার পাশে আলো নেই, রাতও হয়েছে অনেক।

রাতপাখিটার ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল অরূপ।

কতক্ষণ পর কে জানে, কিসের যেন শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অরূপের। কেউ কি কাঁদছে? কোনো নারীর আর্ত বিলাপ? না কি এটা স্বপ্ন?

চোখ মেলে দেখল, বিছানার অন্য পাশে হাঁটুতে থুতনি দিয়ে বসে আছে বিশাখা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আপন মনে কী যেন বলছে!

ব্যস্ত হয়ে অরূপ জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, মণি? পেট ব্যথা করছে?

বিশাখা কোনো উত্তর দিল না।

অরূপ গড়িয়ে কাছে এসে বিশাখার একটা হাত ধরে আন্তরিক উদ্বেগের সঙ্গে বলল, কী হয়েছে, কিছু কষ্ট হচ্ছে?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তীব্র গলায় বিশাখা বলল, যাই হোক না, তাতে তোমার কী আসে যায়? আমি মরে গেলেও তো তুমি খুশি হবে!

অরূপ একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। প্রত্যেকবার ঝগড়ার সূত্রপাত ঠিক এইভাবেই হয়। বিশাখা নিশ্চিত জানে, এই কথাগুলো অরূপের বুকে বিষের তীরের মতন বিঁধবে। মানুষ যে-দোষ করে না, সেই দোষের অভিযোগ করলে সবচেয়ে বেশি আহত হয়। বিশাখার মৃত্যু হলে কেন খুশি হবে অরূপ, সে কি অতটাই খারাপ লোক? বিশাখার বিরুদ্ধে তার তো তেমন কোনো অভিযোগ নেই। বিশাখাকে এখনও সে ভালোবাসে, হয়তো নতুন প্রেমিকার মতন নয়, কিন্তু স্ত্রী হিসাবে, তার সন্তানের জননী হিসাবে, তার জীবনসঙ্গিনী হিসাবে।

অরূপ আহত হলেও সংযত গলায় বলল, মরে যাবে কেন? কী অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বলো।

বিশাখা বলল, তোমার জানার দরকার নেই। তুমি মদ খেয়ে মাতাল হবে, তারপর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে, তাই ঘুমোও!

এটাও আর-একটা বিষের তীর। অরূপ নিয়মিত মদ্যপান করে বটে, কিন্তু বিশাখা ছাড়া তাকে আর কেউ মাতাল বলে না। সবাই বলে, অরূপকে কখনো বেচাল হতে দেখা যায় না। তাতে অরূপ গর্ব অনুভব করে। মাতাল শব্দটি সে অপছন্দ করে। এক-একদিন হয়তো মাত্রা একটু বেশি হয়ে যায়, শরীর কিছুটা দোলে, কথা বলে উচ্চকণ্ঠে, কিন্তু সে কারুর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে না, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি হারায় না, গালমন্দও করে না। মেজাজ ফুরফুরে হয়। তারপর তো সকলেই ঘুমোয়। সে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়, কে নিঃশব্দে, তা কে জানে? অরূপের নাক-ডাকা সম্পর্কে বিশাখা কখনো তেমন অভিযোগ জানায়নি। আজকাল বিশাখাও পিচ পিচ করে নাক ডাকে, ঘুম না-এলে অরূপ তা শুনতে পায়। কিন্তু একবারও সে-কথা বলেনি বিশাখাকে।

অরূপ বলল, আমি মোটেই মাতাল হইনি! তুমিও তো আজ দিব্যি জিন খাচ্ছিলে দেখলাম। দুবার না তিনবার নিলে।

বিশাখা কণ্ঠস্বরে অনেকখানি ঝাল মিশিয়ে বলল, তুমি দেখেছিলে, আমার দিকে দেখার তোমার সময় ছিল? তুমি তো একজন সুন্দরীকে নিয়েই মত্ত হয়ে ছিলে।

অরূপের মনে মনে এই আশঙ্কাই ছিল। রোশেনারা। সে কেন অরূপের পাশে বসেছিল সারাক্ষণ, তার জন্য তো অরূপ দায়ি নয়! সে তো মহিলাকে ডাকেনি, টানাটানিও করেনি।

এবার কি একটু ঝাঁঝ এসে গেল অরূপের গলাতেও? সে বলল, মত্ত

হয়েছিলাম মানে? একজন পাশে বসলে কথা বলব না?

বিশাখা বলল, শুধু কথা? চোখ সরাতেই পাচ্ছিলে না। তারপর হিন্দি সিনেমার নায়কের মতন মাঝপথে গান জুড়লে!

এরপর কথার পিঠে গরম গরম কথা। চাপা গলায় ঝগড়া।

একসময় অরূপ আবার বিশাখার হাত ধরে বলল, এত রাত্তিরে এইসব কথা বলে কোনো লাভ আছে? শুধু শুধু ঘুম নষ্ট। শুয়ে পড়ো। কাল সকালে কথা হবে।

বিশাখা বলল, তুমি ঘুমোচ্ছিলে, ঘুমোও না! কে বারণ করেছে? আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি এতক্ষণ। তুমি নেশার ঝোঁকে কম্বলটা টেনে নিচ্ছিলে বারবার। ওঃ, আমার ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি কোথাও চলে যেতে। এরকম বিছানায় কেউ শুতে পারে? শীতে কাঁপছি! কাল সকাল হলেই আমি কলকাতা ফিরে যাব। তুমি থাকো এখানে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ফস্টিনস্টি করো, আমি এখন দেখতে খারাপ হয়ে গেছি—

অরূপ বলল, মণি, প্লিজ, প্লিজ। তুমি মোটেই দেখতে খারাপ হওনি। আমি তোমাকে আগের মতনই ভালোবাসি!

বিশাখা বলল, বাজে কথা বলো না। সব পুরুষরাই স্বার্থপর, কম্বল টেনে নিয়ে নিজে ঘুমোচ্ছো, কার স্বপ্ন দেখছো, এদিকে আমি...

আসল সমস্যাটা কি তা হলে কম্বল নিয়ে?

এ-কম্বলটা খুবই অভিনব। খাটটাই মস্ত বড়, অন্তত তিন-চারজন শুতে পারে। চারখানা মাথার বালিশ, দুখানা পাশ বালিশ, কিন্তু কম্বল একটিমাত্র। এতবড় কম্বল দেখাই যায় না। এবং মখমলের কভার, ভেতরে যে উল আছে তা বোঝাই যায় না, ভারি নরম আর আরামের। এ-কম্বলের নিচে অন্তত চারজন শুতে পারে।

চা-বাগানের বাংলোয় নিশ্চয়ই আরও অনেক কম্বল আছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জন্য যে এই একটিমাত্র কম্বল দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চয়ই এই কম্বলটার বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

মধ্যরাত্রির বিবাদ একসময় থেমে যাবেই। স্বামী আর স্ত্রী দু'দিকে ফিরে শোবে, একসময় ঘুমিয়েও পড়বে।

কিন্তু অরূপের আর ঘুম আসছে না।

মাতাল হবার অভিযোগ তাকে কষ্ট দিয়েছে। একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে মেতে উঠে নিজের স্ত্রীকে অবহেলা করার অভিযোগ সে মানতে পারেনি। অবশ্য এরকম অভিযোগ সে আগেও কয়েকবার শুনেছে প্রকারান্তরে।

সবচেয়ে বেশি আঘাত সে পেয়েছে স্বার্থপরতার কথা শুনে। সে স্বার্থপর, স্ত্রীকে শীতের কষ্ট দিয়ে সে একা কম্বল উপভোগ করেছে? অরূপের মতন পুরুষরা নিজের স্ত্রীর কাছেও শিভালরাস থাকতে চায়। নিজে কম্বল গায়ে না দিয়ে জড়িয়ে

দিতে চায় বিশাখাকে।

এক-একজন পুরুষের শোওয়াটা বেশ অদ্ভুত ধরনের হয়। ঘুমের মধ্যে তারা সারা বিছানা ঘুরে বেড়ায়। পাশের লোকের গায়ে পা তুলে দেয়। বিয়ের আগে অরূপের এই দোষ খুবই ছিল। এখন শুধরে গেছে, বিশাখা কখনো অরূপের শোওয়া নিয়ে দোষ দেয়নি। কিন্তু কম্বল টেনে নেওয়া? কলকাতায় দু'জনের জন্য আলাদা কম্বল থাকে। বিয়ের পর প্রথমদিকে দু'জনের আলাদা কম্বল, ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। ইদানীং দু'জনে যখন শুতে যায়, মাঝে মাঝে শরীর নিয়ে মত্ততার পর, ঘুমোয় আলাদা আলাদা কম্বলে। শরীর-সুখের পর ঘুমের সুখ আরও বেশি। আলাদা কম্বলের ঘুমের সুখ অবধারিত।

ইদানীং শরীর নিয়ে মত্ততার রাত্রি ক্রমশ কমছে, বাড়ছে ঘুমের সুখের ব্যাকুলতা। ঘুম বিঘ্নিত হলে বিশাখার খুবই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হয়তো সব মেয়েরই হয়।

এখন বিশাখার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ কম্বল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঝগড়ার পর বিজয়িনী হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিশাখা। শুধু জেগে থেকে ছটফট করছে অরূপ।

এ জাগরণ অন্যরকম।

আমরা অনেক সময় ভাবি, সারারাত ঘুম আসছে না। আসলে, পুরোপুরি জাগ্রত থাকার বদলে এ এক ধরনের আধো-ঘুম। পাতলা পাতলা স্বপ্নের মধ্যে কেটে যায় সময়।

অরূপও আধা-জাগ্রত অবস্থার মধ্যে অনবরত ভেবে যেতে থাকল, একটাই কথা— সে স্বার্থপর! সে বিশাখার কাছ থেকে এতবড় কম্বলের অনেকটা কেড়ে নিয়ে নিজে ঘুমিয়েছে! বিশাখার অভিযোগ হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়। সে কি অন্যদিনের তুলনায় আজ বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে? রূপসী রোশেনারা পাশে ছিল বলেই তার শরীর বেশি চনমনে হয়ে গিয়েছিল? এত বড় কম্বল, তবু ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে টেনে নিয়েছিল অনেকখানি? হতেও তো পারে।

আধো-ঘুমের মধ্যে অনুতপ্ত বোধ করল অরূপ। বিশাখাকে তার আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে হল। কিন্তু এরকম ঝগড়ার পর হঠাৎ ভালোবাসার কথা ঠিক বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না। মনে হয় যেন মনযোগানোর কথা।

হঠাৎ একটা যুক্তি মাথায় এসে গেল অরূপের।

হতে পারে, সে আজ একটু বেশি মদ্যপান করে ফেলেছে। হতে পারে, নেশাগ্রস্ত ঘুমের ঘোরে সে বিশাখার গা থেকে কম্বল টেনে নিয়েছে। কিন্তু তার তো একটা সহজ সমাধানও ছিল। বিশাখা কেন তার দিকে সরে এল না? বিশাখা যদি তাকে জড়িয়ে ধরত, তা হলে তো দু'জনের জন্যই প্রচুর কম্বল থাকত? কেন এল না বিশাখা? সে তো বিশাখার শত্রু নয়, শীত করলে বিশাখা তাকে

জড়িয়ে ধরবে না কেন?

এক্ষুনি বিশাখাকে জাগিয়ে এই যুক্তিটা কি শোনানো যায়? কী উত্তর দেবে সে?

কিন্তু বিশাখা এখন দিব্যি ঘুমোচ্ছে। এখন তাকে জাগাবার প্রশ্নই ওঠে না।

অরূপের আধো-ঘুমের স্বপ্নটা ক্রমশ অন্যরূপ নিতে লাগল। সে দেখল, একটা বিশাল কম্বল, শত শত মাইল লম্বা, তার নিচে অনেক মানুষ। এরা কারা? এরা সারা দেশের মানুষ। এক কম্বলের নিচে শুয়ে আছে। কখনো কম্বলটা সরে গেলে সবাই কাছাকাছি এসে জড়াজড়ি করছে, হাসছে, গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরী, সুন্দরবনের মানুষ। কম্বলটা একদিক থেকে অন্যদিকে বেশি সরে গেলে সবাই হাসাহাসি করে ঠিক করে নিচ্ছে।

শেষ রাতের স্বপ্ন হঠাৎ তো থেমে যায় না, চলতেই থাকে। যারা এরকম স্বপ্ন দেখে, তারা জানে, অন্যমনস্ক হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেও স্বপ্নটা চলতেই থাকে। অরূপ দেখতে লাগল, সারা আকাশ জুড়ে উড়ছে একটা কম্বল। রং বদলাচ্ছে, তবু, প্রধানত নীল রঙের।

তারপর অরূপ দেখল, সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে একটা নীল রঙের কম্বল, আকাশের বদলে, সেই কম্বলের নিচে পৃথিবীর সব মানুষ। আকাশের সেই কম্বল নিয়ে টানাটানি চলছে, আবার ঠিকঠাক করে নিয়ে খলখল করে হাসছে সব মানুষ, কালো-সাদা, খয়েরি রঙের মানুষ, ঝগড়া হচ্ছে, আবার মিটেও যাচ্ছে। মানুষ কাছাকাছি এলেই ঝগড়া মিটে যায়, দূরত্বই যত গণ্ডগোলের মূল।

আধো-ঘুমন্ত অরূপের ঠোঁটে ফুটে উঠেছে হাসি, সে পৃথিবীর কী দারুণ একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে আজ। আকাশটাকে সমগ্র মনুষ্যজাতির একটা কম্বল বলে ধরে নিলেই তো হয়। আর কখনো ঝগড়া হবে না।

সকালে যখন অরূপের ঘুম ভাঙল, তখনও বিশাখা ঘুমন্ত, নিজের অজ্ঞাতেই সে জড়িয়ে আছে অরূপকে। শরীরে শরীর, বুকে বুক অতবড় কম্বলটা পড়ে আছে খাটের নীচে।

ব্যাভিচারিণী

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

'খারে পদ্ম, খা, একটা চুমো খা', বলতে বলতে লখীন্দর তার পেশল কব্জিতে পদ্মকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটদুটো ভরে নেয় নিজের ঠোঁটের ভেতর। একটা পিচ্ছিল শিরশির চেতনা লখীন্দরের শরীরময়, আর মুহূর্তে পদ্মর লাল চেরা জিব ছুঁয়ে ফ্যালে লখীন্দরের জিব। পদ্মর ঠোঁট দুটো বার করে কিছুক্ষণের জন্য অবশ হয়ে যায় সে, তার শরীরে ঝিম ধরে, জিব থেকে রক্তের ভিতরে ক্রমশ সেঁধিয়ে যেতে থাকে একটা ঘুম। ততক্ষণে পদ্ম লখীন্দরের শরীরে জড়িয়ে জড়িয়ে মাথাটা রাখে তার কাঁধের ওপর। এক-একবার চেরা জিব বার করে চকিতে ঢুকিয়ে নেয় মুখে, শরীরের ক'ফোঁটা বিষ ঝরে যেতে তারও শরীরে অবশভাব। আধো-ঘুম-আধো-জাগরণে তাদের লখীন্দরের জিব অস্ফুট কণ্ঠে আউড়ে যাচ্ছে, পদ্ম, পদ্ম রে আ, জেবন জুড়ায়—

চারচালা খোড়ো ঘরের দরজা তখন হা-হা খোলা, দখনে হাওয়া কপাট ঠেলে হু হু করে ঘরে ঢুকছে। বাইরে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ, কিন্তু না লখীন্দর না পদ্ম, কারো তাতে হুঁশ নেই। তেলচিটে বিছানায় একমুখ কালো পিঙ্গল রঙে মেশা দাড়িগোঁফ নিয়ে আরামে গোঙাচ্ছে লখীন্দর। এখন তার সমস্ত সত্তা, রক্ত মাংস ভরে রয়েছে পদ্মের দেওয়া আরাম। গাঁয়ের একধারে কালনাগিনী নদীর প্রান্তে তার ঘর। নদীর নামও কালনাগিনী, লখীন্দরের ঘর ভর্তিও নানা জাতের সাপ। সে সমস্ত সাপই তার পোষ্যপুত্তুর। শুধু এরমধ্যে এই পদ্ম, এই সোনার বর্ণপদ্মগোখরো, যার চোখের ভেতর লখীন্দরের জন্য এক অদ্ভুত চোরাটান, তার সঙ্গেই লখীন্দরের যতো-ভাব-ভালবাসা। ঘোরের মধ্যে সে পদ্মের পিচ্ছিল শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'পদ্ম পদ্ম রে, তুই আর জন্মে লিচ্চয় আমার বউ ছিলিস।'

বিষের কণাগুলো জিব থেকে আস্তে আস্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে নেমে আসে একটা লাল-নীল জাল, সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা। তার সুতো বেয়ে সে ক্রমশ ভাসতে থাকে, উড়তে থাকে, এক অন্তহীন সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় স্বর্গের দিকে। পা থেকে মাথা অবধি একটা হাল্‌কা-ভাব, বঁমচুলির

রন্ধ্রে রন্ধ্রে অদ্ভুত এক ধরনের সুখ তাকে বুঁদ করে রাখে। কখনো মনে হয় আকাশ থেকে একটা নীল রঙের পরী, যার গা-টা তুলোর মত নরম, লখীন্দরকে উম উম শব্দ করে চুমকুড়ি দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

এভাবে পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে লখীন্দর, আর তার শরীরে লেপ্টে থাকে পদ্মের পিচ্ছিল শরীর। লখীন্দরের স্যাঙাত ষষ্ঠীপদ একবার উঁকি মেরে দেখল, তার গুরু ঝিম মেরে পড়ে আছে, চোখ দুটো বোঁজা, উস্কখুস্ক চুল, লালা গড়াচ্ছে তার দুকষ বেয়ে। এসময় তাকে বিরক্ত করাটা লখীন্দর পছন্দ করে না। এর আগে ষষ্ঠীপদ ক'বার ডেকে ভীষণ দাবড়ানি খেয়েছিল তার গুরুর কাছে।

পদ্মের সঙ্গে তার এই ক'বছরের ভাব ভালোবাসা, তার বিয়ের এই ছোবল লখীন্দরের শরীর একেবারে বদলে দিয়েছে। টানটান চামড়ার রং কাল্‌চে মেরে গেছে, কুঁকড়ে গেছে আঙুলগুলোর চামড়া, হল্‌দেটে হয়ে গেছে চোখের রঙ। এসব বুঝতে পারে লখীন্দর, মাঝে মাঝে পদ্মকে বলে, 'শুধু চামড়ার রঙ নয় রে পদ্ম, তোর চুমু খেয়ে আমার রক্তের রঙটাই বদলে গেল রে।' একদিন ষষ্ঠীপদকেও হাসতে হাসতে তাই বলেছিল।

ষষ্ঠীপদ বিশ্বাস করেনি, লখীন্দর হঠাৎ তার দিকে তীব্রচোখে চেয়ে বলে, 'প্রেত্যয় হয় না? দেখবি তবে—'বলে একটা ধারালো অস্ত্র বিছানার তলা থেকে বার করে নিজের কব্জিতে একটা আঁচড় কাটে, অমনি কালো রক্তের ধারা বেরিয়ে আসতে থাকে তার শিরার ভেতর থেকে। ষষ্ঠীপদ দেখে থ হয়ে গিয়েছিল।

২

এই পদ্মের সঙ্গে লখীন্দরের ভাব-ভালবাসার আজ দু-আড়াই বছরের। ঝিম কেটে যেতে লখীন্দরের মনে পড়ে যায় পদ্মের সঙ্গে তার প্রথম দেখার কথা। কি বিশাল ফণা তার, সোনার বর্ণ রঙ, সারা গায়ে মাছের আঁশের মতো দাগ, মাথায় একটা খড়ম চিহ্ন। খোঁদল থেকে বেরিয়ে একলাফে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফণাটা তাক করেছিল লখীন্দরের কপাল বরাবর, চোখে জিবে গনগনে রাগ, দাঁতে আ-কামানো লকলকে বিষ। লখীন্দরের শরীরে বেদেনীর রক্ত। তার বাপ ছিল জেলে, কিভাবে যেন এক দলছুট বেদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, আর সেই বেদেনীর পাল্লায় পড়ে তার বাপ মাছ ধরার পেশা ছেড়ে সাপের গুণিন হলে খুব নামডাক হয়। সেই রক্ত লখীন্দরের শরীরে ছিল বলে মুহূর্তে গোখ্‌রোটার গলার কাছে চেপে ধরে বশ মানিয়ে ফেলেছিল। খেয়াল হতে দেখল এটা সাপ নয়, সাপিনী, তাই এত চোখের ছেনালি। পোষ মানতেই লখীন্দর তার নাম দেয় পদ্ম।

পদ্মর খবর প্রথম এনে দিয়েছিল ষষ্ঠীপদ, তার স্যাঙাত। বয়সে তার চেয়ে ঢের ছোট ষষ্ঠীপদ তাকে 'সাপের মাস্টার' নাম দিয়েছে। নামটা তার মন্দ লাগে না। প্রায়ই ষষ্ঠীপদ তার পায়ের কাছে বসে বলে, 'গুরু, সাপের নাড়ী নক্ষত্র তোমার মতো ভূ-ভারতে কেউ জানে না।' সেই ষষ্ঠীপদই একদিন ভোর-ভোর এসে বলেছিল, রামনবমীপুরের বোসবাড়ির ফাটলে নাকি সাপ দেখা গেছে। বোসবাড়ির বোসবাবুরা এখন আর গাঁয়ে থাকে না। ছেলেপুলেরা চাকরি-বাকরি নিয়ে কলকাতা চলে যাবার পর ওখানেই বাড়িঘরদোর করেছে। গাঁয়ের অত বড় বাড়িখান এখন পোড়োবাড়ি। তার দালানে বাস করে নটে ভিখিরি। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে। সাপটা নাকি তাদের বেছানার পাশে এসেছিল রাতের বেলা।

লখীন্দরের রক্তে তখন সাপ ধরে বেড়ানোর নেশা। জঙ্গলে গাছের ডাল থেকে, পুরোনো বাড়ির ফাটল থেকে টপাটপ সাপ ধরে আনে। এমনকি ধানক্ষেতের আলের উপর ঝিলিক ছড়িয়ে পালিয়ে যেতে থাকা আলকেউটেও ছুটে ধরে ফেলেছে সে। তার খোড়োঘরে ঝাঁপির পর ঝাঁপি সাপে ভরে উঠেছে। ষষ্ঠীপদর কাছে নতুন সাপের খবর পেয়ে তক্ষুনি বোসবাড়ির দিকে ছুটে গিয়েছিল।

প্রায় সাতদিন সাপটার সঙ্গে জড়িবুটি খেলায় গুম্ হয়েছিল লখীন্দর। তিনতলা পোড়োবাড়িটার কোন ফাটলে কিংবা চোরাকুলুঙ্গিতে সাপটা লুকিয়ে রয়েছে তা মগজে আনতেই বেশ ক'দিন ক'রাত কেটে গিয়েছিল। তারপর এক ঠা ঠা দুপুরে এক ফাটলের ফাঁকে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ তার লাল চেরা জিব লখীন্দরকে দেখিয়ে তার অস্তিত্ব জানান দেয়। তারপর থেকে সেই জড়িবুড়ি খেলা, কখনো তার ফণাটা এক নজর চোখে সেঁধোয়, কখনো তার এক চিলতে লেজ। আবার মুহূর্তে সে ফাটা ফাটলের ফাঁকে ফেরার। একঘর থেকে অন্য ঘরে, দোতলা থেকে তিনতলার চিলে কোঠার ঘরে। তক্কে তক্কে লখীন্দরও তার পিছু পিছু গন্ধ শুঁকেই সে বুঝেছিল এটা পদ্মগোখরো না হয়ে যায় না। তারপর সোনালী রঙের ঝিলিক দেখে তার ধারণা মিলে যায়। সাতদিনের দিন এক খোঁদলে পুরো হাতখান ঢুকিয়ে গোখরোটাকে বার করে নিয়ে আসে লখীন্দর। জড়িবুটি খেলে পোষ মানিয়ে ওকে ঘাড়ে ফেলে বলেছি, 'চ রে পদ্ম, ঘরে চ। এই পোড়োবাড়িটায় তরে আর মানায় না।

চারচালার খোড়ো ঘরটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঝাঁপি। কোনটায় কেউটে, কোনটায় শঙ্খচুড় কোনটায় খান কুড়ি-পঁচিশ আইরাজ। অন্য পাশের ঝাঁপিতে রয়েছে শাঁখামুটি, রক্তকানড়, কালাজ। বিশ-পঁচিশটা ঝাঁপির ভেতর ভিনজাতের সাপের বাস, আর এদের নিয়েই লখীন্দরের সংসার। তার এই ছোট্ট ঘরখানাকে ষষ্ঠীপদ নাম দিয়েছে সাপঘর। লখীন্দরের চেতনা, অনুভূতি জীবিকা সবকিছুকেই ঘিরে রয়েছে মা মনসার এই জীবগুলো। বলা যায় এদের সঙ্গে তার নাড়ীর

যোগ, এদের চাউনি, লকলকে জিবের ওঠাপড়া, ফণার দুলুনি দেখে সে বুঝতে পারে ওদের কথা। জীবগুলোও লখীন্দরকে ভালোবাসে, সোহাগ জানায়। আবার লখীন্দরের চোখে রাগ দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে যায়, ফণাসুদ্ধ একলাফে পিছিয়ে গিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে সভয়ে লক্ষ্য করে লখীন্দরকে। এক-একটা সাপের এক-একরকম কেতা, লখীন্দর সব বুঝতে পারে।

সাপঘরের এইসব জীবের দেখাশোনা করার ভার ষষ্ঠীপদর ওপর। লখীন্দরকে গুরু মেনেছে সে। তার ভারী ইচ্ছে, 'সাপের মাষ্টারে'র পা ধরে একদিন সেও মাষ্টার হবে। লখীন্দর যখন গোখরো কিংবা রক্তকানড় গলায় ঝুলিয়ে দুকোশ পথ ভেঙে নারাণগঞ্জের সনাতন মল্লিককে নেশা বেচতে যায়, তখন সঙ্গে থাকে ষষ্ঠীপদ। সাপের ছোবল জিবে দিয়ে বুদ হয়ে যায় সনাতন মল্লিক। এক ছিলিম গাঁজার মতো এক ছোবল বিষ। ষষ্ঠীপদ ভয়ে ভয়ে একবার সনাতন মল্লিককে দ্যাখে, একবার লখীন্দরকে, আরেকবার লখীন্দরের গলায় ঝোলানো গোখরোকে, ষষ্ঠীপদর চাউনি দেখে লখীন্দর কখনো বলে ওঠে, 'খাবি নাকি রে, এক ছিলিম।' বলে গোখরোটাকে এগিয়ে ধরতেই ষষ্ঠীপদ তিড়িক লাফ মারে, কিন্তু তার পিছু ছাড়ে না। আবার লখীন্দর যখন রাত বিরেতে ভিনগাঁয়ে সাপের বিষ ঝাড়াতে যায়, তখনও ষষ্ঠীপদ তার সঙ্গে থাকে। অবাক হয়ে দ্যাখে কিভাবে লখীন্দর বিষদাঁতের ক্ষতের উপর খোলামকুচি চেপে ধরে মন্ত্রের অমোঘ টানে বিষ নামিয়ে নিয়ে আসে। আবার শহুরে বাবুরা যখন কাঁচের টিউব এনে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়, তখনও ষষ্ঠীপদ তার পাশে। বস্তুত এসব ব্যাপারে ষষ্ঠীপদই সব যোগাযোগ করে। দেনাপাওনা দরদাম সব ষষ্ঠীপদর হাতে। মা মনসার জীবের খাবারও জোগাড় করার ভার তার ওপর তাদের বাস করার ঝাঁপির দরকার হলেও সে।

ষষ্ঠীপদ এ সবই করে বিদ্যে-শেখার লোভে। লখীন্দর 'সাপের মাষ্টার' একদিন তার সব বিদ্যে নিশ্চয় সে ষষ্ঠীপদকে দিয়ে যাবে। কখনো লখীন্দরের কাছে ভয়ে ভয়ে এ প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু লখীন্দরের সেই এক কথা, 'দূর বেটা, তুই সাপের লেজ ধরতে ভয় পাস, তুই সাপের মন্তর শিখবি কি রে। যা ভাগ।'

গাঁয়ের অন্যবাসিন্দাদের সঙ্গেও লখীন্দরের সম্পর্ক খুব কম। সে পড়ে থাকে গাঁয়ের একপ্রান্তে, নদীর ধারে, একা তার মা মনসার জীবদের সংসারে বুঁদ হয়ে। এক ষষ্ঠীপদ ছাড়া বাকি মানুষজন সাপঘরের নাম শুনলে তার সাত হাত দুর দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ধারণা লখীন্দরের ঘরের ত্রিসীমানায় কেউ পা মাড়ালে সে তার সাপদের লেলিয়ে দেবে। লখীন্দর এ সব কথা শুনে হাসে, দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে সে হাসির ঝিলিক বড় অদ্ভুত।

লখীন্দর ষষ্ঠীপদকে বলে, 'বুঝলি বেটা সবাই আমাকে ডরায়, আবার সাপে কাটলে আমাকেই আবার তারা তালাশ পাঠায়। এ ভারী মজার কথা।'

কখনো ষষ্ঠীপদকে বলে, সাপের মন্তর শিখবি, তার আগে সাপের চোখ ভাল করে নজর দিয়ে চেন। সাপের নজরই হল আসল। শাঁখামুটির চোখ আর বাঁশবনে কেউটের চোখ একরকম নয়, একটার চোখে খচরামি তো অন্যটার চোখে শয়তানি। আবার মেটে সাপের চোখ, তার মধ্যে কেমন সতর্কতা আর ভয়।

ষষ্ঠীপদ হাঁ করে শোনে, আর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

৩

লখীন্দরের বাপ ছিল সাপের গুণিন। কিন্তু সাপের নজর লখীন্দর ভালো করে ঠাহর করতে শেখে যেবার ভীমরাজ বেদের দল তাঁবু গেড়েছিল তাদের গাঁয়ের ধারে। ষষ্ঠীপদ এখন যেমন ছুঁকছুঁক করে তেমনি জড়িবুটি খেলার লোভে সেও ঘুর ঘুর করতো বুড়ো বেদে ভীমরাজের আশে পাশে। একদিন বুড়ো রেগে গিয়ে নিজের গলা থেকে একটা মস্ত কেউটে সাপ খুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল তার গায়ে। লখীন্দর সতর্ক হবার আগেই কেউটেটা ছোবল বসায় তার হাতে, মুহূর্তে চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে, মুখে গ্যাঁজলা। পরে জেনেছিল সেই ভীমরাজই তার কাটা ক্ষত থেকে এক চুমুকে বিষ তুলে নিয়েছিল। লখীন্দরের জ্ঞান ফিরলে তার পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল, 'যা বেটা, তোর হাতে খড়ি হল আজ।'

তারপর থেকে বুড়ো ভীমরাজ তাকে প্রায় সম্মোহিত করে রেখেছিল, একে একে চিনে নিল সাপেদের ঘরসংসার, তাদের চাউনি। ক্রমে তার নিজের চোখেও সাপেদের মতো তীক্ষ্ণ আর তীব্র হয়ে উঠল, যেরকম ছুরির মত দৃষ্টি সে দেখতে পেত বুড়ো ভীমরাজ আর তার ছেলে নগারির চোখে। নগারি তখন তার বয়সী এক যুবক। একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর তামার মতো গায়ের রঙে অজস্র পেশী তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে চেনায়। নগারি তার বাপের মতই সাপের দোস্ত এবং যম। অনায়াসে তাজা একটি গোখরোর ঠোঁট দুআঙুলে ফাঁক করে তার বিষদাঁত ভেঙে আনতো নিজের ঝকঝকে সাদা দাঁতের আঁকশি-তে। লখীন্দরের বউ গোলাপী একদিন এই কাণ্ডটা দেখে চোখ ছানাবড়া করে বলেছিল, 'হাই মা, ই কি দস্যি না দানব!"

লখীন্দর তার দোস্তের দিকে গৌরবের দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বউকে বলেছিল 'উটা একটা গরুড় বটেক।' গরুড় শব্দটা নগারির পক্ষে সবচেয়ে মানানসই ছিল। সাপের উপর তার একটা অহেতুক হিংস্রতা। যে সাপটা তার কথা শুনতো না, কিংবা হেরফের ঘটাতো তার আচরণে, ভীষণ রেগে যেত নগারি। তার ঝাঁকড়া চুল আরো ফুলে উঠতো রাগে, কিড়মিড় করতো দাঁত। কখনো এমন হয়েছে, এক আছাড়ে একটা গোখরোকে মেরে ফেলেছে। লখীন্দরের মুখে এমনটা শুনে গোলাপী বিস্ময়ে হা হয়ে বলতো, 'লোকটা কি গো, ই তো চণ্ডালের

রাগ।'

সেই নগারি যখন লখীন্দরের দোস্ত হল, লখীন্দরের সঙ্গে তার ঘরে আসত। গোলাপী প্রথমটা ভয়ে আঁতকে সরে থাকতো দূরে। বলা যায় না, লোকটার যা রাগ, কিন্তু তাকে যখন কাছ থেকে দেখল তখন নগারি অন্যরকম। তার দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর সাত কাহন গল্প বলত লখীন্দর আর গোলাপীর কাছে। কখনো সমুদ্রের পাড়ে, কখনো গভীর জঙ্গলে তাঁবু ফেলে তাদের বসবাসের কথা, ভয়ঙ্কর সব কাণ্ডকারখানার গল্প। তখন দুজনেই হা করে শুনত সে সব। তারপর একদিন যখন নগারি গোলাপীকে একটা হরেক ডিজাইনের পুঁতির মালা দিলো, তাতে ঝকঝক করছে লালনীল স্ফটিকখণ্ড তাই দেখে গোলাপী তো আনন্দে থ। মনে মনে ভাবল লোকটার বাইরেই অমন রাগ, ভিতরটা নরম।

লখীন্দর তখন বুড়ো বেদে ভীমরাজ আর নগারীর কাছে একের পর এক জড়িবুটি খেলা শিখছে, বশ মানাচ্ছে বিষে টইটম্বুর সাপগুলোকে, কোন সাপের মেজাজ কিরকম, কার দুর্বলতা শরীরের কোন জায়গায়, এসবই সারাক্ষণ তার মাথায়। রাতে ঘরে ফিরে গোলাপীকে তার বিদ্যের রকম বোঝাতো, জাহির করতো তার ক্ষমতা। সাপ সম্পর্কে গোলাপীর প্রাথমিক আড়ষ্ঠতা কেটে গেলে সেও হা করে শুনত লখীন্দরের বিদ্যের রকম।

যখন লখীন্দরের জড়িবুটি খেলা শেখা প্রায় শেষ, নতুনভাবে জীবন শুরু করার স্বপ্নে যখন সে মশগুল, ঠিক তখনই একদিন বাড়ি ফিরে দেখল তার ঘর ফর্সা। বুড়ো ভীমরাজ বেদে তার তাঁবু গুটিয়ে দলবল নিয়ে যখন দেশান্তরে রওনা দিয়েছে, তার সঙ্গে গোলাপীও কোন ফাঁকে ভিড়ে গেছে নগারির সঙ্গে। ব্যাপারটা লখীন্দর জেনে একেবারে নিথর। মা মনসার জীবকে সে ভালবাসতে শিখেছিল বটে, কিন্তু গোলাপীকে তো ভালোবাসা দিতে কিছু কম করেনি। ঘরে এসে সংবিৎ ফিরতে সে বিড়বিড় করে শুধু বলেছিল, 'যা রে গোলাপী, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা।'

এ-কথা ঠিক, গোলাপীর প্রায়-ফর্সা চাবুকের মতো শরীরটার মধ্যে সে অনেক সুখ পেয়েছিল। গোলাপী রঙঢঙ জানতো বেশ। আর বেদেদের সাপগুলো চেনার পর গোলাপীর শরীরটাও মনে হতো আরেকটা সাপ, অমনই পিচ্ছিল, অমনই সোন্দর। লখীন্দরের ঘরে গোলাপী যেন তার অস্তিত্বের অর্ধেক ছিল, সেই গোলাপী কখন যে তার রঙঢঙের ভাগ নগারিকে দিয়েছিল, তা লখীন্দর বোঝেনি। যখন বুঝল, তখন তার সারা ঘরে গোলাপীর স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। বেবাজিয়ার দল তখন তাবু গুটিয়ে কত দূরে চলে গেছে কে জানে।

গোলাপী গেল, কিন্তু সর্দার ভীমরাজের কাছ থেকে যে বিদ্যে লখীন্দর শিখে ফেলেছে, তাতে সে বিদ্যের এক জাহাজ। জড়িবুটি মন্তর পড়ে সমস্ত সাপকেই সে এখন বশ মানাতে পারে, সাপে-কাটা রুগি বাঁচাতে পারে, সাপের চাউনি

দেখে তার কথা বুঝতে পারে। তারপর আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে তার সাপঘর। ভেবেছিল, আরেকটা গোলাপী ঘরে নিয়ে আসে, কিন্তু বোসবাড়ির ফাটল থেকে হঠাৎ এই পদ্ম তার ঘরে এসে সব উলটপালট করে দিল।

এখন সেই পদ্মর আকর্ষণে সে প্রায় সম্মোহিত হয়ে থাকে সারাদিন। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণ পদ্মকে নিয়েই তার খেলা। কখনো পুরোটা দিন বিছানায় শুয়ে থাকে সে, আর পদ্মও তার শরীরে জড়িয়ে, সোহাগ দিয়ে, গায়ে লেপ্টে পড়ে থাকে। কখনো পদ্মের ঠোঁটে চুমু খায়, পদ্মও তার চেরা জিব মেলে চেটে দেয় লখীন্দরের গাল। দেখলে মনে হয়ও তার বে করা বউ। পদ্মের পিচ্ছিল শরীরের স্পর্শে তার শরীর জেগে ওঠে, এক অদ্ভুত সুখ তাকে অবশ করে দেয়। শুধু চুমুই দেয় না, এক ভীষণ বর্ষার রাতে পদ্মর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে এক অদ্ভুত বিজাতীয় প্রতিক্রিয়ায় রত হয়েছিল।

ব্যাপারটা ক্রমশ তাকে নেশায় আচ্ছন্ন করে। এই অদ্ভুত রতিক্রিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকে মাঝে মাঝে অমন নধর হিলহিলে সাপটার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানো তার কাছে মধুর হয়ে ওঠে। গোলাপীকে হারিয়ে তার ভিতরে যে ক্রোধ, হতাশা আর ক্ষোভ ছিল পদ্ম ঘরে এসে তা অনেকটা মিটিয়ে দেয়। বরং তার মনে হয়, পদ্ম তাকে যে আনন্দ দেয়, তা গোলাপী কখনো দিতে পারেনি। পদ্মকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়াতে জড়াতে ভাবে, 'যা রে গোলাপী, তুই বেবাজিয়া হয়ে যা, আমার পদ্ম তর চেয়ে ঢের ভালো, এ তর মতো বেইমানি করবে না।

ক্রমে পদ্মর উপর তার ভাব-ভালোবাসা এমন ওম হয়ে ওঠে যে তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া করে না লখীন্দর। যেখানেই যায়, পদ্ম তার সঙ্গে আছে। তা এই নিয়ে একদিন একটা বিটকেল কাণ্ড ঘটে গেল। গোপালনগরের ভবগোঁসাই লখীন্দরের এক বাঁধা খদ্দের। হপ্তায় একবার জিবে সাপের ছোবল নেয়। শুধু নেশাই করে না, সে একজন রসিক মানুষ। কোন্ সাপের সোয়াদ কেমন তা নিয়ে লখীন্দরের সঙ্গে মশকরা করে, তোর ওই বাঁশবুনে কেউটে সেদিন আমার ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছিল, বুঝলি লখীন্দর। শালা মহা বজ্জাত আছে। তা, এই ভবগোঁসাই হঠাৎ লখীন্দরের কাঁধে সুন্দরী পদ্মকে দেখে হাসতে হাসতে বলে, 'পদ্মর চুমু কি তুই একলাই খাবি, লখীন্দর? একদিন আমাকেও দে না ওকে। না হয় একটু বেশিই দাম দেব।' বলে তার নীলচে জিব বার করে দেয়।

ইঙ্গিত বুঝে লখীন্দর ভীষণ রেগে গিয়েছিল। তখন তার চোখ দুটো লাল, মুখটা চকিতে হিংস্র হয়ে ওঠে, হয়তো ভবগোঁসাইকে একটা ভীষণ আঘাত করে ফেলতো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'তোমার বে-করা বউটাকে কি একদিন আমার সঙ্গে শুতে দেবে, ভবগোঁসাই?'

মুখের ওপর এমন একটা জবাব দিতে পেরে বেশ খুশি হয়েছিল লখীন্দর।

পদ্মকে তার শরীরের সঙ্গে আরো আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এসেছিল। টাকার গরম দেখাতে এসেছে ভবগোঁসাই, পদ্ম যে তার কতখানি, সেটা তো হারামখোরটা জানে না।

৪

শহর থেকে একদল বাবু হপ্তায় একবার এসে লখীন্দরের সাপঘর থেকে বিষ কিনে নিয়ে যায়। লখীন্দর জানে, এসব বিষে ওষুধ তৈরি হয়। বাবুরাও লখীন্দরকে বেশ খাতির করে। এতরকম সাপের বিষ নাকি আর কোথাও তারা পায় না, আর এখানে মেহনতও সবচে কম, দামেও সস্তা।

তা এসব থেকে টাকা-পয়সার যা আমদানি হয়, তার হিসেব রাখে ষষ্ঠীপদ। সাপের খাবার যেমন সে যোগাড় করে, তেমনি লখীন্দরের খাবারের দায়িত্বও তার উপর। এটুকু হলেও লখীন্দর খুশি, বাকি পয়সা ষষ্ঠীপদ কি করে, তা সে খোঁজ রাখে না। মাঝে মাঝে ষষ্ঠীপদ অবশ্য বলে, যা টাকা-পয়সা জমেছে, তা দিয়ে একটা পাকাবাড়ি বানাবো, তার ভেতর সাপঘর হবে। সাপ রাখার জন্যে বড় বড় কাচের বয়েম কিনে আনবো। দেখবার জন্যে সারা শহরের লোক ভেঙে পড়বে।

লখীন্দর অবাক হয়। পাকাবাড়ির ভেতর সাপঘর। বলে, 'তোর মাথাখান খুব পোক্কার ষষ্ঠীপদ।

একদিন ঝাঁঝা করছে দুপুর। কালীনারায়ণপুরের এক জোতদারের বাড়ি থেকে ফিরছে লখীন্দর, কাঁধে তাজা রক্তকানড়। একটু আগে জোতদার শ্রীধর সামন্তের জিবে বিষ ঢেলে দিয়ে এসেছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় পদ্মকে একটা ঝাঁপির মধ্যে রেখে সে বলে এসেছে, 'একটু জিরেন নে, দুফারবেলা আসবো।' ভরগোঁসাই পদ্মর উপর লোভ দেখানোর পর থেকে সে আর ওকে নিয়ে কারো বাড়ি যায় না। পদ্ম তার একার। তা ছাড়া অন্য সাপ থাকলে পদ্ম কেবলই গরগর করে। ফোঁসফোঁস শব্দে তার রাগ জানাতে থাকে।

ফিরতে ফিরতে লখীন্দর ভাবছিল, বেচারা জোতদারের এই নেশা তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে ফেলেছে। সর্বক্ষণ রাজনেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে জমিজমা দেখবার সময় কোথায়। সামন্তবাড়ির লোকজন লখীন্দরের ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। তার গলায় এমন এক-একখানা রক্তকামড় কিম্বা পদ্মগোখরো ঝোলানো থাকে যে ভয়ে আর রা কাড়ে না। ইদানীং অবশ্য ওঁর এক ছেলে সাবালক হয়ে জমিজমা দেখাশুনা করছে, তাতে একটু হাল ফিরেছে।

ফেরার পথে হঠাৎ ষষ্ঠীপদ বলল, 'গুরু, রূপনগরের পুজোর দালানে একটা পদ্মগোখরো দেখা গেছে।'

লখীন্দর ক্লান্ত ছিল, কিন্তু পদ্মগোখরোর নাম শুনে চমক জাগে। এক পদ্ম ছাড়া তার কাছে আর যে দু-একটা পদ্মগোখরো আছে, তারা হয় বুড়ো না হয় নির্জীব। আবার একটা চনমনে পদ্মগোখরো ঘরে নিয়ে এলে হয়। পরক্ষণেই ভাবে নতুন একটা পদ্মগোখরো এলে পদ্মর আবার গোঁসা হবে না তো!

কিন্তু ষষ্ঠীপদ বলে, 'না হয় ওটা আমিই পুষবো খনে। কদিন তোমার কাছে রেখে বিষ দাঁত ভেঙে একটু মানুষ পানা করে দাও।' একটু ভেবে হঠাৎ পেঁচানো রক্তকানড়টাকে ষষ্ঠীপদর দিকে ছুঁড়ে বলে, 'তাহলে এটাকে ধর। দুচারটা সাপ ধরে কাটাই আজ। অনেকদিন জড়িবুটি খেলা হয় না। আমি জঙ্গল থেকে একটা শিকড় খুঁজে নে আসি।'

ষষ্ঠীপদ ভয়ে ভয়ে রক্তকানড়াটাকে লুফে ধরে, সাবধানে গলায় পেঁচায়, একটা হাতে ধরে রাখে সাপটার গলা। কি চমৎকার দেখতে রক্তকানড়টা, পেটের কাছ থেকে দুদিকে মাথা পর্যন্ত লাল টকটকে দাগ, যেন দুপায়ে আলতা পরানো। লাল জিবটা ফালুক ফুলুক করে বাইরে এনে আবার চকিতে ভিতরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। হিলহিলে শরীরটা ষষ্ঠীপদর গায়ে গলায় শিরশির করে নড়তে থাকে। গুরুর আদলে সেও রক্ত কানড়টার গায়ে একটা চুমু খেয়ে নেয়।

কোত্থেকে একটা শিকড় জোগাড় করে আনে লখীন্দর। রূপনগরের পুজোর দালানে দুজনে পৌঁছোয়, নাকের রোঁয়া বাড়িয়ে বড় করে ঘ্রাণ নেয় লখীন্দর, হ্যাঁ একটা গন্ধ বেরুচ্ছে বটে। তারপর সে কয়েকটা ফাটলের কাছে পরপর টোকা মারে, আবার নাকে ঘ্রাণ নেয়, শিকড় বোলায়, বিড়বিড় করে কি সব বকে তারপর মাথা নাড়ে। সাপটা তার সঙ্গে জড়িবুটি খেলছে। দালানের সব দেয়ালেই ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। কোথাও বেশি, কোথাও কম, তার মানে জীবটা চট করে ধরা দেবে না। যতো সময় যায়, তার মন্তর খরচ হয়, শিকড়ের গন্ধ উবে যায়, কিন্তু গোখরোটা কাবু হয় না। এদিকে খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। ষষ্ঠীপদ বলে, চলো গুরু, আজ আর হবে না, কাল আবার আসবো।

কিন্তু লখীন্দরের তখন রোখ চেপে গেছে, পদ্মও তার সঙ্গে এরকম লুকোচুরি খেলেছিল, এই মা মনসার জীবটাও ঠিক একই রকম খেলা খেলছে। লখীন্দরের চোখ দুটো ভাঁটার মতো ঘুরতে থাকে। সেই ভোরবেলা কালীনারায়ণপুরে গিয়েছিল, তারপর থেকে এই টানা পোড়েন। গায়ে মুখে টলটল করছে ঘাম, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, লালচে হয়ে উঠছে দুটো চোখ। একটা প্রচণ্ড নেশা তাকে দালানের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ঝাড়া চার ঘণ্টা লড়াই চালানোর পর একটা খোঁদলের ভেতর থেকে পদ্মগোখরোটার টুটি টিপে ধরে টেনে বার করল সে। দড়াম করে শানের মেঝেতে ফেলতেই বিশাল ফণা তুলে দাঁড়াল ওটা, একেবারে তাজা, চকচকে, সোনালী

রঙ। লখীন্দর লক্ষ্য করল, ওটা সাপিনী নয়, সাপ। বোধ হয় মরদ বলে তার ফোঁসফোঁসানিও ভয়ঙ্কর। কিন্তু লখীন্দরের গায়ে বেদেনীর রক্ত আছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সাপটা তার কাঁধে জড়িয়ে লেপটে থাকে গায়ের সঙ্গে। ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবল, পদ্ম কি একে দেখলে হিংসেয় জ্বলবে। পদ্মকে কাঁধে-গলায় জড়িয়ে যখন সে তার শঙ্খচূড়, রক্তকানড় কিংবা বাঁশবুনে কেউটেটাকে ঝাঁপি থেকে বার করে ঘরের মেঝেয় রাখে, ওদের নিয়ে খেলা করে, কিংবা ওরা তার মালিককে একটু সোহাগ জানায়, অমনি পদ্ম ফোঁস-ফোঁস করে রাগ জানাতে থাকে, লখীন্দরের গলায় আরো শক্ত করে ফাঁস জড়ায়। একদিন তো একটা শামুকভাঙা কেউটের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। যেতে যেতে ষষ্ঠীপদকে বলল, 'বুঝলি ষষ্ঠীপদ, এটাকে দেখলে আমার পদ্ম খুব গোঁসা করবে।'

ষষ্ঠীপদ এসব বোঝে না, বলল, 'ওটার বিষদাঁত দেখেছো, গুরু, বিষে টঙ হয়ে রয়েছে, শহরে খবর দেবে নাকি!'

লখীন্দর হাসে, 'তোর শুধু টাকা আমদানীর ফিকির। বরং এর বিষটা জিবে নিতে কেমন লাগে, তা দ্যাখ দিকি।' বলে সাপটা তার গলা থেকে খোলার ভঙ্গি করে অমনি ষষ্ঠীপদ চিৎকার করে ওঠে, 'দোহাই গুরু, এক্কেবারে মরে যাবো। আগে তোমার বিদ্যেটা শিখিয়ে দাও, তখন তোমার মতো অমন পদ্মগোখরো নিয়ে আমিও বিছানায় শোবো।'

লখীন্দর মস্করা করে, 'গোখরো নিয়ে বিছানায় শুবি, তো তোর বউ কোথায় শোবে?'

মস্করায় যোগ দেয় ষষ্ঠীপদ, 'বউও শোবে, গোখরোও শোবে, দুজন দু'পাশে।'

হেসে ওঠে লখীন্দর, গলায় ঝোলানো সাপটার লেজ আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে, 'দূর বোকা, ওরা যে সতীন, একসঙ্গে ঘর করে না। সাপঘরের কাছে আসতে ষষ্ঠীপদ এবার রক্ত কানড়টাকে লখীন্দরের কাছে দিয়ে দিল, 'এবার চলি গুরু। কাল একটা নতুন ঝাঁপি কিনে এনে দেব।' বলে সে ঘরমুখো হাঁটা দেয়। লখীন্দর এবার তার শিকল খুলে ঘরে ঢোকে। রক্তকানড়টাকে ছেড়ে দিতে সে ঠিক তার ঝাঁপির ডালা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। এদিকে নতুন পদ্মগোখরোটাকে দেখে পদ্মর অদ্ভুত ব্যবহার। অন্যদিন সে ঘরে ঢুকলেই পদ্ম তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠোঁটে, গালে, কপালে জিব বুলিয়ে ভালোবাসা দেয়। আজ যেন সে লখীন্দরের গায়ে অন্য এক গন্ধ পেয়েছে, আর সেই গন্ধ নাকে যেতে তার কি ঝাঁপা-ঝাঁপি, ফোঁসফোঁসানি। দু-তিনবার ছোবল মারলো লখীন্দরের বুকে, কপালে। লখীন্দর আজ তাকে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে গেল। হেসে বলল, 'বাপরে, মেয়ের কি তেজ!' অন্য পদ্মগোখরো দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে। লখীন্দর অবাক হলো, বুঝতে পারলো না দুজনের চোখের চাউনির ভাষা, একটু পরে দুজনেই ফণা নামিয়ে দুপাশে সরে গেল।

কদিনের মধ্যেই বোঝা গেল নতুন পদ্মগোখরোটার রেশ তেজ আছে। তা সত্ত্বেও লখীন্দরের বেশ ন্যাওটা হয়ে পড়ল। ষষ্ঠীপদ একদিন শহুরে বাবুদের ধরে এনে বেশ খানিকটা বিষ বেচে দিল তার। নতুন গোখরোটা লখীন্দরকে বেশ পছন্দ করছে দেখে কিন্তু পদ্ম তাকে মোটেই হিংসে করলো না, বরং সেও নতুন সাপটাকে বেশ পছন্দ করতে লাগলো। আশ্চর্য, পদ্ম কি হঠাৎ ভালো মেয়ে হয়ে গেল?

৫

ষষ্ঠীপদ একদিন একটা মজার খবর দিল। লখীন্দরের কাছে খবরটা বেশ মজার বইকি। শহরের এক বাবু নাকি সাপ পোষে। মস্ত বড় দালানবাড়ি, কিন্তু সারা ঘরের দেয়ালে সাপের ছবি সাপের ওপর মস্ত মস্ত বই, বাবু সারাদিন সাপ নিয়ে পড়াশোনা করে। তার ঘরে অনেকগুলো কাচের বয়ামে সাপ রাখা আছে, নানান ধরনের কাচের বয়ামগুলোকে নাকি অ্যাকোরিয়াম বলে। সেই বাবু নাকি একটা গোখরো সাপ কিনতে চায়। তার জন্যে মোটা টাকা দেবে।

লখীন্দর সাপ ধরে বটে, কিন্তু সাপ বেচে না কখনো। হয় তার ঝাঁপির মধ্যে রাখে, নচেৎ পছন্দ না হলে মাঠেঘাটে ছেড়ে দেয়—যা মা মনসার জীব, চরে খা।

ষষ্ঠীপদ ষড় বড় চোখ করে বলে, একদিন দেখবে চলো গুরু, কি সোন্দর দেখতে কাচের বয়ামগুলান। অমনি কটা বয়াম তোমার জন্যেও কিনে দেবো। তোমার তো অনেক সাপ, কটা বেচে দাও। কাচের বয়াম কিনে ঘরে সাজাই।

তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ে লখীন্দর, উহু, সাপের গুণিন আমি, সাপ বেচতে নেই। মা মনসার গোঁসা হবে।

শহরের বাবু সাপ নিয়ে লেখাপড়া করে শুনে অবাক হয়ে যায় লখীন্দর, সাপ নিয়ে আবার লেখাপড়া করা যায় নাকি। আশ্চর্য তো! সে তো সাপ নিয়ে তার জীবন কাবার করতে চলল, তা নিয়ে আবার বই হয় তা তো সে জানতো না। মানুষ যে কতরকম ধ্যানাচি জানে।

লখীন্দরের কথা শুনে ষষ্ঠীপদ মুষড়ে পড়ে, তুমি তো ইচ্ছে করলেই অনেক সাপ ধরতে পারো গুরু, কটা, সাপ বেচলে কিছু যাবে আসবে না।

কিন্তু লখীন্দরের সেই এক রা, সাপ বেচবো না। ষষ্ঠীপদ ফাঁপরে পড়ে। বোঝে না তার গুরু অত বেশি করে তার পোষ্যপুত্তুরদের ভালোবাসে কেন।

দু-একদিনের মধ্যে লখীন্দরের মনে হল, পদ্ম আর তাকে আগের মতো সোহাগ দিচ্ছে না, বিছানায় তার সঙ্গে জড়াজড়ি করে না, কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। মাঝরাতে সে পদ্মকে সোহাগ দেয়, তার ঠোঁট নিজের ঠোঁটের মধ্যে

নেয়, কিন্তু পদ্ম আর চুমো দেয় না তাকে, গায়ে জড়ায় না, বুকের উপর ফণা তুলে নাচ দেখায় না। হল কি পদ্মর? লখীন্দরের অভিমান হয়, রাগ হয় পদ্মকে হঠাৎ টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেঝেতে যা ভাগ, ছুড়ি, তুই মেঝেয় শুয়ে থাক, তর বেছানা মানায় না।

কদিন এরকম মান-অভিমানের পালা চলল, গুটি-গুটি সাপটা তার বিছানায় উঠে এলো। লখীন্দর আর তাকে কাছে নেয় না, কাঁধে-গলায় জড়ায় না। চুপচাপ তার বিছানায় পড়ে থাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে। ষষ্ঠীপদ একদিন ডাকতে এসে প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে চলে গেল। বুঝতে পারল না। গুরুর মেজাজ এত তিরিক্ষি কেন?

একদিন মাঝরাতে ফোঁস-ফোঁস শব্দ শুনে লখীন্দরের ঘুম ভেঙে যায়। নিশুতি রাত সমস্ত ঘরে ডাঁই হয়ে জমে আছে। চালের একটা খড়ও চোখে নজর কাড়ে না। ফোঁসফোঁসানি শব্দটা আসছে ঘরের কোণ থেকে। কি মনে হতে উঠে বসলো লখীন্দর। ষষ্ঠীপদ শহর থেকে তাকে একটা লাইটার কিনে এনে দিয়েছিল, তার ছোট্ট চাকাটা ঘোরাতেই ফস্-করে আলো জ্বলে ওঠে। খাট থেকে নেমে অন্ধকার হাতড়ে ঘরের কোণের দিকে যায় সে। মনে হল কি একটা গন্ধ বেরুচ্ছে ঘরে, গন্ধটা তার খুব চেনা। ফস্ করে লাইটার জ্বালাতেই দেখল, ঠিক যা ঠাহর করেছিল তাই। পদ্ম তার বিছানা থেকে নেমে নতুন সাপটার চারপাশে ঘুরঘুর করছে, যার মধ্যে সদ্য ধরে আনা পদ্মগোখরোটা রাখা আছে।

মাথাটা গরম হয়ে গেল লখীন্দরের। বুকের মধ্যে একটা বিষ-পিঁপড়ে কুটুস করে কামড় দিল। গত ক-বছরের মধ্যে যা ঘটেনি, হঠাৎ পদ্মর এমনধারা হয়ে যাওয়াতে তার চোখের সামনে একটা বিদ্যুৎ ঝিকমিক করে খেলে যায়, কি রে পদ্ম, তোর খুব গুমর হয়েছে, তাই না? আমার বেছানায় তর আর ভালো লাগে না!

লাইটার জ্বালাতেই পদ্ম হতচকিত হয়ে ফণা তুলে দাঁড়ালো, তারপর লখীন্দরের পায়ে জড়িয়ে সোহাগ জানাতে শুরু করে, যেন পদ্ম খুঁজে পাচ্ছিল না লখীন্দরকে, এখন দেখতে পেয়ে পা থেকে জড়িয়ে জড়িয়ে গায়ে ওঠে, গালে জিব বুলিয়ে দেয়। লখীন্দরের রাগ তৎক্ষণাৎ নেমে যায়, গলে জল হয়ে যায় তার অভিমান। পদ্মকে বিছানায় নিয়ে চলে আসে, পদ্মর পিচ্ছিল শরীরে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়—পদ্ম রে, দেখ, তরে কতো ভালোবাসি, আমি, তর জন্যে আরেকটা বউ আনি নাই। নইলে গোলাপী আমারে অমন একটা দাগা দিল।

পদ্ম ওর বুকের ওপর ফণা তুলে দাঁড়ায়, মাঝে-মাঝে লতিয়ে নেমে চুমু খায় ওর গলায়, গালে। অদ্ভুত সুখ পায় লখীন্দর। ঘোরা রাত আরো ঘনঘোর হয়ে আসে। বাইরে ঝিঁরি ঝিঁরি ডাকে শিশির পড়ার মতো টুপটাপ শব্দ হয়।

ভোরে উঠে পদ্মকে বলল, "তুই তোর ঝাঁপির মধ্যে আজ সারাদিন থাকবি। আমি শহরে যাচ্ছি।' বলে পদ্মকে তার ঝাঁপির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। প্রথমে মুখ,

তারপর সরসর করে তার সমস্ত শরীর, তারপর লেজ, আস্তে আস্তে পদ্মর শরীর ঝাঁপির মধ্যে চলে যায়। শহরে বেরুবার আগে নতুন পদ্মগোখরোটার ঝাঁপির উপর দুটো থান ইট চাপা দেয়। লখীন্দর ভাবে, পদ্মটার হঠাৎ কি নোলা বদ্‌লেছে। নতুন পদ্মগোখরোটা মদ্দা সাপ, সাপেদের মধ্যে মরদ। এমন একটা মদ্দার গন্ধ পেয়ে পদ্ম কি তার জাতপুরুষকে খুঁজে পেলো। আর লখীন্দর যে এতকাল ওকে তার সোহাগ আর ভালোবাসা দিয়ে আসছে, সেটা কি পদ্মর মনে নেই? হঠাৎ লখীন্দর ভাবল, এসব কি এলোমেলো ভাবছে, হয়তো নেহাৎ খেয়ালবশে পদ্ম তাদের নতুন অতিথির তালাশ নিয়ে গিয়েছিল।

আসল তার মনের এই যে বিষ পিঁপড়েটা, তা ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে গোলাপী। নইলে আগে সে এমনধারা ছিল না। গোলাপী তো তার সামনেই নগারির সঙ্গে কতো রসের কথা বলেছে, সে তো কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি গোলাপীর মনে অন্যরকম ছিল। নতুন পদ্মগোখরোটা লখীন্দর বেচে দেবে, এই খবর শুনে ষষ্ঠীপদ লাফিয়ে উঠল। চলো গুরু, শহরে যাই, বাবুটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

সাপ নিয়ে লেখাপড়া করা বাবুটার সঙ্গে লখীন্দরেরও কথা বলার খুব ইচ্ছে। সে সাপের গুণিন, প্রতিটা সাপের নিশ্বাস সে চেনে, তার চে' বেশি আর কে জানে।

সেই কথাই বলল শহুরে বাবু। লোকটার এককাঁড়ি বয়স না, মুখে ছেলেমানুষ ভাব। ঘরের চারপাশে অ্যাকোয়ারিয়াম, তার মধ্যে বেশ কটা সাপ, একটা কেউটে, একটা লাউডোগা, একটা চিতে। ঢোঁড়া আর মেটে সাপও রেখেছে কটা। দেখে লখীন্দরের হাসি পায়। নির্বিষ সাপ কেউ বয়ামে রাখে। মাঠে ছেড়ে দাও, চরে খাক্। দেয়ালে কতোরকমের সাপের ছবি, আলমারিতে কতো বই। টেবিলে দু-খানা বই-এর মলাটেও সাপের ছবি আঁকা।

শহুরে বাবুটা তাকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করল, কত সব খবর জানতে চায়। লখীন্দরের জীবন ভর জানার জগৎ সে ছিঁড়ে-খুঁড়ে বার করে আনছে, সাপের নাড়িভুড়ির খবর। বাবুটা তার সঙ্গে যত কথা বলছে, ততই উত্তেজনায়, উৎসাহে লাফিয়ে উঠছে। লখীন্দর নাকি একটা হীরের খনি, তাকে খুঁজলে জগৎ সংসার নাকি চমকে যাবে।

পদ্মগোখরোটার দাম ঠিক হল মোটা টাকার। লখীন্দর যদি তাকে আরো সাপ ধরে দেয়, তবে ভালো দাম দিতে সে দ্বিধা করবে না। লোকটা আরো বলল, একদিন সে লখীন্দরের সাপঘর দেখতে যাবে।

শহুরে বাবুকে লখীন্দরেরও বেশ ভালো লেগে যায়, ষষ্ঠীপদকে বলে, ওই পদ্মগোখরোটার সঙ্গে আরো কিছু সাপ দিয়ে আয় ষষ্ঠীপদ। আরামে থাকবে, খাবে। বাবু মস্ত বড়লোক, আর বেশ সমঝদার।

ডেরায় ফিরতে ফিরতে বেলা দুপুর। ষষ্ঠীপদ ফেরার পথে হোটেলে খাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু লখীন্দর রাজী হয়নি। হয়তো পদ্মও এতক্ষণে মুখে কুটোটি কাটেনি। অনেকক্ষণ ধরে যে বিষ পিঁপড়েটা কামড় দিচ্ছিল, এখন তার ধার একটু ভোঁতা। নতুন পদ্মগোখরোটা বিদেয় হবে ভেবে স্বস্তি পায়। মনে মনে বলে, তর কোন দোষ নাই রে, পদ্ম। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। গোলাপটা বাজারে মেয়ে ছিল। বেবাজিঁয়া হয়ে গেছে, বেশ করেছে।

একরাশ ঘাম, ক্লান্তি আর ভাবনা মাথায় নিয়ে দরজা খুলল লখীন্দর। ঘরে ঢুকেই যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল, তাতে তার হৃৎপিণ্ডটা থেমে গেল। শরীরের কোথাও উপছে পড়ল একঝলক রক্ত, অথবা রক্তের ভিতরে একটা ঘূর্ণী টাল খেয়ে গেল। ঘোরলাগা চোখে দেখল, মেঝের উপর একজোড়া সাপ। প্রায় লেজের উপর ভর করে শঙ্খ লেগেছে। দুটো সোনালী সুতোর রেখা, নড়েচড়ে ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের রঙ ছড়াচ্ছে। অমন সোনারঙ দুটো সাপের শঙ্খ দেখে লখীন্দর অন্য সময় হলে মুগ্ধ হত, পরিবর্তে তার শরীরে চাবুক মারতে লাগল কেউ। তুই পদ্ম, তুই এমনধারা,—

পদ্মও লখীন্দরকে দেখে এক মুহূর্ত চমকে গিয়েছিল। তার চোখ আর জিব মেলে একবার তাকাল লখীন্দরের দিকে, কিন্তু তখন তার শরীর ভর্তি ভালোবাসা আর কাম। নতুন পদ্মগোখরোটাও তাকে ছাড়বে কেন! এক লহমা থেমে আবার শরীরে টঙ্কার তুলল তারা, লেজের উপর ভর করে সরে সরে যেতে লাগল লখীন্দরের কাছ থেকে। সেই মুহূর্তে লখীন্দর তার বিছানার তলা থেকে বার করল একটা হাঁসুয়া। চোখের পলক না ফেলতে ঝলকে উঠল চকচকে ফলাটি, আর মেঝেয় আছড়ে পড়ল দুটো সাপের কাটা মুণ্ডু। লাল টকটকে চোখে সেদিকে তাকিয়ে হিংস্রভাবে লখীন্দর বলে ওঠে, তা'লে তুইও গোলাপীর মতো।

পরকীয়া

অঞ্জলি চক্রবর্তী

আসলে সেটা ছিল একটা গল্প। গল্প নয়তো কি? এও কি কখনো সম্ভব? চেনা নেই জানা নেই হুস করে একটা লোক আপন হয়ে গেল—একি সিনেমা না কি? নায়কের সঙ্গে চলতি পথে নায়িকার ধাক্কা লেগে গেল, তারপরই শুরু হলো বাইকে চেপে প্রেম, তাও আবার বিবাহিতা একটা মেয়ে, যার স্বামী সংসার ছেলে মেয়ে সবই বর্তমান। না, না, সুস্মি এটাকে কিছুতেই সত্যি বলে মানতে পারছে না। আবার ঘটনাটা গল্প বলে উড়িয়ে দিতেও পারছে না। কোন্ এক অলৌকিক ঘটনায় একটা মানুষ কত কাছে এসে গেল, তাকে সে ভুলবে কি করে? আর সেই রাতটাকেই বা অস্বীকার করবে কোন্ মনের জোরে?

সুস্মির জীবনটা বরাবরই একটা অগোছালো প্ল্যাটফর্মের মতন। সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ে যখন দৈব বা আপ্তবাক্য মেনে স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে, সে-সময় ও ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। আসলে সুখ জিনিসটা কি সেটাই ও আজও বুঝে উঠতে পারলো না। মহাভারতে যুধিষ্ঠির অবশ্য বলেছেন অঋণী আর অপ্রবাসীরাই সুখী। অর্থাৎ যে নিজের দেশে বাড়ি বানায় আর সোপার্জনে জীবন-যাপন করে সেই সুখী। এই যদি সুখের সংজ্ঞা হয়, তবে তো অরুণাভকে নিয়ে ওর যথেষ্ট সুখী হবারই কথা। অরুণাভ, মানে সুস্মির স্বামী, একটা বড়ো কোম্পানির একজিকিউটিভ অফিসার, সকাল দশটা থেকে পাঁচটা তার সামনে বসে থাকে পি.এ. মিস্ সায়নী মিত্র। শুধু অফিসে নয় দরকার হলে অফিসের বাইরেও শপিং-এ সাহায্য করে। এহেন অরুণাভ একদিন কথায় কথায় সুস্মিকে বলেছিলো।

—তুমি তো মনটা করে রাখলে সোনায় মোড়া হীরের মতন, অনামিকা থেকে কেবলই দ্যুতি ছড়াচ্ছে। কিন্তু কারো দ্যুতি গ্রহণ করতে শেখনি। নিজেকে বিলোতে গেলে অন্যকেও গ্রহণ করতে হবে। না হলে লাইফ এন্‌জয় করতেই পারবে না।

এই লাইফ এন্‌জয়ের ব্যাপারটা সুস্মির মাথায় একেবারেই আসে না। সুস্মি অরুণাভের কথাটা মাঝে মাঝে ভাবে। হয়তো তার নিঃসঙ্গতার এটাও একটা

কারণ। তার জীবনটা বড়ো একপেশে, দেওয়ালে আঁটা ক্যালেণ্ডারের মতন। ইউনিভারসিটির বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অসীমকেই ওর একটু ভালো লাগতো; অসীমের মধ্যে কেমন যেন একটা কবি কবি ভাব ছিলো, বোধহয় বাংলায় এম.এ. করে ওটা ওর সহজাত হয়ে গিয়েছিলো। এককালে সুস্মিকে ওর কিছুটা পছন্দও ছিলো। আজও হয়তো তার কিছু রেশ রয়ে গেছে, সেটা বোঝা যায় তার যাওয়া-আসার অকারণ আধিক্য দেখলে। তবে সুস্মি ওকে তেমন একটা পছন্দ না করলেও একেবারে অপছন্দ করে না। কারণ অসীমের সমসাময়িক সাহিত্যচর্চা ও জীবনচর্চা নিয়ে সরস আলোচনা ওর ভালোই লাগে। আশপাশের যে সব প্যান-প্যান ঘরোয়া আলোচনা তার চেয়ে এগুলো অনেক ভালো বলেই মনে হয়। শুধু আলোচনা নয়, মাঝে মাঝে অসীম সুযোগ মতো সুস্মিকে উপদেশও দিয়ে বসে। সুস্মির মধ্যে জীবনের ঘাটতি দেখলে বলে, দেখ্ সুস্মি, বার্ধক্য আর বৃদ্ধত্ব এক নয়। বয়স আমাদের বার্ধক্য এনে দেয় আর বৃদ্ধত্ব আসে মন থেকে। দেখ্না আমরা যে লেখালেখি করি, সাহিত্যের মাধ্যমে যে চরিত্রসৃষ্টি করি, তাদের সজীব করি, সুন্দর করি, এককথায় যৌবনের দূত করে তুলতে পারি, তার কারণটাই হলো আমরা মনে মনে সবাই যুবক, তা যদি না হতো তবে আমাদের সৃষ্ট সব চরিত্রই লোলচর্ম হয়ে লাঠি ধরতো।

অসীমের কথাগুলোর মধ্যে বেশ যুক্তি আছে। কথাগুলো শুনতে সুন্দর। সুস্মির ইচ্ছে করে এই বয়সেও এক একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে নিজেকে দেখে। আসলে এক-একটা মানুষ থাকে যাদের চোখে থাকে সর্বনাশের আলো, আর গায়ে থাকে প্রেম-প্রেম সুগন্ধি। সুস্মি এই সব লোকগুলোকে খুবই ভয় পায়। মনের ব্যাপারে ও একটা বেশি রকম স্বার্থপর। ওর মতে যে যার মতন থাকাটাই ভালো। বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ নেই। জীবনটা যাপন করার জন্যে অবশ্যই। তবে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। বাইরেটা যে কোনও ভাবে চলে গেলেই হলো। কিন্তু ভেতরটাতে বেশ একটা গল্প করার জায়গা থাকা চাই, সেখানে থাকবে তার স্বনির্বাচিত গল্প করার মতো, আড্ডা-দেওয়ার জায়গা। অথবা কোনও পছন্দের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মনে মনে আড্ডা দিতে ওর খুব ভালো লাগে। তাই বাইরের কোনও লোককে সহজে ওর মনেই ধরে না। এহেন সুস্মির কিনা পরকীয়া রোগ? তাও আবার কবি নয়, সাহিত্যিকও নয়, এমন কি নিদেন পক্ষে তার মতন সামান্য রিপোর্টারও নয়। একেবারে অচেনা অজানা লোকের প্রেমে ডুবে যাওয়া। না-না, এ কিছুতেই সম্ভব নয়, এভাবে মনকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কাগজের জন্যে বেশ কিছু ফিচার লেখা বাকি। সম্পাদক তাগাদা দিচ্ছে। মাথার ব্যাণ্ডেজ দেখিয়ে বেশ কিছুদিন কাটানো গেছে। কিন্তু এবার তো টাকায় টান পড়বে। তাদের মতন ফ্রিল্যান্স রিপোর্টারদের ভবিষ্যৎ তো ঐ কাজের ওপরই নির্ভরশীল। দু-একটা ব্যক্তি ইনটারভিউ নেওয়া আছে সেগুলোকে

সাজাতে হবে, একটা সাময়িকপত্রের জন্য একটা আর্টিকেল লেখার কথা, সেটাও এখনো শুরু করা যায়নি, ওকে দেখতে আসার ভিড়ে। তারপর সেই পাহাড়ি জীবনযাত্রা নিয়ে একটা বড়ো রকমের লেখায় হাত দিতে হবে। এই লেখাটার কথা ভাবতে ভাবতেই মাথার ব্যাণ্ডেজে হাত দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সুস্মি হারিয়ে ফেলল নিজেকে। তার সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল সে-সময়ের প্রাত্যহিকতা, ঘর-সংসার সব—সবকিছু।

বাসের মধ্যে আছে সুস্মি। জানলা দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে পাথর গাছ নদী কখনো কখনো মেঘ। ওর ইচ্ছে করছিলো নেমে একটু ছোঁয়া, কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যে নিচে ফিরতে হবে, তাই ড্রাইভার কোথাও দাঁড়াতে রাজি নয়। সুস্মির অবশ্য এই আসাটা প্রথম নয় এর আগেও ও একা একা এসেছে অনেকবার। তবু যতবারই আসে ততবারই নতুন লাগে এই সব পাহাড়ি নদী পথ জনপদ। তাই যতটা পারে দু-চোখ দিয়ে শুষে নেওয়ার চেষ্টা করে। গাড়ি নামছে ঢালু পথে, দুপাশের পাহাড় আর খাদের মধ্যে চলছে লুকোচুরি খেলা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ড্রাইভার একটু স্পিড্ তোলে গাড়িতে, তারপরই প্রচণ্ড একটা শব্দ। গাড়িটা বোধহয় ধাক্কা খেল কোথাও। আর সুস্মির কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন আবছা অন্ধকার। ঘরের আলোয় সুস্মি বুঝতে পারলো, একটা সম্পূর্ণ অচেনা বাড়ির মধ্যে সে শুয়ে আছে। তার মাথাটা যার হাতের মধ্যে ধরা তিনি সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। তাঁর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ। জ্ঞান ফিরতে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কাঁচের গেলাস থেকে গরম দুধ ওর গালে ঢেলে দিয়ে বললেন, খেয়ে নিন্। এখন একটু ভালো লাগছে তো? সুস্মি ভীষণ লজ্জা পেয়ে উঠে বসতে গেল, কিন্তু মাথাটা কি রকম যেন ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ধরে ফেললেন, তারপর আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সুস্মির শুয়ে শুয়ে ঘরের চারদিকটা দেখে নিল। ঘরের আসবাব দেখে একেবারেই মনে হলো না সেখানে কোনও মহিলা থাকেন। একটা অদ্ভুত অজানা অনুভূতিতে চোখ বুজিয়ে নিল। একটু পরেই একজন ঘরে ঢুকলেন। হাতে ব্যাগ। সুস্মিকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। পরে মৃদু স্বরে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, মাথায় চোটটা ভালোই লেগেছে। সারতে বেশ সময় নেবে। ভাগিস্য ঐ অ্যাক্সিডেন্টে আপনার কিছু হয়নি, তাহলে আর আপনার স্ত্রীকে বাঁচানোই যেত না।

আপনার স্ত্রী কথাটা কানে যেতেই চমকে ওঠে সুস্মি, বেশ বিস্ময় নিয়ে তাকায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে, কিন্তু সে সময় অদ্ভুত একটা অনুরোধ ঐ দুটো কাতর চোখে। সুস্মি বাধ্য হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়, পাশ ফিরে শোয়। ভদ্রলোক ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন সুস্মির বিছানার কাছে। ওর দিকে একটু ঝুঁকে বলেন, আপনি নিশ্চয়ই রাগ করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কোনও উপায় ছিল না, তাছাড়া—

সুস্মি আস্তে আস্তে চোখ তুলে বলে, বলুন তাছাড়া কি?

বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কোন অসুবিধেই করিনি। আসলে কাল রাত্রে গাড়ি এ্যাক্সিডেন্টের পর আপনার জ্ঞান ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই আমার বাড়িতে এনেছিলাম। তারপর ডাক্তার লোকজন সব একে একে চলে যেতে একটা পুরো রাত আপনার জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোধহয় আপনাকে—

মাথা নীচু করলে ভদ্রলোক। বিড় বিড় করে বললেন, তাই ডাক্তারবাবু আপনাকে আমার স্ত্রী মনে করাতে ততটা চমকে উঠিনি। আশা করি আমার অসহায়তাটুকু ক্ষমা করে দেবেন। একটু পরে সুস্মির দিকে চেয়ে বললেন, এতে অবশ্য অনেকটা সুবিধে হয়ে গেল। অনেক কৌতুহলী দৃষ্টি সরে গেল আমাদের ওপর থেকে, আর খুব সহজেই আমি আপনার কাছে আসতে পারলাম।

আবার ধাক্কা খেল সুস্মি, কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না। ওর শরীর মন দুটোই দুর্বল হয়ে আসছে, পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক একটা গ্লাসে আবার একটু দুধ আর দুটো বিস্কুট এনে বললেন খেয়ে নিন। এই সব পাহাড়ি এলাকায় বেশি কিছু তো পাওয়া যায় না। আগে থেকে বলে রাখলে না হয়—

সুস্মি আবার মুখ খুলল, 'যা পাচ্ছি এই তো অনেক।' ভদ্রলোক কিছু বললেন না, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুস্মির দিকে। যেন বিশেষ আপন কাউকে খুঁজছেন। তারপর পরম সাবধানতায় ওকে তুলে ধরে দুধ আর বিস্কুট খাওয়ালেন। এই অসুস্থ শরীরে সুস্মিরও যেন কোথাও একটা পরম নির্ভরতার আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, 'কাল কিছু একটা অন্যায় করে ফেলেছি। আপনার ব্যাগ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আপনার বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।'

সুস্মি হঠাৎ জোরে একটা বিষম খেল। মনে মনে হাঁটতে হাঁটতে মোড় পেরিয়ে অন্য পথে চলে এসেছিলো, হঠাৎ ভদ্রলোক তার বহুদিনের চেনাপথটা এক ধাক্কায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। অকারণেই ওর চোখের কোণদুটো চিক্ চিক্ করে উঠলো, সেসময় উনি আনলার সামনে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা পোষাক বাতিল করছিলেন। তাঁর দেওয়া খবরটা সুস্মির বাড়িতে ঠিকমত পৌঁছেছে কিনা এটা জানতে চাওয়া তার কর্তব্য। সমস্ত আনলা নামানোর পর একটা সার্ট চড়িয়ে চটিতে অতিরিক্ত আওয়াজ করে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতে সুস্মি একটু একটু ক'রে গত রাতের ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করলো। ডাক্তার বোধহয় যন্ত্রণার জন্যে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলো। তবু মাঝে মাঝে যেটুকু চোখ খুলছিলো দেখেছে একটা মানুষ নির্নিমেষে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, সুস্মি যন্ত্রণায় উসপাশ করতেই ধরে শুইয়েছে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আপনি ঘুমোন, আমি তো

আছি। সুস্মি অনেক কষ্টে উচ্চারণ করেছে 'আপনি?'

আমি তো কাল থেকে খুশিমতো ঘুমোবো, আজকের রাতটা আমাকে জাগতে দিন প্লিজ। সুস্মি আবার তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে।

সকালের গাড়িতেই চলে এসেছে অরুণাভ। সঙ্গে মেয়ে এসেই হৈ চৈ লাগিয়ে দিলো। ওরাও যে-এ-দুদিন খুব টেনস্‌ড ছিলো সেটাও জানালো। তবে সুস্মির ফেরাটা ঠিক ছিলো না। সুস্মি আস্তে আস্তে বললো, তিনি তাঁর কর্তব্য করতে পেরেছেন কিনা জানতে গেছেন। অরুণাভ এবার একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'অন্য কোনও অসুবিধে?' সুস্মি উত্তর না দিয়ে শুধু মাথার ব্যান্ডেজটা দেখাল। অরুণাভ হা-হা করে হেসে উঠল, আরে না-না, আমি কি আর সেরকম কিছু—

ইতিমধ্যেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, হাতে স্ন্যাক্সের দুটো প্যাকেট। অরুণাভকে দেখে খুব খুশি। সহজ গলায় বললেন, এসে গেছেন দেখছি। নিন মশাই, আপনার জিনিসপত্র বুঝে নিন।

সুস্মি একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। কিন্তু ভদ্রলোক আর ওকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। উনি তখন অরুণাভকে নিয়েই ব্যস্ত। বললেন, আপনাদের গাড়ি দশটায়। ৮-৩৫, অতএব এই সময়টা কিছুটা জলযোগের কাজে লাগানো যেতে পারে। বলে টেবিলের ওপর খাবারের প্যাকেটগুলো রাখলেন। তিনজনের খাওয়া-দাওয়ার পর বললেন, কাল থেকে উনি খুবই চাপের মধ্যে আছেন। যতই হোক বিপদের সময় নিজের লোক কাছে না থাকলে—

সুস্মি সমস্ত দৃষ্টিশক্তি এক জায়গায় এনে চেষ্টা করলো কালকের মানুষটাকে খোঁজার, কিন্তু পেল না। কষ্টে ওর চোখে জল এসে গেল। মনে মনে ঈশ্বরকে বলল, এত ভালো মানুষ গড়ার কি দরকার? একটা প্রচণ্ড অভিমান ওর বুকে চাপ দিচ্ছিল। কালকের সেই লোকটাই আজ তাকে তাড়াবার জন্য কেমন উঠে-পড়ে লেগেছে। কত অভিনয় মানুষ করে। অরুণাভ সুস্মিকে কিছু খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলো, সুস্মির গলা দিয়ে কিছুই নামতে চাইলো না।

ভদ্রলোক ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। ততক্ষণ অরুণাভের গোছগাছ শেষ। নিঃশব্দে ফিরে অত্যন্ত উদাসীনভাবে অরুণাভর হাতে কিছু ওষুধপত্র আর ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনটা দিয়ে বললেন, এগুলো রাখুন, পথে একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর ওখানে গিয়ে একটা ভালো ডাক্তারকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন। আঘাতটা কম হয়নি কিন্তু।

সুস্মি আর একবার ম্লান হেসে ওঁর দিকে তাকালো। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারেই দেখছেন না ওকে। বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল। অরুণাভ পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ভদ্রলোককে বললেন, আপনার ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারবো না। তবু বলছি অন্তত ওষুধ আর ডাক্তারের খরচ হিসেবে যদি

এটুকু রাখেন। এবার ভদ্রলোক চট করে একবারে দেখে নিলেন সুস্মির দিকে। তারপর অরুণাভর দুটো হাত ধরে বললেন, একজন মানুষ হিসেবে একজন মানুষের জন্যে আমি খুব সামান্য কিছু করেছি, আপনার কাছে অনুরোধ, সেই পরিচয়টুকু আমাকে রাখতে দিন।

অরুণাভ টাকাটা পকেটে রেখে দিলো। তারপর সুস্মিকে ও মেয়েকে নিয়ে আস্তে আস্তে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

ভদ্রলোক অত্যন্ত স্বাভাবিক চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়েছে, হঠাৎ ভদ্রলোক চিৎকার করে বললেন, একটু দাঁড়ান। বলেই ছুটে গেলেন ঘরের মধ্যে। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ওয়াটার বটলটা হাতে নিয়ে। সুস্মির হাতে বোতলটা দিয়ে বললেন, আপনার ওয়াটার বোতলটা, বোতলের সঙ্গে একটা নেমকার্ড—অভীক চৌধুরী ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্টো পিঠে লেখা মনে পড়লে খুঁজো। অরুণাভ দেখার আগেই সুস্মি কার্ডটা বুকের মধ্যে গুঁজে নিল, জলের বোতলটা এগিয়ে দিল মেয়ের দিকে। ততক্ষণে গাড়িটা বেশ কিছুটা গড়িয়ে গেছে।

পরপুরুষ

নাসরীন জাহান

কুসুম দেখল, সারা চরাচর নীল করে ধেয়ে আসত যেসব জালালি কবুতর, কি এক ধাক্কা খেয়ে সেগুলো ক্ষুদ্র পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে মুহূর্তে সব শূন্য করে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। পায়ের তলায় কুটকুট কামড় দিচ্ছে বিষ পিঁপড়ে, এর মধ্যেই গাছপালার ওপর তখন ভর করছে সন্ধ্যা।

কুসুমের তালাক হয়ে গেল।

অচৈতন্য কুসুম এক সপ্তাহ বাপের বাড়ি মড়ার মত পড়ে থেকে আটদিনের দিন খাঁড়া হয়ে দাঁড়াল। এই সাতদিন তার চামড়ার ওপর দিয়ে গেল চিরকালীন নিষ্ঠুর গঞ্জনাগুলি, যার বিষাক্ত হুল দীর্ঘদিন তার হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করতে করতে সেটাকে রীতিমতো অকেজো করে তুলেছে। একসময় অঝোর কান্নায় রাত রাত ডুবে থাকত সে। শেষে হৃৎপিণ্ডের কাজ ফুরলে কুসুম সব স্পর্শ করত চামড়া দিয়ে।

শাশুড়ী বলত কানকাটা বেহায়া।

স্বামী বলত গাছের গুঁড়ি।

সেই পাট চুকে যাওয়ার পর সুড়সুড় করে বাড়িতে এসে পা রাখতেই মা রূপান্তরিত হল শাশুড়ীতে। ভাইদের কথা না হয় সে বাদই দিল। হুলভাঙা মা দেউরিতে বসে হাঁপাতে থাকলে চেতনারহিত কুসুম বেড়ালের মতো গা ঝাড়া দিল।

জড় শরীর টেনে লম্বা উঠোনটা পার হয়ে সে যখন টলোমলো দীঘির পাশে গিয়ে বসল, দেখল চারপাশে আনারস চক্ষু কি রকম কৌতূহলী, ড্যাবডাব।

কুসুম বুঝল, সে চিরজীবনের জন্যে অতিচেনা বাপের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছে।

সে অচেনা দীঘিতে একটার পর একটা ঢিল ছোঁড়ে, আর জলের ছত্রাক তরঙ্গ দেখে, ততক্ষণ দেখে, যতক্ষণ প্রতিটি ভাঙা ঢেউ মাটির প্রান্ত না ছোঁয়।

গরুর দীর্ঘসারি ধুলো উড়িয়ে আসমানের মত টানা রাস্তাটা ধরে যখন ঘরে ফিরছে, শেষদিনের মত হাঁস-মুরগিগুলো দিচ্ছে প্রাণ ফাটান হাঁক, হাঁটুর ওপর

উঠে থাকা ল্যাপটান শাড়ি নিচ দিকে টেনে কুসুম হাই তুলে দাঁড়াল। ভোর থেকে মধ্যরাত অব্দি পরের বাড়িতে ধান সেদ্ধ, মাড়াই যাবতীয় কাজ করতে করতে মার পায়ের প্রতিটি ভাঁজে যেন আজন্ম বিষ জমে গেছে। এটি অনুভব করার ক্ষমতাও সে এক সময় হারিয়ে ফেলেছিল।

উঠানের মাঝখানে খড়ে আগুন জ্বেলে চারপাশে বসে পুরো পরিবার। প্রথম ধাক্কা সামলে উঠতে থাকায় মার ভেতর থেকে সাপিনী ভাবটা কমে এসেছে, তরে যে তালাক দিছে, চাইর দিকে কেউ সাক্ষী আছিল?

কুসুমের কণ্ঠ স্পষ্ট, বেবাকেই হুনছে।

এই প্রশ্নটিই মা এই সাতদিন ক্রুদ্ধ হয়ে, হতাশ হয়ে, কান্না বিজড়িত কণ্ঠে হাজারবার করেছে। কিন্তু কুসুমের উত্তর কিছুতেই তার মনঃপুত হয় না, বিশ্বাসও হয় না। কিন্তু এই উত্তর দেয়ার ব্যাপারে কুসুমও ক্লান্তিহীন। শরীরে আঁচল ভাল করে টেনে হাত মেলে ধরল গনগনে শিখার ওপর।

মা জোরে নিঃশ্বাস টানতেই কুসুম দেখল তার গায়ের প্রস্ফুটিত কালো হাড় যেন মড়মড় করে উঠেছে। সেদিক থেকে ভাবলেশহীন চোখ সে স্থাপন করল নিভন্ত শিখার দিকে।

হের পরে তুইই বাইর হয়া আইলি?

না, তাইনের মায় আমার ঘাড়ের মইধ্যে ধইরা—

ঠিক আছে বুঝছি, মাগীরে আমিও দেইখ্যা ছাড়ুম। কুসুমের শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে এই কথা উচ্চারণ করে মা লাঠি দিয়ে নিভন্ত আগুন উস্কে দিল। মায়ের শরীরের ছ্যাতলা পড়া চামড়া ঝাপসা আগুনে কেমন চকচক করে উঠল। পরিবারের সবাই নতমস্তকে সেই আগুন দেখছে। আকাশ কাঁপিয়ে উঠোনে ভেঙে পড়েছে রাজ্যির কুয়াশা। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দুর দুর গ্রামে পিশাচের মত অন্ধকার। এর মধ্যেই আচমকা স্পষ্ট হয়, একটি আলোকখণ্ড হাঁটছে। কুসুমের ভয়ার্ত চামড়া শিরশির করে। মহিলা জিন, যে জিন আবার অসম্ভব বদ, এরা হ্যাঁ করলেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে এমন আলো জ্বেলে ওঠে। জন্মের পর থেকেই এই সত্য বিশ্বাস করে কুসুম।

একরাতে তেমন এক জিনকে ধরে ফেলেছিল গ্রামের লোক। তার কি অদ্ভুত জটা চুল, কালো চামড়া, কি রকম হি হি হাসছিল। সবাই তার চুলের গোড়া ধরে চতুর্দিকে সে কি ভয়ঙ্কর চক্কর। শেষে নাক-মুখে রক্ত এসে ওর চেহারাকে আরও বীভৎস করে তুলছিল। সেই মহিলা জিনের প্রতি সবার একটিই চাহিদা, তুই হাঁ কর।

ভয়ে পাংশুপ্রায় সেই বদ জিন হাঁ করে। কিন্তু ভেতরে আগুন নেই।

আগুন বাইর কর।

মহিলা শিরা ফাটিয়ে হাঁ করে, আগুন আসে না। এর পর ওকে বেদম মার।

আগুন কই লুকাইছস? মানুষের লগে চালাকি?

ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল কুসুম। তার কম্পিত চোখের সামনে সেই মৃতপ্রায় জিনের মাথা ন্যাড়া করে সবাই মহা-উৎসাহে অমাবস্যার শীতে পুকুরে ছুঁড়ে দিয়েছিলো।

পরদিন কুসুম অবাক হয়ে দেখেছিল, পুকুরে তার ছায়ামাত্র নেই। আজও কি তেমন একজন যাচ্ছে? আহারে, সেই জিনের বেদনা প্রকাশের আর্তি হুবহু মানুষের মত ছিল। কুসুম দূর আলোর দিকে হিম চোখে চেয়ে থাকে।

খাঁ-দের বাড়িতে ঠিকা ঝির কাজ নিয়ে ক'দিন পরই কুসুম তার চির জীবনের জের টানতে থাকে। পার্থক্য একটাই, রাত এলে যন্ত্রণাময় শরীরটা থেকে কেউ মাংস খুবলে নিতে চায় না। এ যে সৃষ্টিকর্তার দেয়া কি আজব শাস্তি কুসুম বুঝে পেত না। এই রকম যন্ত্রণার সম্পর্ক ছাড়া নাকি সন্তানও হয় না। সন্তান তাদের হয়েওছিল। দুটো ছেলে সন্তান জন্ম দেয়ায় ও বাড়িতে তার অবশ্য আলাদা এক রকম কদর ছিল। সেই ছেলে দুটোকে আজরাইল যে কী ইশারা করল! এক দুপুরে গলা জড়াজড়ি করে কোনও এক ফাঁকে অথৈ পানিতে তারা অন্তিম ডুব দিল।

সারাদিন কাজ শেষে রাতে গভীর শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকে কুসুম। নিজেকে বড় নির্ভার মনে হয়। তেমনই ফাঁপা মুহূর্তে আচমকা মনে হল, জালালি কবুতরগুলো কেন অমন পিণ্ড হয়ে শূন্যে মিলিয়েছিল? এই ভাবনার পরই চারপাশে গভীর রাত নামল।

আরেকটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে গেঁথে গেল কুসুমের জীবন।

কয়েকমাস পরে এক রাতে কি এক শব্দ। কুসুমের ঘুম ভাঙতেই প্রতিদিনের মত দেহ উজাড় করে প্রকৃতি ডাক দেয়। সারা ঘর জুড়ে সবাই এমনভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে এ যেন ঘর নয়, ঘুমের কারবালা।

আড়মোড়া ভেঙ্গে বাঁশের চাটাইয়ের দরজা খুলে কুসুম বেরিয়ে আসল। চাঁদ নেই, কিন্তু কি এক উজ্জ্বল ছায়ায় কুয়াশায় মোড়ান রাত্রি উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ভয়ার্ত কুসুম দূরের দিকে তাকাল, না আলোর ফুটকি নেই কিন্তু দেউড়ির কাছে কামরাঙ্গা গাছের নীচে ও কিসের ছায়া? কেমন গলাগলি ধরে আছে? বিহ্বল কুসুম শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেল। তবে কি ওর পুত্ররা এসেছে? বুক ভেঙ্গে গলার কাছে যন্ত্রণা উঠতেই বাতাস এমন আচমকা ঝাপটা দিল, কুসুম একরকম ছিটকে বাড়ির পিছনের ঝোপের কাছে দাঁড়াল। কঠিন শীতে দু পাটি দাঁত আঠার মত লেগে যাচ্ছে, এর মধ্যে কি রকম কাঁচা লেবুর ঘ্রাণ আসছে।

নিজেকে নির্ভার করার প্রস্তুতি নিতেই তার ওপর হুলোবেড়ালের মতো লাফিয়ে পড়লো কেউ। হতচকিত কুসুম কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড শক্তিতে তার মুখ চেপে ধরল।

স্তব্ধ কুসুম সেই লোকের চেহারা দেখে সমস্ত হাত-পা ছেড়ে দিল।

দীর্ঘ সময় পর নিজেকে ধাতস্থ করে কুসুম অবসন্ন কণ্ঠে বলল, আফনে এইডা কি করলেন? প্রচণ্ড গরমে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। গামছা কোমরে কষে বেঁধে জামরুল গাছে হেলান দিয়ে হাফিজ নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি ধরাল। এরপর ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল—তরে আমি আবার ঘরে তুলুম।

কুসুম সব ছাপিয়ে বিস্মিত হচ্ছিল তার নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণে, যাকে সে ভেতরে এতদিন লালন করে এসেছে। কিন্তু নিজেরই অজ্ঞাতে। ধবল ছায়ায় ওই চিরচেনা একঘেয়ে মানুষটিকে দেখা মাত্রই সর্বাঙ্গ কেমন বিপুল উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করল। কোনও কথা না বলে লোকটি যখন তার দেহ মাটির সাথে মিশিয়ে দিল, কুসুমের তখন প্রথমেই মনে পড়ল কঠিন পাপের কথা। যে লোকটি তাকে নিজের সম্পত্তির মতো যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করত, সে এখন দুনিয়ার সমস্ত পুরুষের মতো তার কাছে বাইরের লোক। এর চেহারা দর্শন করাও তার জন্যে পাপ। এই ভয়, তার শরীরে এনে দিল এমনই এক নিষিদ্ধ অনুভূতি, যার তুলনা সে একমাত্র করতে পারে। অদ্ভুত, মোহগ্রস্ততার সাথে তার শরীর জেগে উঠেছে। আঁধারে ওৎ পেতে থাকা এই মানুষটিকে সে আর চিনতে পারে না। সে বিশ্বাসও করতে পারে না। এই লোকটির সাথে মাসের পর মাস মিলনের তার গোর আজাবের কথা মনে পড়ত।

এক সময় কুসুমের ভেতর থেকে উষ্ণতা অন্তর্হিত হয়ে কুয়াশা ঢাকতে থাকে। তার দিক্‌ভ্রান্ত কণ্ঠ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আফনে বেবাকের সামনে চিক্কোর দিয়া আমারে ছাড়ান দিছেন, অহন কেমনে নিবেন?

হাফিজ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, হেই ব্যবস্থা আমি করুম। ইমাম সাইবের লগে আমার কতা হইছে, তুই তর বাড়িতে বুজায়া ক।

ইমাম সাইব কি কইছেন?

অহনও কতা শেষ অয় নাই, আমি তিনদিন পরে আবার আসুম।

হাফিজের কণ্ঠের তীব্রতার মধ্যেই কুসুম আবার তার পরিচিত লোকটিকে চিনতে পায়। উঠোনের মধ্যে তাকে আছড়ে ফেলে যে লোকটি তিনটি শব্দে তার আসমান-জমিন দুভাগ করে দিয়েছিল—তার সেই নিষ্ঠুর মুখ মুহূর্তে কুসুমের মধ্যে ঘৃণা এনে দেয়। সে কিছু বলার জন্য হাফিজের মুখের দিকে তাকায়। হাফিজ তখন দাঁড়িয়েছে। তিনদিন পরে রাইতে ঠিক এই সময় আমি আইয়া শিয়ালের মত আওয়াজ দিমু, তুই—।

আমারে আফনের কি দরকার? নিম্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করে কুসুম, আফনের তাগড়া শরীল, কাম জানেন, গেরামে কত মাইয়া আছে।

হাফিজের কণ্ঠ এবার আর্দ্র হয়ে আসে, বিরাট সর্বনাশ কইরা ফালাইছিরে। আমি অহন অক্ষরে অক্ষরে বুঝতাছি, তরে ছাড়া আমার জুইৎ লাগে না।

স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া জীবনের প্রথম স্বীকৃতির ধাক্কা সামলে কুসুমের মনে নতুন ভয় সঞ্চিত হয়, বাড়ির কেউ যদি টের পায়...।

কুসুমের নির্দিষ্ট ছকের জীবনের মধ্যে আবার একটা উল্টোপাল্টা লেগে যায়। তার যন্ত্রচালিত পা ঢেঁকির গোড়ায় বিরামহীন চাপ দেয়, কিন্তু সম্মুখের পিষ্ট ধানের মত তার বুকের ভেতরটার যাবতীয় খোসা অনর্গল ভাঙতে থাকে। বহুদিন পর কুসুমকে কি এক কষ্ট গ্রাস করে। খোসা খুলে পড়তে থাকায় মৃত্যুর মত হু হু শীত ঢোকে ভেতরে। আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বেহায়া, গাছের গুঁড়ির জীবনে? ওই লোকের যদি আবার জুৎ নষ্ট হয়ে যায়? এছাড়া এরকম বেশরিয়তি কারবার সমাজই বা মানবে কেন?

ঠিক আছে, সমাজ না হয় মানল, তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে এরপর তার অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তিনদিন পর অন্ধকার বৃক্ষের নীচে বসে ফিসফিস করে কুসুম এমন আশঙ্কার কথাই ব্যক্ত করল। হাফিজ একটি নতুন শাড়ি কিনে এনেছে। তার এই জাতীয় নতুন ব্যবহার, শাড়ির অভিনব ঘ্রাণ কুসুমের সবকিছু বিশৃঙ্খল করে তুলল, হাফিজ বলল, দরকার হইলে আলাদা ঘর তুলুম। আমি কি আমার মা-বাপেরডা খাই?

আফনে নতুন দেইখ্যা একটা বিয়া করেন।

তাতে তর খুব সুবিধা অয়? উষ্ণ কণ্ঠে হাফিজ বলে, চেহারা আছে, নতুন মানুষ ধরবি। চেহারা গতর? কুসুমের সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। এ সমস্ত জিনিস তার কোনও কালে ছিল বা আছে এ নিয়ে কতকাল তার মধ্যে কোনও বোধই নেই। ঢ্যাঙা শরীরটা, যেটা দুসন্তান বিইয়ে ডিম ছেড়ে দেয়া ইলিশের মত হয়ে গেছে, সেটাকে তেলচিটচিটে শাড়িতে ঢেকে কোনও রকমে আব্রু রক্ষা করে চলা। সেই বিষাক্ত গন্ধের মাংসের তলায় স্বামী যখন নিজেকে সেঁধিয়ে দিত, সে চাইত মৃত দুই সন্তান পুনর্জন্ম নিক, এছাড়া তার স্বামীর বা তার নিজের কোনওদিন কোনও অবকাশ হয়েছে, 'গতর' কিংবা 'চেহারা' নিয়ে কোনও কিছু চিন্তা করার?

হাফিজ আজ শার্ট পরে এসেছে। আলো-ছায়ার খেলা তার চেহারাকে বিচিত্র করে তুলেছে। ঘন ঘন বিড়ি টানে সে, ভারি একটা সমস্যায় পড়ছিরে কুসুম, আমার ঘরে যাইতে হইলে তর হিল্লা করন লাগবো। ইমাম সাইবের বহুৎ হাতপাও ধরছি, তাইনে কন এইডা ছাড়া আর কুনো রাস্তা নাই। কুসুমের পায়ের ওপর দিয়ে সশব্দে ইঁদুর লাফ দেয়। সে চাপা কণ্ঠে এমন টানা আর্তনাদ করে ওঠে, নিচের শুকনো পাতাগুলি মড়মড় করে ওঠে। ভাঁজ করা নতুন শাড়ি, মুখের কাছে চেপে সে নিজেকে সামলায়। তারপরই তার স্তব্ধ কণ্ঠ সমগ্র চরাচরে আছড়ে পড়ে, আমার হিল্লা দিতে হইবো ক্যান? আমি আফনেরে তালাক দিছি?

হাফিজ চাপা কণ্ঠে বলে, কিন্তু নিয়ম যে এইডাই। আমার যদি হিল্লা দেওন

লাগতো তয় কি আমি অত চিন্তা করতাম? এক বেডিরে এক রাইতের লাইগ্যা বিয়া করন, বিষয়ডা কি এমন খারাপ! তুই আরেক বেডারে বিয়া কইরা হের বাদে আমার কাছে আইবি, আরেক বেডার জুডা কইরা দেওয়া শরীল লইয়া আমার ঘর করবি, বিষয়ডা বুঝ।

আফনের যদি হিল্লা অইতো তয় আফনে জুডা অইতেন না?

পুরুষ মাইনষের শইল কুনদিন জুডা অয়? হাফিজ বিস্মিত চোখে কুসুমের দিকে তাকায়, তুইতো বহুত কতা শিখছস, বিষয়ডা কি?

শীতে ঠকঠক কাঁপে কুসুম। ওকে টেনে বাঁশঝাড়ের দিকে নিয়ে যায় হাফিজ। কুসুমের পাণ্ডুবর্ণ মুখ কুয়াশায় ভিজে ওঠে। সে চুলে হাত দেয়, ভেজা। রাত্রি যে এত আজব কোনওদিন কুসুমের দেখা হয়নি। গোরস্থানও এত নিস্তব্ধ হয় না। কুসুম বলল, আপনে এইডা কি কন? আমারে হিল্লা করাইবেন? হের বাদে আফনেগোর কাছে আমার কুনো ইজ্জত থাকবো?

এইডা ছাড়া ত গতি দেহি না, রীতিমতো মুষড়ে পড়ে হাফিজ।

আফনে আমারে বাদ দেন, কোড়ালের কুপ ত দিয়াই ফালাইছেন। অহন মইরা গেলেও আর জোড়া দিবার পারবেন?

এ বিষয়টা আর তাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কুসুমের পরিবারে, সমগ্র গ্রামে বিষয়টা আলোচিত হয়। সবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হাফিজের এক জেদ কুসুমকে সে ঘরে তুলবেই। ধর্মমতে এর জন্যে যা প্রায়শ্চিত্ত করার সে করবে। গ্রামে শিক্ষিত যে দু একজন আছে তারা হাফিজকে বোঝায়, প্রায়শ্চিত্ত ত কুসুমেরই হবে তার জীবনটা নিয়ে উল্টাপাল্টা একটা খেলা হবে। এর জন্যে ত সে দায়ী নয়। হাফিজের মন্তব্য স্বামীর পাপ মানেই স্ত্রীর পাপ। স্বামী কারাগারে গেলে স্ত্রী বছরের পর বছর আজাব ভোগ করে না? সে যে অপরাধ করেছে তার দায়িত্ব কুসুমকেও নিতে হবে।

কুসুমের ছিন্নমূল পরিবারও বিষয়টি তুমুল প্রতিক্রিয়ার সাথে গ্রহণ করে। তারা বলে, কুসুম সারাজীবন দরকার হইলে একলা থাকবো, হাফিইজ্যা মনে করছে কী? কুসুম তাগোর হাতের খেলার পুতুল? তারা যা ইচ্ছে করবো, তা-ই অইবো?

তাদের বাড়ির উঠোনে এসে বদরাগী হাফিজও নতমস্তকে বসে থাকে। শাশুড়ীকে কোনওদিন সে পাঁচ আনা দিয়েও পোছেনি। স্ত্রীকে নাইওর আসতে দেওয়ার ব্যাপারেও তার চিরকাল ছিল ঘোর আপত্তি। সে দেখে, আজ তার বেকায়দা অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যাঙও কেমন ঠ্যাং নাড়ছে। সে তার ওপর শাশুড়ীর বর্ষিত সমস্ত গঞ্জনা সহ্য করে শান্ত কণ্ঠে বলল, কুসুম কি কয়?

মহিলা হাঁপাতে থাকলে তার শরীর থেকে হাড্ডি চামড়াসহ পাঁচ চক্ষু বিস্ফারিত হয়। এর মধ্যে হাঁপানির টান থাকায় নিঃশ্বাসে এমন শব্দ হয়, মনে

হয় পেটের মধ্যে থেকে শিঙ্গা ফুঁকছে কেউ। সেই মহিলার মেজাজের ন্যূনতম কিছুও যদি কুসুমের মধ্যে থাকতো, হাফিজ মনে মনে ভাবে, তা হলে পশ্চিমের খালে এতদিনে ওর লাশ ভাসতো।

শাশুড়ী শ্বাস টেনে খনখনে কণ্ঠে বলল, ও আবার কি কইবো? ওরে কইবার কিছু রাখছো তুমরা? মুখে চুনকালি দিয়া বিদায় দিছো না?

হাফিজ উঠোনে বসে হাসতে থাকে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে বিস্ফারিত চোখে এই দৃশ্য দেখে ঠাণ্ডায় জমে উঠল কুসুম।

হাফিজ বলে আফনের মাইয়া দুইদিন আগেও রাইতে আমার লগে দেহা করছে। অহন আপনেই বুইঝ্যা দেহেন, এই সমাজের কুনহানে অরে জায়গা দিবেন?

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মুহূর্তে দপ করে নিভে যায়। পরক্ষণেই মহিলার ভেতর নতুনভাবে তা জ্বলে উঠে। তার শরীরে ভর করে বাঘের শক্তি, তিন লাফে সে ঘরের মধ্যে গিয়ে কুসুমের ওপর মার মার চড়াও হয়।

কুসুমের প্রতিটি আর্তনাদ হাফিজ বিনা প্রতিবাদে কান পেতে শোনে।

দিঘির মধ্যে শ্লথ কুসুম ঢিল ছোঁড়ে। ধীরে তরঙ্গ চতুর্দিকে বিস্তারিত হয়। স্তরপড়া শ্যাওলা লক্ষছত্র হয় নিটোল জলের সাথে মিশে যেতে থাকে। মাথার ওপর একটানা ডাকতে থাকত ভরদুপুরের ঘুঘু। কুসুমের ঘুম পায়। নিজেকে ঝেড়ে সে ঘাটের একদম কিনারে চলে আসল। জলের মধ্যে পা ডোবালো। পায়ের গোড়ালি ফেটে লাল মাংসে কেমন মাটি ঢুকে আছে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শিরশির করে উঠলে কুসুম ত্রস্ত ভঙ্গিতে পা উঠালো। এরপর ঘাটের পাশে থাকা ঝামা দিয়ে আনমনে সেখানে ঘষতে থাকল। কদিন সে কাজে যাচ্ছে না। বাড়ির যে অবস্থা, দুদণ্ড বসা যায় না। সবাই তাকে জীবন থেকে খারিজ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় পেটের ক্ষুধায় মাথা বনবন করে। তার মাথায় কিছু খেলে না, না আলো, না ছায়া, না পুনর্বিবাহ, না পুরাতন সংসার, কিচ্ছু না।

সারা গাঁয়ের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে এক সময় কুসুমের হিল্লা বিবাহ সম্পন্ন হল। যুবক ডুগডুগি বাজিয়ে গান গায়, ভিক্ষে করে। গ্রামের কোণার আধভাঙা ঝুপড়ির মধ্যে রাত হলে ঘুমিয়ে থাকে। হাফিজের ভাষায় 'মাজা ভাঙা পোলা'। এই শব্দের কোনও অর্থ কুসুম জানে না। যার মাজা ভাঙা, সে সুস্থ মানুষের মতো হাঁটে কি করে, এই বাড়িতে এসে এইটাই সে প্রথম চিন্তা করল।

এরপর রাত্রি বাড়িতে থাকে। মাঠের শেষ প্রান্তে একলা শূন্য ঘর, ফলে নিস্তব্ধতার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। ঘরের কোণায় চাটাইয়ের ওপর মাথা নিচু করে বসে আছে ভিক্ষুক গায়ক। তার শরীরটা এত ছোট আর এত হালকা,

ভিক্ষে দেওয়ার ব্যাপারে যে কারোরই মায়া হবে। পাশের খেজুর গাছে শীতের বাদুড় ডানা ঝাপটালে হাফিজের দেয়া নতুন শাড়ির আঁচল ভয়ার্ত হাতে কুসুম গলায় প্যাঁচাতে থাকে। হঠাৎ তার সেই বদজিনের কথা মনে হয়, তার বিস্ফারিত হাসি, তার নীল হয়ে ওঠা মুখ। কুসুম নিস্তেজ হয়ে আসল। মাঝখানে চাগিয়ে উঠেছে কুপির দপদপে শিখা। হাফিজের পরামর্শ মনে পড়লো, অন্ধকার বৃক্ষের নিচে ফিসফিস করে বলেছিল, পরপুরুষে তর শইলে হাত দিলে কবিরা গুনাহ হইবো। ঐ বেডারে শইল ছুঁইতে দিবি না।

আফনেও ত পরপুরুষ, কুসুম বলেছিল, গুনাহ যা অওনের ত অইয়াই গেছে। তাইনের লগে আমারে বিয়া দিতাছেন, তাইনে কেমনে পরপুরুষ অয়?

খুব মজা লাগতেছে না? খেঁকিয়ে উঠেছিল হাফিজ! তুই দশ বেডারে শইল দিবি? আমি আপন হই, পর হই তুই আমার ঘরই আগে করছস, পরে আমার ঘরই করবি। হেই বেডার লগে এক রাইত থাকনের নিয়ম থাকবি, হেয় তর গতরে হাত দিবো, এইডা ভাবছো কেমনে?

আমি কি করুম?

হাফিজের কম্পিত হাত থেকে বিড়ি খসে পড়েছিল, হেই বুদ্ধিই ত দিতাছি। তুই শইলের মধ্যে পট্টি লাগায়া কইবি, তর হায়েস অইছে।

হাফিজের বুদ্ধিতে অভিভূত কুসুমের হাত-পা আলগা হয়ে আসছিল, হের পরেও তাইনে যদি না মানবার চাইন?

মানবো না মাইনে? হাফিজ আসমান থেকে পড়েছিল, তুই কইবি, এই অবস্থায় থানডা কবিরা গুনাহ্। হেই বেডার উপরে আল্লাহ নাই? এই বুদ্ধিডাও খরচ করবার পারবি না?

এতসব কবিরা গুনাহের ধাক্কায় বিক্ষিপ্ত কুসুম মাঝখানের কুপি সরিয়ে তার রাত্তির জন্য নির্ধারিত স্বামীর সামনে গিয়ে বসল। এই লোকটি একটি লুঙ্গি, দুই কুচি চাল আর একটি নতুন ডুগডুগির বিনিময়ে তাকে এক রাতের জন্যে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। কুসুমের বুকের দলা দলা বিষ ওপরে উঠে তার জিভ তেতো করে তোলে। এর মধ্যেই বিচিত্র কণ্ঠে পাশের ঝোপে শেয়াল ডেকে উঠলে কুসুমের গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে যায়।

গায়ক মুখ তুলল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, বেবাকেই আমারে এমুন চাপ দিল, আমি কি মানুষ না? আমারে এমুন ব্যবহার করল? ঝোপের শেয়াল একলাফে ঝুপড়ির কাছে চলে এসেছে। কি এক মচমচ শব্দ। কুসুম তার চামড়া দিয়ে অনুভব করে, বেড়ার ফাঁকে দুটি চোখ শত শত চোখে রূপান্তরিত হয়েছে। এর মধ্যে জলে ডুবে যাওয়া ছেলে দুটোর মাথা এমন ভুস করে ভেসে ওঠে যে, কুসুমের সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়।

সে বলল, আফনে আমার স্বামী। আইজ থাইক্যা আমি এইডাই বুঝি, আর

কুনো পরপুরুষের কাছে আমি যাইমু না।

গায়কের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠল। কুসুম দাঁতে দাঁত চেপে ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, আফনে কি ডরাইলেন?

ভিক্ষুক গায়ক অদ্ভুত দৃষ্টিতে কুসুমকে দেখল। পরক্ষণেই চোখ চলে গেল শত আস্তর পড়া ভাঙা ঘরটির দিকে। তার হতবিহ্বল মুখ থেকে কোনও শব্দ আসল না।

আফনে গান জানেন, ত ভিক্ষা করেন ক্যান?

আমি গান বেইচ্যা খাই, ভিক্ষুকের কণ্ঠ দৃঢ় হয়ে উঠল।

এইডা কি ভিক্ষা করা অইলো? কুসুম ফিসফিসান কণ্ঠে বলল, আমি নক্‌শি খেতার কাম জানি।

ভিক্ষুক গায়কের পাতলা দেহ বাঁশপাতার মত কাঁপতে থাকে।

রাত গভীর হয়। এরপর কী এক প্রচণ্ড জেদে, কী এক উদগ্র কান্নায় কুসুম নতুন শাড়ির আঁচলের ঝাপটায় দপদপ জ্বলতে থাকা কুপির শিখা নিবিয়ে দিল।

করুণ শঙ্খের মতো

সন্তোষ কুমার ঘোষ

আদালত থেকে বেরিয়ে এসেই নন্দিতা একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল। যেন বাড়ির গাড়ি ওর অপেক্ষাতেই ছিল। কপাল ভালো। কতটা ভালো, যেন সেইটে পরখ করতেই নন্দিতা ছোট্ট রুমালটায় তার কপালটা মুছে নিল। এত লোক এত চোখ, গা শিরশির করে। চালাও ট্যাকসি, যত তাড়াতাড়ি পারো, আমাকে এই মানুষের বন থেকে উদ্ধার করে ছুটে চলো। মানুষের বন, না বনমানুষের, রুমালটায় শুধু ঘাম নয়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিরও ছোপ। যে জল তার চোখে থাকার কথা, তা যেন জায়গা বদলে কপালে লেগেছে। রুমালটা ছোট্ট হলে কী হবে, ভারি দুষ্টুও। তুই ঘাম আর বৃষ্টির ফোঁটা মুছে নিবি, এই না কথা ছিল? অথচ দ্যাখো সিঁদুরের দাগটাও মুছে নিল। নকল সিল্কের বনাতটা লালে লাল। যে রক্ত নন্দিতার বুকের ভিতরে গোপনে, তাকে বাইরের বাতাসে একেবারে উতাল করে দিল। লোকে ভাববে কী?

ট্যাকসিটা মিটার ডাউন করেছিল। ড্রাইভার উৎসুক মুখে তাকিয়ে। বুকের ভিতরে ছপছপ আওয়াজ, নিজের কানে নিজেই শোনা যায়। যেন কেউ তার শাড়ি শায়া জামা থপথপ করে কাচছে। নন্দিতার হৃদয় (এই নামে কিছু আছে কি? কখনও এই চরাচরে কোথাও ছিল কি?) কলতলা হয়ে গেছে। কোনও রকমে চাপা গলায় সে খালি বলতে পারল, যোধপুর পার্ক। আর দেরি নয়, হে ট্যাকসিওয়ালা দয়া করে দাঁড়ালে যদি, আর একটু দয়া করো। পার করে দাও এই পথটুকু, যত তাড়াতাড়ি পারো, তত।

তার কারণ সে ইতিমধ্যে অনেক না-চেনা চোখের মধ্যে এক জোড়া চেনা চোখ দেখতে পেয়েছে। বিরামের। বিরাম এখনও আদালতের বারান্দায়। নামেনি, হয়তো বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে। নামেনি, তবু অপলক তাকিয়ে আছে। সিঁদুর জলে মাখামাখি রুমালটার আড়ালে থেকে নন্দিতা সব দেখতে পাচ্ছে। চোখ তো নয় যেন মিটমিটে দুটি আলো। রাত্তিরে বেড়ালের চোখ যে রকম জ্বলে, কতকটা সেই রকম। বিরামের চাউনিটা তীব্র না বিষণ্ণ, ভালো করে পরখ করার সাহস নেই নন্দিতার। সময় ও নেই। ট্যাকসির চাকা যখন গড়াতে শুরু করেছে, ভিড়ের

মধ্যে তার ভেঁপু যখন চারপাশের সব চ্যাঁচামেচিকে চাপা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে, নন্দিতা তখন, এতক্ষণে এই প্রথম, বুকের ভিতরটা ফাঁকা আর ফাঁপা করে দিয়ে শ্বাস ছাড়তে পারল।

রুমালটা তো রক্তে আর কান্নায় মানে সিঁদুরে আর জলে গোল্লায় গেছে, তাই তুলে নিল আঁচলের একটা কোণ। আরও একবার মুখটা মসৃণ ভাবে মুছে ওই আঁচলটাই গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসল।

বিরামের চোখে কষ্ট ছিল, না ধিক্কার বা তিরস্কার, সেটা যাচাই করে নেওয়াই হল না। পালাতে হবে যে, এক্ষুনি, এক্ষুনি। এই লোকজনের কাছ থেকে, বিশেষ করে একটি লোকের অদ্ভুত দৃষ্টির কাছ থেকে। কিংবা কে জানে, নন্দিতা হয়তো নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে। এই মুহূর্তে।

বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে অবশ্য অনেক মুহূর্তই কাটল। মিটারে কত উঠেছে না দেখেই নন্দিতা একহাতে বাড়িয়ে দিল একটা দশ টাকার নোট, আর এক হাতে দরজা খুলে তড়বড় করে নেমে গেল।

সেই বাড়ি, সেই তরতর সিঁড়ি। চাবিটা ব্যাগে ঠিক খোপেই আছে, দরজার ফোকরটাও যথাস্থানে। কিছু হারায়নি, বা স্থানচ্যুত হয়নি। আবার কিছুই যেন যথাপূর্ব নেই। তখনও শেষবেলা সন্ধ্যার কোলে মুখ গুঁজে মূর্ছা যায়নি, তখনও অন্ধকার দিনের রোদের রেশটুকুকে করেনি আত্মসাৎ। বাড়ির বাইরের মহা নিমগাছটা ঝিরঝিরে জল আর হাওয়া ঝরিয়ে দিচ্ছিল। একটুখানি আকাশ জানালার কাঁচের ফাঁকে, বাইরের রাস্তায় ক্বচিৎ একটা গাড়ির পোড়া পোড়া গন্ধ, কখনও বা রিক্সার ঠুনঠুন ছন্দ।

মেঘলা দিন, তাই বিকেলটাকেও সকালের মতো লাগে। মুখ ভারী, তবু করুণ হলেও মনোরম। অভ্যস্ত হাতেই সুইচ টিপে নন্দিতা ঘরটাকে আলোয় আলো করে দিল। তখন আলনার শাড়ি, দেওয়ালের ফটো আর আয়নাটা ওকে দেখতে পেল। যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। অথচ থেকেও নেই। যে শূন্যতা বাইরের আচ্ছন্ন আকাশে সে শূন্যতার ছায়া নন্দিতা তার অন্তরেও অনুভব করছে। নেই নেই, সে নেই, কেউ নেই কিছু নেই। নেই থেকে কিছু হবে এই আশাতেই নন্দিতা তাড়াতাড়ি সংলগ্ন চানের ঘরটায় ঢুকল। যেন সেখানকার শ্যাম্পু, সুগন্ধি তেলের শিশি আর সাবানের মৃদু সুবাসে সে তার পুরানো হারানো সত্তাকে ফিরে পাবে। চানের ঘরের আয়তন ছোট বলেই বোধহয় এত আরাম, এত অভয় স্বস্তি। মাথার উপরে ঝরনা। ছিপি খুলে দিতেই তার ঝরঝর আদর নন্দিতার সমস্ত শরীর ধুয়ে দিতে থাকল। কার স্পর্শ? তার মায়ের? সে কতদিন আগেকার কথা? মাকে ছেড়ে এই বাড়িতে এসে উঠেছে অন্তত বছর ছয়েক আগে। আর মা তাকে—সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন কবে যেন, কবে যেন? সেও কম না বছর তিনেক হবে। দিন তারিখ সাল এখন আর মনেও পড়ে না।

তোয়ালে দিয়ে যখন গা রগড়াচ্ছে নন্দিতা, কার ছোঁয়া? তার স্বামীর? সেও তো হারানো। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে এই তো মোটে আধঘণ্টা আগে নন্দিতা পুরোনো বাড়িটাতেই ফিরে এল। বিচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ। আঃ, এতক্ষণে যেন সব জুড়োল। ছড়ায় বলে, খোকা ঘুমোল। কোনও ছড়ায় কিন্তু খুকী ঘুমোল বলে না। বলবে কেন? আমি তো খুকী নই ; আমি অনেকদিন ঘর করা নারী।

বিরামের সঙ্গে যতদিন ছিলাম, ততদিন আমার একটা নাম ছিল হয়তো। কিন্তু আমি যে আমি এই কথাটাও কি বোঝা যেত? শুধু যুক্ত ছিলাম এইমাত্র। কে জানে, সব বিবাহিতা মেয়ের আর একটা নাম হয়তো সংযুক্তা। আমি নেই, সে আছে। অথবা তার ছায়া হয়ে আমি আছি। কিন্তু যদি এমন কোনও সাজানো বাগানে আর একটা ছায়া পড়ে? তবে তো এই ছায়া আর একটা ছায়ায় ঢেকে যাবে!

আমি এখন আমি। শেকড় নই। ছায়াও নই, আমি রক্তমাংস মজ্জা মিলিয়ে কায়া। স্বাধীন। বেশ তবে তাই হোক, এবার সেই কায়ার বুকের ভাঁজে একটু সেন্টের সুগন্ধ ঢালি না। দরাজ হাতে স্প্রে করলে এই আমি ভুর ভুর হয়ে যাব। কিংবা কস্তুরী মৃগের মতো 'ম'। রক্তের রং তো ঢাকা যায় না! গন্ধটা যদি ঢাকা পড়ে।

নন্দিতার মগজে একটা ঝিমঝিম আবেশ নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল, স্নায়ুর সংবেদনশীল কেন্দ্র থেকে যত শিরা আর উপশিরা রঙে রঙে চিৎকার করছিল। নন্দিতা জামাটার নিচের বন্ধনী আরও আঁটসাঁট বোতাম টিপে শক্ত করে দিল। এই নিচেকার জামাটাই তো সবচেয়ে নিচের নয়, তার তলাতেও আছে পরতের পর পরত, আছে মসৃণ ফর্সা চামড়া। সেই চামড়ারও নিচে? কে জানে কোথায় লুকিয়ে থাকে মন। মনেরও স্তন আছে কিনা আজ পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী দার্শনিক সে কথা জানাননি। থাকলে মনকেও ব্রা পরানো যেত। দূর, যাকে লাগাম পরানোই শক্ত তার আবার বক্ষ-বন্ধনী। তবু নন্দিতা ভাবল, বাইরের বুকে একটা বাঁধন থাকলে ভিতরের বুকটাকেও বুঝি বেঁধে আটকানো যাবে। যেমন স্ফীত কিছু সুডৌল মাংসপেশী, তেমনই অনুভূতি। শারীরিক স্ফীতিকে যদি শিকেয় তুলে তুঙ্গ করা যায় তবে মানসিক উচ্ছ্বাসের জন্যেই বা কোনও দড়াদড়ি, ফিতে হুকটুক নেই কেন?

আসলে খুবই কষ্ট হচ্ছিল নন্দিতার। সেটাকে ঢাকতে যত সেন্ট আর পাউডার। আচ্ছা বিরাম আজকেই আদালতের বারান্দায় ওভাবে তাকিয়ে ছিল কেন? তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, নন্দিতার এতক্ষণে মনে পড়ছে, একটা পাকা বটফুল টুপ করে স্যাঁতসেতে মাটিতে পড়েছিল, শিরীষ গাছটার ফুলের রোঁয়া উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়েছিল তার গলায় আর ঘাড়ে। কার ছোঁয়া, কিসের? সে জানে না। শুধু দৌড়ে এসে ট্যাকসিতে বসেছে। ট্যাকসিটার স্পিড় ছিল অন্তত ষাট সত্তর কিলোমিটার।

কিন্তু বিরামের সেই চোখ আর চেয়ে থাকা? তার স্পিড কত? যেন আরও বেশি। যেন সিঁড়ি-টিড়ির বাধা মানেনি, ধাওয়া করে এসেছে এইখানে, এই ঘরে, এত দূরে। শুধু তাকানোও যে একটা কুকুরের মতো অনুগত অনুসারী হতে পারে নন্দিতা আগে জানতো না তো! ওই দৃষ্টি এখন লকলকে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। তা হাঁপাক না! নন্দিতার সারা শরীর আর সত্তাকে এত করুণ লেহন করছে কেন?

কথাটা নন্দিতা ড্রেসিং আয়নাকে জিগ্যেস করল। আবার কপালে বড়ো করে পরল সিঁদুরের টিপ, যেটা ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে খানিক আগে মুছে তাকে অধবা করে দিয়েছিল। নির্ভুল কাচ তাকে দেখিয়ে দিল হাতের শাঁখা জোড়াও। নন্দিতার ঠোঁট একটু বেঁকে গেল। সোনা দিয়ে বাঁধানো হোক না, শাঁখা জোড়া ভেঙে দিলে বেশ হত। যাদের স্বামী মারা যায়, তাদের নোয়া লোকে নাকি খুলে নেয়, শাঁখা ভেঙে ভাসিয়ে দেয় জলে! আর যাদের স্বামী চলে যায়? তাদের শাখার কী গতি হয়, নন্দিতা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারল না।

ইচ্ছে করলে এই তো আমি সিঁদুরের টিপটা ফের মুছতে পারি। সিঁথির লাল দাগটা তো কত কালই নেই? বুকের ভিতরের রাস্তা দিয়ে সরু কোনও লাল যন্ত্রণার আলপথ চলে গেছে কিনা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিতা একটা আঙুল ছুঁইয়ে সেটা পরখ করতে চাইল।

এ কী অদ্ভুত ব্যাপার সে ভাবছিল। গিয়েও যে যায় না, সব শেষ হলেও পিছু পিছু পা টিপে আসে! কুকুরের মতো যার জিভ শুধু হা হা শ্বাস ছাড়ে। জিভ আছে অথচ লালা নেই, তাকানো আছে, কিন্তু সেটা তাড়া করে না, নন্দিতা এই অসম্ভব অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিতে পড়ে তোলপাড় হতে থাকল।

ঠিক তখনই সিঁড়িতে শোনা গেল ঠক্ ঠক্ জুতোর শব্দ, আমি জানি তুমি কে, আমি জানি এই পায়ের আওয়াজ কার। তোমার পায়ে পড়ি এক্ষুণি এসো না, অন্তত মিনিট দুই সময় দাও আমাকে। সামলে নিতে। ভেবে নিতে। যা ছেড়ে এলাম কিংবা যা আমাকে ছেড়ে গেছে। গঙ্গার ঘাটে কখনও যাওনি? সেখানে পুণ্যবতীরা সবাই ডুব দেয়। পাপবতী আমি, আমিও একটুখানি সময়ের জন্যে আগেকার জলে একবার শেষবার ডুব দিয়ে দিতে চাই। কয়েকটা মিনিট শুধু। ভিক্ষে করছি। এই শাঁখাটা বড্ডো ঢলঢলে লাগছে যে। সিঁদুরের এই ফোঁটাটা দরকার হয়, না হয় আবার মুছব আবার আঁকব—এবার যে আসছে সেই তোমার জন্যে।

একটু সময় দেবে? ধরো আমি যদি ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিই? আগেও কত রাত্তিরে দিয়েছি। তখন বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, অথচ ভিতরে, সারা শরীরে ফটফটে ছটছাট আলো। জ্বলে জ্বলে। জ্বলত জ্বলত। তোমার বুকের গন্ধ পাই না কেন? আমি চাপা হাসতাম সেই অন্ধকারে। আরও চাপা গলায় বলতাম, পাও না? বিরাম বলত, না। বলতাম, কেন এত যে আতর মাখলাম! সে বলত, সে তো কেনা! বলতে বলতে খামচে ধরত, আমার ঠোঁট, ঠোঁট ছাড়িয়ে জিভ

চুষে শেষ করে দিতে চাইত। অন্ধকারে গাঢ় গলায় বলত, কেনা জিনিস তো চাই না। বলেছি, তবে? সে বলেছে, শুধু পেতে চেয়েছি, পেতে চাই।

আরও কত কত রাত, যখন আমার বুকের উপরে বলতে কি পায়ের নখ থেকে কপাল, আমার কপাল পর্যন্ত একগাছি সুতোও নেই, আমি মাঠের মতো, আকাশের মতো ব্যাপৃত, আমি উদ্‌লা, তখন সে আমার শরীরের অন্ধিসন্ধিতে কী জানি, কোন্ গন্ধ খুঁজতো। খুব নিচু গলায়, খুব উঁচু হয়ে বলতাম, কী খুঁজছো তুমি, কী চাও?

পায়ে পড়ি হে সিঁড়ির ধুপধাপ শব্দ, হে সময়, আমাকে আর একটু সময় দাও। সব কথা নিজেকে বলে বলে খালাস হয়ে যাই, যেভাবে এক্ষুনি যদি ফের বাথরুমে যেতাম তবে আয়নাটার কাছে মনের সব চাপ আর তাগিদ হালকা করে দিয়ে আসতে পারতাম।

বিরাম সেই গন্ধভরা অন্ধকারে বলেছে, কোথায় তুমি? আমি বলেছি, এই তো। মায়েরা যেভাবে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায় সেই গলায়। বলেছি, দ্যাখো তো, আমার বুকের একটুও আড়াল নেই! সে মানতো না। সে কি বুকের ভিতরে আরও কোন বুকে আব্রু আছে কিনা সেইটাকে খুঁজতো? তাকে ছিন্ন ভিন্ন আর উদভিন্ন করে দিতে চাইত?

জানি না, আমরা তো জানি আমরা যা আছি তাই। আমার ভিতরে আর একটা যে আমি একেবারে খোলামেলা ; বুকের তলায় আরও একটা বুক যে থাকতে পারে কখনও ভাবিনি। তাই নানা সুগন্ধি দিয়ে ওকে ঠেকাতে চাইতাম। কে জানে, হয়তো ঠকাতাম নিজেকেও।

রাস্তার একটা টিমটিম আলো মাঝে মাঝে ওই অন্ধকারকে জেব্রা করে দিত। বিরাম আমার খোলা আর খালি শরীরটাকে পাগলের মতো কাছে টানতো। বলত, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে খালি বলত, আমি তোমার ভিতরটাকে জানতে চাই। আমি তো গা এলিয়ে, সমস্তটাকে ঢিলে করে দিয়ে শুয়ে আছি। বলেছি, যা জানবার জেনে নাও তুমি। সে বলত, প্রবেশ করব। বোকা ছেলে! একটা সিন্দুকের ডালা যদি বা ঘামে চিটচিটে হয়ে কেউ দু হাতে টেনে তুলল, তার পরেও ভিতরে যদি চকচকে কোনও সোনা দানা মোহর না দেখতে পাওয়া যায়? শরীরের দশাই তো এই। সে শেষে যেতে পারে না, শুধু শেষ হয়ে গিয়ে হাঁপায়। সেই কুকুরের লকলকে জিভ। অশেষের ঠিকানা পায়নি বলেই বিরাম রোজ বলত, রোজ রোজ বলত আর বলত, কী? না লাগছে। কোথায়? আমি বলতাম। তখন আমিও ইঁদারার মতো টলটলে হয়ে গেছি, বিরামের মুখ আমার উন্মুক্ত বুকে, বলতাম, সব তো খুলে দিয়েছি, তবু পারছো না? এ-যেন দস্যুর হাতে চাবি তুলে দিলাম তার পরেও সে ধন-দৌলতের কোনও ঠিকানা পেল না।

বিরাম তুমি সেই দস্যু। কেন ফিরে ফিরে নিচের ঘরে, কেন কোনও মন্দিরের গর্ভগৃহে নিবিষ্ট প্রবিষ্ট সাষ্টাঙ্গে লিপ্ত হয়েও বলছ, লাগছে? কি সে বিরাম, কী সে? কোথায় বলতো কোথায়? সারা গায়ে কিছু তো নেই, দেখছ না আমি এখন নির্বাস, আমি শুধু আমার নির্যাস। আছে শুধু শাঁখাজোড়া। তাতেই কষ্ট? সেইটাকেই তুমি বলছ, লাগছে? ওই একটুখানি বেড় কি বেড়া হয়ে যায়?

জানি না, ভাবতে পারছি না, সময় আমাকে আর সময় দিচ্ছে না। ধপধপ জুতোর শব্দ, এখন একেবারে দোরগোড়ায়। কলিং বেল বাজছে।

* * *

নন্দিতা জামা কাপড় গুছিয়ে সংবৃত হয়ে গেল। সাড়া দিল মানে দরজাটা খুলল। আমি জানতাম অনুপম তুমি আসবে। বাঃ তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে তো। তোমার জন্যেই তো নন্দা, তোমার জন্যেই। আমার মনের কথাটা যদি পড়তে পার তবে পড়ে নাও। আজকে এই সময়টায় লোডশেডিং হলে কী দারুণ হত বল তো? জিজ্ঞেস করার দরকার কী অনুপম। সব লোড শেড করেছি বলেই তো আমরা দুজন এখানে আজ মুখোমুখি হয়েছি। ষ্ট্রেচলনের ট্রাউজার পরে তুমি তৈরি, আমিও তাই নাইলনের শাড়ি সারা শরীরে জড়িয়ে। এসো সব ছাড়িয়ে যা কিছু আমাদের ছড়িয়ে আছে সব বাধা এড়িয়ে, এসো। জানি এরপর কী? তুমি যদি তৈরি থাকো তবে আমিও তৈরি। কপালের টিপটাকে ভালো লাগছে না? আমার জন্যেই পরেছ? ভালো না লাগলে মুছে দিও। চুমু দিয়ে জিভের ডগা দিয়ে। আজকেও তুমি এই সব কথা বলবে নন্দা? তোমার কথা কেমন যেন কাটা কাটা। দূর আমি সব হাত বুলিয়ে মিলিয়ে দেব।

আমি নন্দিতা। বিরামের চাকরিটা হঠাৎ কেন গেল বলতো? কেন তুমি তোমার অফিসে আমাকে একান্ত সচিব করে নিলে? আমার যে এক, তার যে তখনই অন্ত হয়ে গেল। স্বামীর কাজ নেই, আমার কাজের উপরে একটা ডবল কাজ মিলল। অনুপম, হে সম্রাট তুমি মহানুভাব।

নন্দিতার এই সব মনোগত কথা অনুপম শুনতে পায়নি। সে বানানো কোনও নাটকের চরিত্রের মতো বানানো কোনও সংলাপ শুনছিল। তার কানে ভাসছিল, আমি, এই অনামিকা, এখন সব খুলে দিতেই রাজি। যে ভাবে দরজাটা খুললাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। জানতাম তুমি আসবে। তাই তো একটু আগে বাথরুমে গিয়েছিলাম। কেন বলতো? আমার সমস্ত পুরোনোকে ধুইয়ে ঢেলে দিলাম। আর নতুনের জন্যে নিজেকে ছিমছাম তকতকে করে তুললাম। এক ঢিলে দুই পাখি। মেয়েদের মন যদি বা দুমুখো সাপ হয় তাদের শরীরটা শান বাঁধানো মেঝের মতোই। কোনও একজন পা ফেলবে এই জন্যেই তারা মসৃণ ধৌত তৈরি।

আচ্ছা অনুপম, তুমি খেয়ে এসেছ? রাত্তিরের খাওয়া? খাইনি নন্দা। তোমার নন্দা মানে এই নন্দিতা বলছি, তোমার চোখ দুটো এরকম ধূসর কেন? চোখকেই

কি তোমার ভয়? না, তাও নয়। যখন তোমার একান্ত সচিব হলাম, তখন ছুটির পরে দুটো চোখ ছুটে ছুটে আমার পিঠের জামা ফুঁড়ত। আজকেও জানো, অন্য দুটো চোখ ধাওয়া করেছিল, যে চোখ দুটোর মালিকের সঙ্গে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আচ্ছা, পুরুষের চোখ কি শুধু ধাওয়া করে? চায় চায় আর যায়? আবার বলি আচ্ছা বিচ্ছিন্নতাবাদ কি একেই বলে? একটা মেয়ে কখনও একাকী কি কোনও দ্বীপ হয় বা হতে পারে? কী বললে, কী বললে তুমি? আমি তো আছি। নাটক হলে এখানে নায়িকার সংলাপের আগে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত 'মৃদু হাস্য'। সে সব থাক আবার বলো, খেয়ে এসেছ, না খাবে? আমরা দুজনেই খাবো নন্দিতা, আমার নন্দা। এসো, আলোটা নিবিয়ে দিই।

কোথায় গেল স্ট্রেচ্‌লন কোথায় বা নাইলন? কিছু নেই, কিচ্ছু নেই। তার সমর্থ উরু কদলী কাণ্ডের মতো প্রকাণ্ড হয়ে গেছে, একটি পুরোনো পরিচিত বিছানায় আরও দুটি পা আর হাত হঠাৎ যেন অক্টোপাস, আতুর নিশ্বাস।

ওরা ডিনার খাচ্ছে।

তবু নন্দিতার শরীরে মনে কী যেন? কেউ ছিল এখন নেই। সেই স্মৃতি। পুরুষ। কেউ তাকে অবধারিত খুলতে চাইছে। পুরুষ।

পুরুষেরা জানে না কেন যে, খোলা মানেই মেলে দিতে পারা নয়। বোঝে না কেন প্রথম দ্বিতীয়ের পরেও তৃতীয় কোনও পুরুষ থাকতে পারে, তার নাম নেই, মুখ নেই, সে অতি-অতীত পূর্বতন কোনও ক্ষণ। সেই তৃতীয়টি এই মুহূর্তে নন্দিতাকে উন্মথিত উন্মোচিত করছিল। অনুপম তাকে বিগলিত গলায় বলল, আমাদের মধ্যে আর কিচ্ছু নেই। দারুণ, তাই না? এই সময়টার জন্যেই আমরা কতদিন ধরে বসেছিলাম বলো তো?

নন্দিতা মনে মনে হাসল। সেই হাসাটাই নির্বাক বলা ঃ বসাটা শোয়া হয়ে গেল, তাই বলছ দারুণ, তাই না?

"ভীষণ ভালো লাগছে," অন্ধ-বন্ধ শ্বাস ছেড়ে গাঢ় কুয়োর তলা থেকে অনুপমের গলা ভেসে এল। সে বলল, "তুমি কিন্তু কিছুই বলছ না।"

"ভালো লাগছে আমারও," সারা শরীরে সাড়া দিতে দিতে নন্দিতা আস্তে আর স্তিমিত, বলল।—"ভালো লাগছে, কিন্তু একটু লাগছেও।"

ব্যথা দিচ্ছি? অনুপম বোকা বোকা গলায় বলল।—কোথায়? উত্তরে শুনল, জানি না। মরিয়া হয়ে বলল, শরীরে? তখন তীব্র চীৎকার করে উঠল নন্দিতা। হাত দুটো শূন্যে তুলে বলল, তোমার লাগছে না অনুপম? আমার কিন্তু লাগছে। দ্যাখো, এই দুটোতে।

নন্দিতার রোগা কব্জিতে পুরোনো একজোড়া শাঁখা অন্ধকারে সাঙ্ঘাতিক শাদা হয়ে জ্বলতে থাকল।

জ্যোৎস্নায় শঙ্খচিল

কিন্নর রায়

রোজ সকালে যেমন হয়, আজও তেমনি একতলার ঘরে কাচের শার্সিতে টক টক টক টক শুনতে পেয়েছিল সজল। শক্ত, ধারালো ঠোঁট দিয়ে কাচে আওয়াজ করলে প্রতিদিনই তো এমনই হয়, আজও সেভাবেই সজল চক্রবর্তী ঘুরে শুল। আর শীতে দু-পায়ের পাতা বড্ড তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়, তার জন্যে আমি বেশ কষ্ট পাই, কম্বলের তাঁবুর বাইরে সেই পাতাজোড়া ছিটকে গেলে গোটা গায়ে শিরশির শিরশির—উঃ মা, রে! তেতাল্লিশের সজল কম্বল-ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া দু-পা ছাউনির ভেতর এনে ওঠার তোড়জোড় করবে কি না ভাবছে, তখনই দেয়ালের ইলেকট্রনিক কোয়ার্জ ঘণ্টার শব্দ তুলে জানিয়ে দিল এখন বেলা সাতটা।

কাচের বন্ধ জানলায় আবারও ঠোঁটের টোকা। চারপাশে আলো ফুটলেই একজোড়া গম্ভীর কাক—সজল তাদের নাম দিয়েছে টুলু আর বুলু—বিস্কুট চাইবে, ঠোঁট দিয়ে শব্দ করে করে।

একতলায় এই বারো বাই পনেরো ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আটকানো শার্সি চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রায় ফুরিয়ে আসা ডিসেম্বরের রোদ সোনার ঢেউ হয়ে বিছানা ভাসাচ্ছে। পড়ার টেবিলে একফালি রোদ্দুর। কালরাতে কটায় ফিরেছি প্রেসক্লাব থেকে বাড়ি! এগারোটার পরে, কিন্তু কত পরে! আমি তো হাতে ঘড়ি বাঁধা ছেড়েছি 'মর্যাদা গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস' ছাড়ার পর। সেও তো সাত বছর হয়ে গেল।

বিছানায় কুঁকড়ি-মুকড়ি হয়ে শীতের রোদের যে আবছা ভাপ তা কেমন এক আরাম হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল সজলের গায়ে। আর কালরাতে আবারও স্বপ্নে চিনি মাসিকে—সেই উধাও দামোদরের বালি জল জল বালি। হাওড়ার আমতার কাছে রসপুরে আমাদের বাড়ি, সেখানে এই শীতে সর্ষে ফুলের হলুদ মাঠ, তখনো শীতে আই আর এইট-এর বীজতলা হয় না সর্ষে খেতের গায়ে। পাশের সবুজটুকু তাই অন্যরকম। হয়তো পালংশাকের, নয়তো ধনেপাতা বা মটরলতার, মাটি, নদী, বালি, আকাশে চাঁদ। শীতে রোগা দামোদর শুয়ে থাকে।

চিনিমাসি কাল রাতে স্বপ্নে ছিল, একটু একটু মনে পড়ছে সজলের আর নিমাইকাকা। শীতে বড় বড় বস্তায় বাঁধা লেপ নামানো হত, ঘরের মাথায় পোঁতা

হকে লেপের বান্ডিল। বিশাল বিশাল কাঠের তোরঙ্গের ভেতর লেপ-তোশক। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম নিমাইকাকা টেবিলের পিঠে একটা চেয়ার ফেলে তার ওপর উঠে লেপ পাড়ছে। মালকোঁচা মারা আঁট ধুতি। মিলের। সরু, কালো পাড়। গায়ে বাবার একটা বাতিল কোট। কালো রঙের। নিমাইকাকার ফরসা ফরসা পা। তাতে কালো, গভীর কালো কোঁকড়ানো লোম। পায়ের ডিমে ঝলমলে স্বাস্থ্য। দু-পায়ের বুড়ো আঙুল, পাতায় ভর দিয়ে দিয়ে নিমাইকাকা লেপের বস্তা পাড়ছে। নীচে দাঁড়িয়ে চৈতন্যকাকা। বাবাদের সাত ভাইয়ের পাঁচ নম্বর। বাবা তিন। নিমাইকাকা চার।

কাঠের পুরোনো কড়িতে আলকাতরার কালো। বরগাতেও গঙ্গাজল মার্কা আলকাতরার পোঁচ। ইংরেজিতে যার নাম কোলতার, এখনও মনে আছে সজলের। চুন-সুরকির পেটাই ছাদের টালি বালি চুনের পলেস্তারা, তার ওপর চুনকামের কারিকুরিতে তেমন আর নজরে পড়ে না। নিমাইকাকা ডিঙি মেরে মেরে কড়িবরগার প্রায় গায়ে লেগে থাকা মোটা লোহার আংটা থেকে শণের পুরুষ্ট দড়ি বাঁধা চটের বস্তা নামাচ্ছে। তার ফরসা, লোমওলা পায়ের আভাস, স্বাস্থ্যবান কাফ্ মাসলের খানিকটা—সঙ্গে চৈতন্যকাকার উদ্বেগলাগা গলায়, ন-দা সাবধান। চেয়ার কিন্তু নড়ছে—এসবই স্বপ্নের ভেতর কোনো সিনেমা হয়ে সরে সরে যাচ্ছিল। আর তখনই ওই স্বপ্নেরই ভেতর একটু দূরে চিনিমাসি। গায়ে সাদা থান। আঁচলেই আঁট পাট করে গা ঢাকা দ্রুত চলে গেলে নিমাইকাকা লেপ নামাতে নামাতে কেঁপে উঠল কি! আর তখনই চিলের ডাক শোনা গেল। আকাশ চিরে শঙ্খচিলের ডাক। তেমন দুপুর নয় তখন। হাওড়ার বাড়িতে ঘড়িও তো একটাই। লেপ রোদে দেয়া হবে আজ। পৌষ মাস গেল। মাঘ ছাড়া তো গায়ে তোলার নিয়ম নেই।

আবারও ডাকল শঙ্খচিল। আর তখনই ঘুমে, কিংবা ঘুমে নয় এমন একটা আবছা ঘোরে থাকা সজল তার পা বেরিয়ে গেছে কম্বলের বাইরে আরো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, এমন একটা এলোপাথাড়ি অবস্থায় নিজেকে গুটোতে চাইল। ঘুমের ভেতর শঙ্খচিল ডাকছিল। আর এখন কাকেদের ঠোঁট ঠোকাঠুকিতে ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর কুড়িমুড়ি দিয়ে বসে খানিকটা কম্বল গায়ে পায়ে পিঠে তাঁবু করে এনে সজল শার্সির বাইরে আবছা ছায়ার নীচে দুটো কাক দেখতে পেল। কাকেরা জানলা খুলতে বলছে।

এখন আমি কী করব? সজল নিজের কাছেই নিজে জানতে চায়।

আমি এখন ছিটকিনি খুলে দরজা পেরিয়ে বাথরুমে যাব। তারপর এক কাপ, গরম এক কাপ চা। সঙ্গে দুটো বিস্কুট। দুটো বিস্কুট টুলু আর বুলুর জন্যে। মা রোজই দেবে।

ও খোকা, খালিপেটে চা খাস না বাবা—তোর দু-বার জন্ডিস—একটু সাবধানে থাক।

কাল প্রেসক্লাবে সমীর বলছিল ধরে খেতে। আস্তে আস্তে। সমীর এখনও 'মর্যাদা'-তেই। ও সমীর, টক টক করে তিনটে হুইস্কি নিলে আমি তো কত কিছু মনে

করতে পারি। এই ধরো না, তখন আমি তো তোমাদের 'মর্যাদা'-তেই, সিনিয়ার রিপোর্টার। আমায় ফ্রান্সে পাঠাল অফিস। ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড। জার্মানি।

জাঁ পল সার্ত্র-র কবরে এখনও জানো তো টাটকা ফুল রেখে যায় কমবয়েসীরা। ছাত্র-ছাত্রী। গবেষণা করা মানুষ। তেমন দামি ফুল নয় হয়তো। কিন্তু রোজ থাকে কমবয়েসীদের ফুল।

আচ্ছা এই ধরো শীতে লন্ডন—খুব আস্তে হুইস্কি সিপ করতে করতে সমীর জানতে চাইছিল।

খুব ইন্টারেস্টিং জানো—লন্ডনে তো এমনি অনেক গাছ। নানারকম পাখি। ঘুঘু জাতের পাখি। কাক—দাঁড়কাকই। তো শীতে জানো খুব বরফ পড়ে। রাস্তা, গাছের মাথা, বাড়ির সামনে ছাদ—সব সাদা বরফে বরফ। বলতে বলতে আরো একটা নিট হুইস্কি, মানে এক পেগ—শরীরটা কেমন নাড়াঝাড়া দিয়ে উঠল।

অত জোরে খেও না সজলদা। লাগবে। কিছু ফুড নাও সঙ্গে।

আমি ফুড পারি না সমীর। বড় জোর কমলালেবু দু-চার কোয়া এই শীতে। নয়তো আলুভাজা, মানে পোটাটো চিপস, হয়তো একটু ফিশ ফিঙ্গার—জানো সমীর, আমার মুখ দেখে এখন অনেকেই ভাবে আমি অ্যালকোহলিক। মদ না হলে নাকি আমার চলে না। হ্যাঁ, আমি একটু খেতে ভালোবাসি। পেলেই চুক চুক করে চালাই, কিন্তু এখন যেখানে আছি, সেই 'ভিশন' নামের অ্যাড এজেন্সির চিফ কপিরাইটার প্রিয়নাথদা মাঝে মাঝেই বলেন, সজল, তুমি কিন্তু কেন্দ্র হারাচ্ছ। অ্যাতো খাও কেন! ঠিক আছে, আহ্লাদ করার জন্যে আমরাও খাই। কিন্তু তার সময় আছে। তাই বলে যখন-তখন। আয়নায় নিজের মুখখানা কখনও দেখেছ! গোল মতন। ফুলো ফুলো। মাথাভর্তি পাকা চুল। পাকা গোঁফ। পাকা জুলপি। নিজেকে কেমন বুড়োটে বানিয়ে রেখেছ। বিয়ে অব্দি করলে না—সব জিনিসেরই একটা বয়েস আছে সজল।

আসলে উমবের্তো একোর উপন্যাসে—সজল কোথাও একটা থই পেতে চাইছিল ষাট-পেরোনো প্রিয়নাথের সামনে।

রাখো তোমার উমবের্তো একো। শরীর ঠিক করো তো আগে। শরীর না ঠিক থাকলে কিছুই পারবা না। তোমার অনেক আগে আমি 'মর্যাদা'য় চাকরি করেছি। ডেইলিতে ছিলাম। পরে ওদের উইকলিতে। তারপর সব ছেড়েছুড়ে 'শিল্প' গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস-এ। সেখান থেকে 'ভিশন'। ঘুরতে ঘুরতে আবার তোমার সঙ্গে দেখা সজল। আর এখন তোমার ঘরে মুখোমুখি বসে খাচ্ছি। তোমার মা একটু আগে স্টিলের প্লেটে টাটকা পমফ্রেট ভেজে দিয়ে গেছেন। সঙ্গে শশাকুচি। শাকসুদ্ধু নতুন পেঁয়াজ। কাঁচালঙ্কা।

আপনিই তো আমার প্রেমের গল্প পর পর ছাপেন সাপ্তাহিক 'শিল্প'-তে। দৈনিক 'শিল্প'-র সংস্কৃতির পাতায় নবীন প্রতিভা বলে দশজনের সঙ্গে ছবি।

তাদের সাত-আটজন তো আজ বাংলা বাজারে করে খাচ্ছে সজল। ধর সুখেন্দু,

হেমেন, ফল্গু, অনন্ত, বিপ্লব—আমারই প্রোডাক্ট। সাপ্তাহিক 'শিল্প'-তে তাদের গল্প। ধারাবাহিক উপন্যাস। তোমাদের দশ নবীনের ভেতর কয়েকজন পারেনি। সবাই কি পারে! তখন তুমি একটি প্রেমে আঘাত পেয়েছ। মুকেশের গান গাও।

আপনি খুব মন দিয়ে আমার গাওয়া মুকেশের গান শুনতেন। কিন্তু উমবের্তো একোর উপন্যাসে—

বললাম না পরে শুনব—বলতে বলতে প্রিয়নাথ বড় করে হুইস্কিতে চুমুক দিল। তারপর একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে বলল, বলো, তুমি কি লিখছ?

ওই বিজ্ঞাপনের কপি—মাখন, সাবান, পেস্ট, নারকেল তেল।

ও তো আমরা সবাই লিখি সজল। তুমি কি প্রেমের গল্প, কিংবা অন্য কোনো গল্প লিখছ?

আমি আপনার মতো পারি না প্রিয়নাথদা—আপনি পারেন। আর একটু মাছভাজা নিন।

আমার যা বয়েস তাতে এই হুইস্কিই ফুড।

আমি আর নেব না।

সজলদা, তুমি আর নেবে? প্রেসক্লাবের টেবিলে আর একটু ঝুঁকে খেতে খেতে সমীর সেন জানতে চাইছিল।

না সমীর।

তুমি তো গালপ্ করলে প্রথমটায়। তাতে কিন্তু কিক্—

ও হয় সমীর, কিছু করার নেই।

তুমি কি যেন বলছিলে লন্ডন!

কি যেন লন্ডন!

শীত, পাখি—

ও হ্যাঁ, শীতে বরফ পড়ে টেমপারেচার নামে। পাখিরা মারা যায়। তখন লন্ডন শহরে আমি দেখেছি, এই ধরো মিডল ক্লাস লোকজনের বাড়ির সামনেও একটা মোটা কাঠের ওপর ভর দিয়ে দাঁড় করানো হাট মতন। ছোট কুঁড়েঘর। ওই কাঠটার মাথায়। বুঝতে পারছ! তার ভেতর রাতে পাখিরা এসে বসে। খড়টড় থাকে। আশ্রয় নেয়। ওই রাতটুকুর মতোই কিন্তু তবু মরে ঠাণ্ডায়।

তবু মরে!

হ্যাঁ, মারা যায়! পাখিদের আর কতটুকুই-বা রেজিস্ট্যান্স! আর মারা যায় বুড়োরা জানো!

কেন, বুড়ো কেন?

শীতে পাখিদের তো খাওয়ার অভাব। ধর একলা থাকা কোনো বুড়ি নয়তো বুড়ো তার ভাঁড়ার থেকে গম, রুটি বা ওই রকম কিছু এনে বাইরে ঠান্ডায় পাখিদের জন্যে অপেক্ষা করে। তারপর একসময় নিজেরা—শীতে বলতে বলতে গ্লাসে বড় করে

চুমুক দিল সজল। তারপর টেবিলে ছাড়ানো কমলালেবু খোসার ভেতর থেকে একটা কোয়া এনে মুখে দিয়ে বলল, সিগারেট আছে?

ছিটকিনি খুলে বাইরে গিয়ে বাথরুম সেরে ফিরে এসেছি খাটে। সজলের মনে পড়ছিল। মা চা দিয়ে গেছে। হালকা, ফিকে লিকার। কাপের তলা অব্দি দেখা যায়। চিনি নেই। দুটো বিস্কুট প্লেটের পাশে।

টুলু। বুলু। টুলু বুলু। জানলার শার্সি খুলে দুবার ডাকা। সজলের কথা হাওয়া শুষে নিল। আর তার ছুঁড়ে দেয়া বিস্কুট নিয়ে দুই কাক—কিংবা এক কাক আর এক কাকিনী বাতাস থেকে বিস্কুট ধরতে গিয়ে পারল না। সেখানে আজ গোটাতিনেক রোঁয়া ফোলানো শালিক। কিচ কিচ ক্যাচ ক্যাচ। দেখতে দেখতে ভারি মজা। শালিকরা বিস্কুটের ভাগ চায়। খানিকটা পেলও বোধহয়। দূরের রোদ ততক্ষণে আরো কাছে। সজলের গায়ের ওপর।

আজ শনিবার। আমি দেরি করে অফিস যাব। বারোটায় লীনা আসবে। ওর আজ ছুটি। কাল ফোন করেছিল অফিসে। আমার টেবিলে তখন রবি কিচলু সংগীত ফাউন্ডেশানের যে ক্যামপেইন হবে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার পিরিওডিক্যালস আর ডেইলিতে তার কপি, ছবির ব্রোমাইড।

কাল বারোটায় আসবে, মেট্রোর সামনে!

আসব।

ভুলে যেও না।

না, ভুলব না!

লীনার কাছে যাব, তার মানে দাড়ি কামাতে হবে। গোঁফ ঠিক করতে হবে। পরিষ্কার জামা। পায়ে শু থাকলে ভালো হয়। আচ্ছা লীনা, আমি তো পঞ্চাশের দিকে ছুটছি। আর কত বছর এই পৃথিবীতে! তার জন্যে এত ফিটফাট।

যতদিন বাঁচা, ততদিন একটু থাকি না এভাবে। লীনার গজদাঁতে খুশির আলো।

মা, আমায় গরম জল দিও বাথরুমে। বলতে বলতে সজল লম্বা করে চুমুক দিল চায়ে। তাকে জাগাতে চাওয়া কাকেরা ততক্ষণে কোন দূরে উড়ে গেছে।

এই তো লীনা।

সেই পাঁচ মিনিট দেরি। মেট্রোর সামনে একলা মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকা যে কি অসুবিধের—

স্যরি। আমার ঘড়ি নেই তো। এখন ঠিক কটা বাজে বলো তো?

বারোটা সাত।

ওফ হো, সাত মিনিট লেট।

চলো একটু বসি ম্যাড্রাস টিফিনে। কফি খাই।

নাহ্, হাইকোর্ট পাড়ায় যাব।

হোয়াই?

শুদ্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—

কপালে নেমে আসা পাকা চুলের বেড়া ঠেলে পেছনদিকে সরাতে সরাতে সজল লীনাকে দেখল। বত্রিশ প্লাস। বিবাহিত। একটি সন্তান। ছেলে। বর দিল্লিতে। শোভেন ইকনমিস্ট। ছেলেকে নিজের কাছে রেখেছে। মামলা হাইকোর্টে। খুব হালকা মাখন রঙের শালোয়ার কামিজে লীনা এখন বিলো থার্টি। পায়ে আঙুল কাটা স্কিন কালার মোজা। সরু ফিতের কালো ব্যাক বেল্ট। গায়ে কালো শাল। মাথার কাটা চুলে কি এক বাহারি হেয়ার ব্যান্ড, যার কাঠের হলুদ সবুজ চোখে লাগে। আজ কি চুল ডাই করিয়েছে লীনা? নইলে এত গভীর কালো চুল, কোথাও রুপোলি রেখা নেই। ফরসা গালে মুছে আসা ব্রণর লালিমায় ডিসেম্বরের রোদ। আর সেই রোদই কখন যেন অনেকটা আলো হয়ে জ্বলে শালের গায়ে সেলাই করা গোল গোল কাচে।

কবে ডেট পড়ল?

জানুয়ারির নয়।

ছেলে কাছে থাকে না। শোভেন দত্তগুপ্ত তাকে আইনের খ্যাপলা জালে বেঁধে তুলে নিয়ে গেছে, সেই রাজধানীতে। তাই নিয়ে মামলা। আইনি প্যাঁচ। দিল্লি হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট। জলের মতো টাকা খরচ।

কাকু, তুমি ডিম ভালোবাসো? বুচান আমার কাছে জানতে চায়। কলকাতায় নভেম্বরে শীত পড়ে না। কিন্তু বুচানের ঠান্ডা লেগেছে। ১৯৯৬-এর নভেম্বর।

না, বুচান। তুমি?

বাসি তো। ডিম আমি খুব ভালোবাসি। তোমাদের ডিমটা তাহলে? ভালোবাসা না যখন।

খাবার টেবিলে আমি, বুচান, লীনা পাশাপাশি। ঘড়িতে রাত নটা। শোভেন তখনও মামলা করে বুচানকে দিল্লি নিয়ে যেতে পারেনি। গল্‌ফ গ্রিনে একটা বাড়ির একতলায় লীনার মা-বাচ্চার সংসার।

তুমি আমার ডিমটা খাবে?

আঃ বুচান, কতবার বলেছি তোমায়। অন্যের জিনিস।

কাকু অন্য কেন হবে মা—কাকু তো আমাদের—

বুচানের ফরসা গালে টিউবের হাসি। সামনের চুল ঝাঁপ দিয়েছে কপালে। দু-চোখ চকচকে। নাকটা লীনার মতো শার্প নয়। হয়তো শোভেনের। আমায় আঙ্কল বোলো না বুচান—আমি যেন কবে বলেছিলাম। কোনো এক বিকেলে কি, ময়দানে তখন সন্ধে নামছে। দূরে দূরে গাছের মাথায় দিন ফুরোনোর আলো—

তাহলে কী বলব তোমায়?

কী বলবে—তাই তো কী বলবে বলো তো—বেশ তো, কাকু বোলো—

লীনার মুখে তখন কি সূর্যাস্তের আলো লেগেছিল?

ডিমটা আমি খাব কাকু? গোটাটা দিলে?

দিলাম তো হাতে করে।

আস্তটা?

ক্লাস ওয়ানের বাংলা মিডিয়াম। এখনও আস্তই বলো—নয়তো গোটা—

ছিঃ বুচান! সেই তুমি খেলে। দুটো ডিম। শেষে রাতে পটি পেলে—

খাক না লীনা। আমরা তো ছোটবেলায় রসপুরের বাড়িতে—

আমরা ট্রামে যাব। বলতে বলতে লীনা তার কালো শাল আরও ভালো করে জড়িয়ে নিল।

কলকাতায় কি আজ বেশি শীত। নিজের হাফ হাতা নেভি ব্লু সোয়েটারের দিকে একবার আলগোছে তাকিয়ে নিয়ে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল সজল।

সেপারেশানের এই মামলা সময় নেবে। অর্থও যাবে। হাইকোর্ট পাড়ার মিষ্টির দোকানে চা-সিঙাড়া খেতে খেতে এসবই মনে হচ্ছিল সজল চক্রবর্তীর। শুদ্ধেন্দু সান্যাল তো সেরকমই বললেন। সময় লাগবে।

শ্বেতপাথরের টেবিল টপে কলকাতার পুরোনো ঠান্ডা জাঁকিয়ে বসেছিল। ভারী ভারী কাঠের চেয়ারে টিউবের সাদাটে আলো।

রসগোল্লা খাবে? লীনা জানতে চাইছিল।

নাহ্, থাক।

কেন, থাকবে কেন?

ভাত খেয়ে বেরিয়েছি।

সে তো আমিও। লীনার কথার গায়ে গায়েই ঢং করে বেলা দেড়টার ঘণ্টা পড়ল মিষ্টির দোকানের ঘড়িতে। সজলের মনে পড়ল এখান থেকে ট্যাক্সিতে অফিস যেতে তার ঠিক আধঘণ্টা লাগবে। যদি রাস্তা ফাঁকা পাওয়া যায়। এটুকু ভেবেই মৌরি মুখে পুরল সজল। ক্যাশ কাউন্টারে বসা লোকটি হাতঘণ্টি টিপে টিপে সজলদের চা সিঙাড়া কত হয়েছে জানতে চাইছিল বেয়ারার থেকে।

সমীর আজও ছিল প্রেসক্লাবে। আর দুটো খাওয়ার পর সমীর টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে বলল, জানো সজলদা, আমাদের বেহালার সারিকা জয়সোয়াল বড় চাকরি করে 'শ ওয়ালেস-এ। হঠাৎ দেখি বাড়ি থেকে বেরিয়ে 'গরুড়', 'গরুড়', 'গরুড়', বলে তিনবার ডাক দিতেই আকাশ থেকে আস্ত একটা চিল। মাইরি, গোটা চিল একখানা—একদম ডানাফানা ছড়িয়ে ধীরে ধীরে চক্কর কেটে নেমে এল—একেবারে সারিকা জয়সোয়ালের কাঁধে। বললে বিশ্বাস করবে না। বেহালা ট্রাম ডিপোর পাশে কি হেক্কড় মহিলার জানো। অত ফরসা রং। ওই হাইট। বড় চাকরি করে কাঁধে চিল। পাশে অফিস যাওয়ার লাল মারুতি দাঁড়িয়ে। বাড়ি থেকে

বেরিয়েই গাড়ির দরজা খোলার আগে 'গরুড়' গরুড়' বলে ডাক। অমনি শূন্য থেকে চিল। আবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলা যাও নাকি একটা বলতেই গরুড় আকাশে।

আর তখনই খানিকটা হুইস্কি বড় তাড়াতাড়ি নিজের ভেতরে নিয়ে সজল দু-কোয়া কমলালেবু জিভে ফেলে, মুখ সামান্য কুঁচকে একটা সিগারেট ধরিয়ে কাল শেষ রাতে হয়তো বা ভোরেই হবে ঘুমের ভেতর থেকে শোনা কোনো গানের আবছা কলি যা আর এখন মনে পড়ে না, তখনও মনে আসেনি—সকালে ঘুম ভাঙার পর, আর তারপরই শঙ্খচিলের ডাক, দামোদরের রোগা স্রোত মনে পড়ে গেল। শীতের হলুদ হলুদ সর্ষে খেত। অঘ্রাণে রসপুরে প্যান্ডেল বেঁধে বারোয়ারি কালি, সন্তোষী মা। সাদা, ন্যাংটো শিবের বুকে কালি। চার হাত নয় দু-হাত। দুপাশে ডাকিনী যোগিনী। শিব তার পুরুষাঙ্গটি জাগিয়ে রেখেছে। পাশেই কলিকাতা গ্রাম। টুনি বাল্‌বের চিকিমিকি আলো। দূরে কারা যেন পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের তোয়াক্কা না করে বাজি ফাটাচ্ছে।

ও শিব, তুমি ন্যাংটো কেন? সজলের মনে হচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে চাঁদা তুলছিল ছেলেরা। বিলে গাড়ির নাম্বার লিখে দিচ্ছিল। আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম। চৈতন্যকাকার শ্রাদ্ধে। বাবা তো কবেই নেই। ভাইদের মধ্যে একজনই বোধহয় রইল।

সিগারেটে একটা ভীম-টান দিল সজল। তার মনে পড়েছিল সরু রাস্তা। পাশাপাশি দুটো অ্যামবাসাডারও যেতে পারে না। রাস্তার ধারে বারোয়ারি। জোড়া ঢাক বাজিয়ে চান করানো কালো পাঁঠা, পুজোর অন্য জিনিস, ফুল, জবার মালা নিয়ে হাঁটছে কোনো মানত করা গৃহস্থ। কলিকাতা গ্রামের অঘ্রাণি কালিপুজোয় পাঁঠা পড়বে।

সারিকা জয়সোয়ালের চিল সমীরের কথামতো মুছে গেল বেহালার আকাশে। অথচ আমি আজ ভোরে শঙ্খচিলের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চিনিমাসিকে দেখলাম। আমাদের পুরোহিতমশাই দীনবন্ধু পঞ্চতীর্থের মেয়ে।

ঠাকুমা গল্প বলত, অনেক অনেকদিন আগে আমাদের রসপুরে একটা ঠোঁটভাঙা শঙ্খচিল, সে বাড়ির ছাদে বসে—

তুমি তো লন্ডনের পাখির কথা বলছিলে সজলদা—দাঁড়কাক, ঘুঘু। শীতে তাদের জন্যে ঘর। দ্যাখো আমাদের ইন্ডিয়াতেও কিন্তু—

আমি তো রসপুরে ঠাকুমা মানদাসুন্দরীর কথা শুনতে পাচ্ছি।—ওই ঠোঁট ভাঙা অলপ্পেয়ে চিল। যে বাড়িতে বসে সে বাড়িতেই একটা কেলেঙ্কারী।

মানদাসুন্দরীর ঠোঁটের কোণে রহস্যের চিল। যেন এখনই ছোঁ মারবে। আর আমি বছর সাত-আটের সজল চক্রবর্তী দেখতে পাই কোনো গরমের দুপুরে চিনিমাসি আকাশে ভেসে থাকা চিলটাকে দেখতে থাকে। সে কি ওই ঠোঁট ভাঙাটা? চিনতে পারি না।

এই চিনিমাসি, কি দ্যাখো?

অ্যাঁ—কোথায়?

ওই আকাশে—

কিছু না তো, বলতে বলতে চিনিমাসি আকাশ থেকে চোখ তুলে নেয়। তারপর সাদা কাপড়ে ঢাকে সারা গা। দূরে উধাও মাঠে ধুলোর আবছা ঝড় ওঠে। চিল ডানা মেলে মাথার ওপর চক্কর দিতে দিতে আকাশ ফালা করে ডাক দেয়।

গ্লাসে বড় করে চুমুক দিয়ে সজল বলল, ইন্ডিয়ানরা পাখি তো ভালোই বাসে, দ্যাখো না। বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান, পঞ্চতন্ত্র—সবেতেই পাখির গল্প—কিন্তু চিনিমাসির গল্পটা অন্যরকম।

কার? বলতে বলতে সমীর নতুন সিগারেট ধরায়।

চিনিমাসিও একদিন জ্যোৎস্নায় হারিয়ে গেল ওই ঠোঁট-ভাঙা শঙ্খচিলের সঙ্গে?

কোন ঠোঁট-ভাঙা শঙ্খচিল?

ওই আমাদের গ্রাম রসপুরে যেটা উড়ে এসেছিল। তখন আমার ঠাকুমা মানদাসুন্দরী বেঁচে। চিলটা হয়তো তারও আগে থেকে আছে।

সেটা কিরকম?

ওই যে বাড়ির ছাদে এই চিল বসে, সে বাড়িতে একটা কেচ্ছা—

চিলটা কি আপনাদের রসপুরের বাড়ির ছাদে বসল?

বসল তো?

তারপর?

তারপর আর কি? চিনিমাসি হারিয়ে গেল আমাদের বাড়ি থেকে। এর কয়েকদিনের ভেতর তুঁতে খেল নিমাইকাকা। ভোর থেকে মুখে গাঁজলা তুলে তুলে—মারা যাওয়ার আগে কী কষ্ট?

কিন্তু চিনিমাসি?

আর আসেনি। কোথাও পাইনি তাকে।

কখনো দ্যাখোনি আর?

দেখেছি হয়তো কিংবা দেখিনি—বলে হাসল সজল।

কি যে বলো না তুমি—একটু আগে বললে দ্যাখোনি কোনোদিন। আর এখন বলছ, দেখেছ হয়তো—কী করে হয়?

হয়, হয় সমীর। হওয়াতে পারলে হয়। আমি আরো দুটো খাব। তুমি কি নেবে আর?

না সজলদা। আমার কোটা কমপ্লিট। তুমিও নিও না আর। অনেকটা খেয়েছ।

খাই না সমীর। খেতে ভালো লাগে। প্রিয়নাথদা বলেছে, আমার নাকি কেন্দ্র নষ্ট হয়ে গেছে। প্রিয়নাথদাকে চেনো তো তুমি? বড় ঔপন্যাসিক গল্পকার। 'মর্যাদা গ্রুপ

অফ পাবলিকেশনস'-এ ছিলেন। তারপর 'শিল্প গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস'-এ। সেখান থেকে আমাদের 'ভিশন'-এ। সত্যিই কি আমার কেন্দ্র নষ্ট হয়ে গেছে? তাহলে কেন আমি চিনিমাসিকে দ্যাখা না দ্যাখাটা স্পষ্ট করে বলতে পারি না। আমায় কি অ্যালকোহলিক মনে হয়? বড় ভুঁড়ি। সরু সরু হাত পা। ফোলা ফোলা থমথমে মুখ। আমি কি বেশিদিন বাঁচব না সমীর! লীনাকে নিয়ে বুচানকে নিয়ে। এসব কিছুই বলা হলো না সজলের। তার টেবিলে নতুন পেগ পৌঁছে গেছে। দূরে তখনই শঙ্খচিল ডেকে উঠল কি? সেই রসপুর গ্রামের মতো? সজল নতুন ড্রিংকস নিতে নিতে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করল।

অনেকটা মদ পেটে পড়লে মাথার ভেতর ক্যারামের লাল ঘুঁটি বার বার এদিক-ওদিক করে। প্রেসক্লাব থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্না টের পায়নি সজল। বুঝতে পারল ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি পৌঁছে। বাড়ির সামনে জ্যোৎস্নার মলাট। লোহার গেট সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে অনেকদিন পর আমগাছের কালচে মতো ছায়ায় চিনিমাসিকে দেখতে পেল সজল। তার গায়ে চাঁদের আলো জড়িয়ে আছে।

চিনিমাসি আমি—

চিনিমাসি কোনো কথা বলল না।

তার সাদাটে আঁচল মিশে যেতে চাইছিল চাঁদের রঙে।

তুমি এত ফরসা চিনিমাসি! লীনার থেকেও। সজল সহজ হতে চাইছিল।

আমগাছের ডাল-পাতার আড়াল থেকে ভাঙা ঠোঁটের আবছা ছায়া ভেঙে যাচ্ছিল সজলদের উঠোনে। চাঁদ-ভেজা আমপাতা, ডালের সেই ছায়াময়তা থেকে ভাঙা ঠোঁট, ডানা মোড়া কোনো চিলকে আলাদা করতে পারছিল কি সজল?

একান্ত গোপনে

পার্থ দত্ত

শিলিগুড়িতে কালই পৌঁছনোর খুব দরকার প্রিয়ব্রতর, ব্যবসা সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে। কিন্তু এসপ্লানেডের দূরপাল্লার বাসগুমটিতে এসে যখন সে জানতে পারলো শিলিগুড়িগামী শেষ রকেট বাসে একটা আসনও ফাঁকা নেই, আর শেষ রকেট বাস ছাড়তে তখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী ছিল। প্রিয়ব্রত মাথায় হাত দিয়ে বসলো, নির্ঘাত নতুন কন্ট্রাক্টটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এখন উপায়! ঠিক এই সময়ে যেন পরিত্রাতার ভূমিকায় এসে হাজির হলো বছর চব্বিশ-পঁচিশের এক সুন্দরী যুবতী।

টিকিট রিটার্ন কাউন্টারের সামনে এসে মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, 'দেখুন, আমার নাম মণীষা মজুমদার, আমার স্বামী দীপক বিশেষ একটা জরুরী কাজে এখানে আটকে পড়ায় শিলিগুড়ি যেতে পারছেন না। তাই ওঁর টিকিটটা ফেরত নিতে হবে।'

'শেষ মুহূর্তে টিকিট ফেরত?' বুকিং ক্লার্ক রমেন খাস্তগির একটু ইতস্তত করলো, হঠাৎ প্রিয়ব্রতর কথা মনে পড়তেই সে কাউন্টারের সামনে তাকালো। প্রিয়ব্রতকে দেখতে পেয়ে সে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'মশাই, এই যে মশাই শুনছেন? একটু আগে আপনি না শিলিগুড়ির একটা টিকিট চাইছিলেন? যোগাড় হয়ে গেছে। ভাড়ার টাকাটা দিয়ে টিকিটটা নিয়ে যান।'

টিকিটের নাম শুনে প্রিয়ব্রত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো বটে কিন্তু টিকিটটা অন্য এক ভদ্রলোকের, ফেরত দেওয়া হচ্ছে, তবে তার স্ত্রী যাচ্ছে। প্রিয়ব্রতর আপত্তি এখানেই, বাসে মেয়েটি সারারাত তার পাশেই থাকবে। প্রবাদ আছে, 'পথে নারী বর্জিতা!' তাই কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

তাকে ইতস্তত করতে দেখে বুকিং ক্লার্ক এবার অস্বস্তি গলায় বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, আপনি না নিলে অন্য ইচ্ছুক যাত্রীকে টিকিটটা দিয়ে দিচ্ছি।'

অন্যযাত্রী মানে বছর চল্লিশ বয়সের ষণ্ডামার্কা একটা লোককে দেখে মণীষা ঘাবড়ে যায়। সে এবার প্রিয়ব্রতর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো, 'আপনার তো আজই শিলিগুড়ি যাওয়া খুবই জরুরী। তাহলে যাচ্ছেন না কেন?' এখানে একটু থেমে মেয়েটি আবার বললো, 'ঠিক আছে, টিকিটের দাম বাসে উঠে দিলেও চলবে। এখন আমার সঙ্গে আসুন তো। বাস এখনই ছেড়ে দেবে।'

প্রিয়ব্রত আপত্তি করার আগেই মণীষা তার হাত ধরে একরকম জোর করেই তাকে টানতে টানতে বাসে নিয়ে গিয়ে তুললো। টু-সিটেড আসন। মেয়েটি জানালার ধারে বসে প্রিয়ব্রতকে আহ্বান জানালো। 'বসুন!'

'আপনার টিকিটের দামটা?'

'আরে পালিয়ে তো যাচ্ছেন না, সামনে সারাটা রাত পড়ে রয়েছে, মণীষা হাসতে হাসতে প্রিয়ব্রতর হাত ধরে তাকে তার পাশে বসিয়ে দিলো একরকম জোর করেই।

মেয়েটির মধ্যে কি জাদু ছিল কে জানে, এবারেও সে কোনো আপত্তি করতে পারলো না।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন'টায় রকেট বাস ছেড়ে দিলো. রাত ন'টা শীতের রাত, রাস্তা প্রায় ফাঁকা। রকেট বাস, রকেটের মতো দ্রুত গতিতে ছুটে চললো তার গন্তব্যস্থলের দিকে। ফাঁকা বি টি রোডে আসতেই বাসের গতি দ্বিগুণ হয়ে গেলো। ডানলপ ব্রীজের সামনে হঠাৎ ট্রাফিকের আলোটা লাল হয়ে উঠতেই বাসের চালক দ্রুত ব্রেক কষতেই যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে এ ওর ঘাড়ে লুটিয়ে পড়লো।

এদিকে প্রিয়ব্রত ও মণীষার অবস্থা তথৈবচ। দু'হাত দিয়ে প্রিয়ব্রতর গলা জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে মণীষা। তার বুকের কাঁপন তখন আছড়ে পড়ছে প্রিয়ব্রতর বুকে। ওরা কতক্ষণ যে ওভাবে জড়িয়ে বসেছিল কেউ তা জানে না। পিছনের আসন থেকে এক ছোকরা টিপ্পনী কাটল, কি দাদা, খুব লেগেছে?

এমন একটা নোংরা মন্তব্যের উত্তর দিতে ইচ্ছে হলো না প্রিয়ব্রতর। তার বদলে অস্ফুটে মণীষার উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, আরে ছাড়ুন এবার। বাসের যাত্রীরা যে দেখছে...।

দেখুকগে! মণীষা আরও নিবিড় করে প্রিয়ব্রতকে জড়িয়ে ধরে কপট অভিমান করে বললো, বাসের ঝাঁকুনিতে আমার লাগলো, আর ওরা রঙ্গ-রসিকতা করছে? না, ওদের কথায় কান দেবেন না।

আঘাত পেয়েছে শুনে প্রিয়ব্রতর কেমন যেন একটু মায়া হলো মেয়েটির ওপর। তাই সে মণীষার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় লেগেছে?

এইখানে, এই বলে প্রিয়ব্রতর ডানহাতটা ধরে নিজের বুকজোড়ার মাঝখানে চেপে ধরলো মণীষা, ছাড়তে চাইল না।

প্রিয়ব্রত ঘাবড়ে গেলো। বাস তখন রকেটের গতিতে আবার ছুটতে শুরু করেছিল। ওদিকে বাসের যাত্রীরা আবার আগের মতো ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছিল তখন। প্রিয়ব্রত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ওরা এমন রসালো দৃশ্য দেখলে আর রক্ষে ছিল না। রাতের জার্নি বলে বাসে মাত্র দুটি আলো জ্বলছিল, একটা গেটের মুখে, আর একটা ঠিক ওদের আসনের পেছনে। কম পাওয়ারের আলো হলেও মেয়েটির মুখটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। অন্য আসনগুলো প্রায় অস্পষ্ট আলোয় ডুবেছিল, তাতে

একটা বাড়তি সুবিধে হলো এই যে দূর থেকে ওদের গতিবিধি অন্য যাত্রীদের চোখেই পড়ছে না। তবু সাবধানের মার নেই, প্রিয়ব্রত তার হাতটা মেয়েটির বুকের ওপর থেকে তুলে নিতে গেলে মণীষা এবার আরো জোরে চেপে ধরলো ওর পাখীর মতো নরম বুকের ওপরে। অনুভবে বুঝলো প্রিয়ব্রত অজান্তে তখন যে মণীষার একটি স্তন তার হাতের তালুবন্দী হয়ে গেছে খেয়ালই নেই তার। ব্রাহীন বুক। মেয়েটির স্বাস্থ্য ভীষণ ভালো। তার ওপর বিশাল স্তনের চাপে মনে হচ্ছিল ব্লাউজ না ফেটে যায়। সামনের দিকে বোতাম ব্লাউজের। ওপরের দুটি বোতাম খুলে গেছে, স্তনজোড়ার উপরের অনেকখানি উন্মুক্ত, আলোয় উদ্ভাসিত। সংকোচ হচ্ছিল, তাই প্রিয়ব্রত বোতাম দুটো লাগাবার চেষ্টা করতেই মণীষা তার হাত চেপে ধরে অস্ফুটে বলে উঠলো, থাক না, আমার ও দুটো দেখতে কি তোমার খুব খারাপ লাগছে? এই দেখো আমি তোমাকে তুমি বলে ফেললাম।'

'ঠিক আছে, ও কিছু নয়।'

'না ঠিক নেই। তুমিও তাহলে আমাকে তুমি করে ডাকবে বলো?'

মণীষা তার মনের কথাটাই বলেছিল। সেও যেন কেমন একটু একটু করে মেয়েটির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছিল। তাই সে আর আপত্তি করলো না, বললো, 'ঠিক আছে, তাই বলবো।' এই বলে প্রিয়ব্রত অবিন্যস্ত শালটা একহাতে তার বুকের ওপর গুছিয়ে বিছিয়ে দিলো। ওপর হাতটা মেয়েটির বুকের ওপরেই তেমনি রাখা ছিল। এর ফলে বাসের অন্য যাত্রীরা জেগে উঠে তাদের দিকে তাকালেও তার হাতের কাজকর্ম তারা আর দেখতে পাবে না, এই ভাবে আশ্বস্ত হলো সে। তার গতিবিধি দেখে মেয়েটি হাসলো, স্থির চোখে তাকালো প্রিয়ব্রতর দিকে। তুমি তাহলে এতক্ষণে সাবালক হলে?'

'কি করে বুঝলে?'

'শালটা দিয়ে আমার বুক ঢেকে দিলে কেন?' মণীষা কপট গম্ভীর মুখে বললো, 'একবার আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজন মনে করলে না?'

প্রিয়ব্রত তার ব্লাউজের অবশিষ্ট বোতামগুলো খুলতে খুলতে তেমনি রহস্য করে বললো, 'এর পরেও কি তোমার অনুমতি নিতে হবে?'

'না গো না', মণীষা ঠোঁট ফোলালো, 'তুমি কি ঠাট্টাও বোঝো না?'

এতে প্রিয়ব্রতর সাহস আরও বেড়ে গেলো। ততক্ষণে ব্লাউজের সব বোতামগুলো তার খোলা হয়ে গেছলো। স্তনজোড়া পুরুষ্ট, সুগঠিত এবং সুডৌল। প্রিয়ব্রত ভালো করে স্তনদুটি তার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে মৃদু চাপ দিতে শুরু করলো। মণীষা হাত সরিয়ে দিলো না। বরং আবেগকম্পিত গলায় ফিসফিসিয়ে বললো, 'আরও আরও জোরে টিপে দাও, খুব ভাল লাগছে।' এই বলে মণীষা হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো, প্রিয়ব্রতর মাথাটা নিচে নামিয়ে এনে তার ঠোঁটজোড়া নিজের তপ্ত ওষ্ঠ দ্বয়ের কাছে নিয়ে এলো। চুম্বনের জন্য মুখ তুললো মণীষা। প্রিয়ব্রত তার

মনের কথা জেনে গেছে ততক্ষণে। তাই সে তার শালটা নিজের মাথার ওপর টেনে বাকী অংশটুকু মণীষার শরীরের ওপরের অংশটুকু ঢেকে দিলো। এখন প্রকাশ পাওয়ার মতো ওদের শরীরের কোনো অংশই খোলা পড়ে রইলো না। নিশির ডাকে সম্মোহিত নারীর মতো দেখাচ্ছিল মণীষাকে। মৃদু হাসলো প্রিয়ব্রত, হঠাৎ আকাঙ্ক্ষিত কিছু পেয়ে যাওয়ার হাসি যেন। এখানে এই চলন্ত বাসের মধ্যে যাত্রীরা সবাই যেখানে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ঘটনার এমন উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে হঠাৎ কেমন যেন মণীষাকে ভাল লেগে গেল প্রিয়ব্রতর। মণীষাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ওর খোলা প্রশস্ত বুকে হাত বোলাতে বোলাতে প্রিয়ব্রত ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। পেলব হাতের স্পর্শে সংবাহনের আরাম দিতে চাইলো মণীষাকে। অকপট হাসিতে প্রিয়ব্রত যেন ওকে অবশ করতে চাইছে। মণীষা চুম্বনের জন্যে মুখ তুলতেই প্রিয়ব্রত ওকে ওর সেই ছোট্ট আসনে শুইয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলো সজোরে, পোশাকের ওপর থেকেই জঘনে চাপ দিলো মণীষার তলপেটে, আর সেই অবস্থাতেই আলো আঁধারির ছায়াঘন অবস্থায় দুটি ছায়ামূর্তি চুম্বিত হয়ে রইল। মণীষার মনে হলো, এই তার স্বামী। ওদিকে প্রিয়ব্রত হয়তো কল্পনা করলো তার বিবাহিত স্ত্রী অনুসূয়াকে, এই মুহূর্তে যাকে সে চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না। আর এভাবেই দুটি দেহে দুটি অন্য মন তরঙ্গায়িত হলো। বাসের সেই স্বল্পালোকে প্রিয়ব্রত মণীষার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, ও এখন ওর তপ্ত ঠোঁটে চুম্বনের প্রত্যাশী। প্রিয়ব্রত বাসের সেই স্বল্প পরিসরে ঠেস দিয়ে নিজের শরীরের নিচে মণীষাকে শোয়ালো, নিজে তার দেহের ওপর নিজের দেহটাকে কোনোরকমে বিছিয়ে দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলো সজোরে, শাড়িতে আবৃত মণীষার জঙঘায় এবং তলপেটে চাপ দিতে থাকলো, আর সেই অবস্থাতেই সেই আলো আঁধারিতে দুটি ছায়ামূর্তি চুম্বিত হয়ে রইলো, চুম্বন যতক্ষণ না বিস্বাদ ঠেকলো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কারোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলো না। মণীষার মনে হলো, এই তার স্বামী বিজন, যাকে সে শরীরী সম্পর্কে পেতে চায় না, আর প্রিয়ব্রত হয়তো কল্পনা করলো তার স্ত্রীকে, যাকে সে নিবিড় করে পেতে চায় কিন্তু পায় না কোনো এক কারণে। দুটি দেহে দুটি অন্য মন তরঙ্গায়িত হতে থাকলে তাদের এতদিনের না পাওয়া আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ ক্ষণিকের এই প্রাপ্তিযোগ তারা এখন ভরিয়ে নিতে চাইলো কানায় কানায়। কিন্তু তারা এও জানে যে, এই চলন্ত বাসের মধ্যে তাদের সব আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটতে পারে না, সম্ভবও নয়। তবু যেটুকু পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট, আর যা না পাবে পথের কামনা বাসনা সব পথেই ফেলে রেখে যেতে হবে।

অনেকক্ষণ পরে মণীষার চোখে-মুখে একটা সুখ-তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এবং প্রিয়ব্রতরও। প্রিয়ব্রতই প্রথমে মণীষার কমলালেবুর কোয়ার মতো রসসিক্ত ওষ্ঠ দ্বয় থেকে নিজের ঠোঁটজোড়া বিচ্ছিন্ন করে শান্ত স্নিগ্ধ গলায় মিষ্টি সুরে বললো, এবার ছাড়ো।

আর একটু প্লিজ, মণীষা এবার নিজের থেকে সক্রিয় হয়ে দুহাতে প্রিয়ব্রতর গলা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটজোড়া নিজের ওষ্ঠ দ্বয়ের মধ্যে পুরে চোষণে ব্রত হলো। চোষণ অতি দ্রুত হলো এবার, যেন চুম্বনে রসনার শেষ ফোঁটা সে চুষে নিতে চাইছে প্রিয়ব্রতর ওষ্ঠ দ্বয় থেকে। তারপর তখনকার মতো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতেই সে বিচ্ছিন্ন হলো প্রিয়ব্রতর থেকে।

কেমন লাগলো? প্রিয়ব্রতর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে মণীষা জিজ্ঞেস করো।

তোমার রসালো ঠোঁট নাকি চুম্বন!

দুটোই! এই বলে হাসলো প্রিয়ব্রত। কপট অনুযোগ করে আবার বললো, তবে মন ভরলেও দেহ কিন্তু অপূর্ণই রয়ে গেলো।'

এখন এ পর্যন্তই থাক, পথ চলা এখনও শেষ হয়নি, দীর্ঘ পথ এখনও বাকী রয়েছে। মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলে টুকটাক প্রাপ্তিযোগ ঘটলেও ঘটতে পারে তার বেশি কিছু নয়। যেমন এই মুহূর্তে আমি তোমাকে তোমাদের অতি প্রিয় জিনিষটা খাওয়াতে পারি।'

সেটা কি, থামলে কেন? প্রিয়ব্রত অধীর হয়ে বললো, বলো কি সেটা? আমি কে সেটা চোখে দেখতে পারি?

না অনুভবে বুঝে নিতে হবে, মণীষা রহস্য করে বলে তার শালের নিচে প্রিয়ব্রতর মাথাটা আড়াল করে চেপে ধরলো নিজের বুকের ওপর। ব্লাউজের বোতাম খোলা মণীষার বুক। শালের আড়াল হলেও মণীষার লক্ষ্য কিন্তু স্থির ছিল, প্রিয়ব্রতর মুখটা সে তার আকাঙ্ক্ষিত একটা স্তনবৃন্তের ওপর চেপে ধরলো। হ্যাঁ, মণীষা খুবই প্রিয়। চোষণে দারুণ মজা। এই অভ্যাসটা পুরুষরা তাদের জন্মলগ্ন থেকে শেখে তাদের মায়েদের কাছ থেকে। মণীষার বুকে দুধ নেই, তাতে কি হয়েছে? বাড়িতে তার র-চা খাওয়ার অভ্যাস আছে, র-চায়ে চায়ের ফ্লেভারটা ভাল পাওয়া যায়। সেই রকম র-স্তনেও স্তনের বেশ মাদী মাদী গন্ধ থাকে, হাত দিতে ভাল লাগে, শুঁকতে ভালো লাগে আর চুষতে সে তো স্বর্গসুখ লাভের মতো। প্রিয়ব্রত আর অপেক্ষা করতে পারছিল না, পালা করে মণীষার দুটিস্তন বেশ আয়েস করে চুষতে শুরু করলো। স্ফুরিতক চুম্বনে ও চোষণে রক্তবর্ণ হলো ওষ্ঠদ্বয়, মণীষা স্তন আরও চেপে ধরলো প্রিয়ব্রতর মুখে, চোষণে বৃষ্টি পড়া কদমের মতো কণ্টকিহ হলো স্তনযুগল।

আঃ কি চমৎকার তোমার স্তনজোড়া? একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রিয়ব্রত বলে উঠলো।

ভাললাগছে? মণীষা জিজ্ঞেস করলো।

দারুণ!

কলেজে ইকোনোমিক্সে পড়েছিলাম 'ল অব ডিমিনিশিং-এর' কথা। ভালো জিনিষ বেশি খেলেই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। আর নয়, ওঠো এখন। উঃ তোমার শরীরটা

কি ভারি!

এই সময় পিছনের আসনের এক যাত্রীর ঘুম ভেঙে গেলো। তার আড়মোড়া ভাঙার শব্দ হতেই মণীষা প্রিয়ব্রতকে ঠেলা দিলো, এই ওঠো, কেউ বোধহয় জেগে উঠেছে।

প্রিয়ব্রত দ্রুত মণীষার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে বসলো।

স্যরি! মণীষা মুখ টিপে হাসলো। দুঃখ করো না প্রিয়, পরে আমি তোমাকে সুদে আসলে পুষিয়ে দেবো।

প্রমিস?

প্রিয়ব্রতর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মণীষা বললো, হ্যাঁ, শপথ নিলাম!

মাঝরাতে বাস এসে থামলো মালদায়। অনেকক্ষণ থামবে এখানে।

কিছু খাবে? প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো।

যা খাইয়েছ, এরপর অন্য আর কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই, রহস্যময় হাসি হেসে মণীষা বললো। এত সব খাওয়ার পরেও তোমার খিদে পেয়েছে!

তেমন করে খেতে দিলে কই? প্রিয়ব্রতও কপট অনুযোগ করতে ছাড়লো না।

সে তোমার দুর্ভাগ্য, পিছনের আসনের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো মণীষা। মণীষা কি বলতে চাইছে তা বুঝতে অসুবিধে হলো না প্রিয়ব্রতর।

বেশ, অন্তত এক কাপ কফি?

তা মন্দ হয় না, যা শীত পড়েছে, শরীরটা একটু গরম না করে নিলে নয়!

সে কি তুমি গরম হওনি? মণীষার একটু আগের রসিকতার বদলা হিসেবে বললো, এত গরম খাওয়ার পরেও—

এ গরম সে গরম নয়। মণীষাও রসিকতা করতে ছাড়লো না। তাছাড়া কি এমন গরম করতে পারলে তুমি?

সুযোগ পেলে দেখো তোমার মধ্যে কেমন আমি আগুন জ্বালিয়ে দিই। হাসতে হাসতে বললো প্রিয়ব্রত।

তার আগে আমিই তোমার মধ্যে আগুন ছড়িয়ে দেবো।

না তুমি তা পারবে না, প্রিয়ব্রত এবার একটা মোক্ষম রসিকতা করলো, দেশলাইকাঠিটা কেবল আমার কাছেই আছে, তোমার কাছে নয়!

দুষ্টু কোথাকার, মণীষা কপট ধমক দিয়ে প্রিয়ব্রতর প্যান্টের বোতামের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে বললো, এই দেশলাইকাঠির জন্য এতো দেমাক তোমার?

হ্যাঁ অবশ্যই! আর একটা কাঠিই যথেষ্ট, তোমার সারা অঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে আমার এই দেশলাইকাঠিটা। তা জ্বালবো নাকি?

না, না, দোহাই তোমার, মণীষা তাকে থামিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলো, লক্ষ্মীটি, এখানে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসো না, শিলিগুড়িতে চলো, সেখানে তুমি যত খুশি আগুন জ্বালাও, আমার দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দাও না কেন আমি কোনো ভাবেই আপত্তি

করবো না।

কথা দিচ্ছ?

কেন, একটু আগেই তো আমি তোমাকে কথা দিয়েছি। মণীষা বললো।

ঠিক আছে, আমি তাহলে কফি আনতে চললাম। হ্যাঁ, তাই যাও।

* * *

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রিয়ব্রত এই প্রথম মণীষার পারিবারিক প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

স্বামী আর দত্তক নেওয়া একটি ছেলে।

দত্তক নেওয়া ছেলে? প্রিয়ব্রত একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলো, কেন, তোমাদের বিবাহিত জীবনের কোনো ফসল তুলতে পারোনি?

অনেক দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমার স্বামী ইমপোটেন্ট, বাবা হওয়ার অযোগ্য।

তাই বুঝি? প্রিয়ব্রত দুঃখ প্রকাশ করলো, আমি দুঃখিত।

না, না, এতে দুঃখ পাওয়ার কি আছে? বিষণ্ণ গলায় মণীষা বললো, এ আমার দুর্ভাগ্য। আর তাই তো তোমার মতো একজন ভাল বন্ধু পেয়ে আমি লোভ সামলাতে পারিনি। আমার কথা থাক, এখন তোমার কথা বলো। তোমার বিবাহিত জীবন কি রকম বলো।

স্ত্রী ও একটি বছর তিনেকের ছেলে নিয়ে আমার সংসার বেশ সুখেই কাটছিল, কিন্তু ভগবান বোধহয় সব সুখ একসঙ্গে দেন না। তা না হলে আমার স্ত্রী হঠাৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়বে কেন বলো? প্রায় এক বছর হলো, স্ত্রীর সঙ্গে আমার শারীরিক কোনো সংযোগ নেই। আর তাই বোধহয় আজ হঠাৎ তোমার এমন মধুর সঙ্গ পেয়ে আমি একটু বেহিসেবীপনা করে ফেলেছি।'

না, না, এটাইতো প্রকৃতির ধর্ম, নারী পুরুষ একত্রিত হলে এমনি হয়। তুমি এমন কিছু বেহিসেবীপনা করোনি। আমার বিশ্বাস, শিলিগুড়িতে গিয়ে আমি অতৃপ্ত জীবনে আরও বেশি করে তৃপ্তি আনতে পারবো। স্বামী নেই, ওখানে গিয়ে তুমি আমার বাড়িতেই উঠবে। আমার ছেলে বেলা এগারোটায় ফিরে আসে, আশাকরি তার আগেই তোমাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে ফেরাতে পারবো।

সকাল হতেই রকেট বাস এসে পৌঁছলো শিলিগুড়িতে। কালবিলম্ব না করে বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রিয়ব্রতকে সঙ্গে নিয়ে মণীষা সোজা তাদের হিলকার্ট রোডের বাড়িতে ফিরে এলো। তখন বেলা প্রায় নটা। বাড়ি ফাঁকা। ছেলেকে স্কুলে নিয়ে গেছে কাজের মেয়ে শান্তি, তাকে একেবারে নিয়েই ফিরবে এগারোটার পর। এই দুঘণ্টা, ন'টা থেকে এগারোটা তাদের মিলনের স্বর্গরাজ্য বলে মনে করলো মণীষা। এত বড় বাড়িতে তারা দুজন এখন। টয়লেট থেকে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিলো তারা।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে মৃদু হাসলো প্রিয়ব্রত, বিজয়ীর হাসি। আর এখানে এই নির্জন বাড়ির মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন ভালো লেগে গেলো মণীষার প্রিয়ব্রতকে।

ওর কাছে গিয়ে ওর খোলা প্রশস্ত বুকে হাত রাখলো, কাঁধের পেশীতে হাত বোলালো, তারপর গলা জড়িয়ে ধরলো। পেলব হাতের স্পর্শে সংবাহনের আরাম দিতে চাইলো প্রিয়ব্রতকে। প্রিয়ব্রত হাসছে। কপট হাসিতে প্রিয়ব্রত যেন ওকে অবশ করে দিতে চাইছে। মণীষা ভাবছে, এই সময় হঠাৎ যদি ওর স্বামী এসে হাজির হয় ওদের এভাবে মিলিত হতে দেখে দেখুক। একটা ক্লীবকে ও আর ভয় পাবে না, ও এখন ওর মনের মানুষের সন্ধান পেয়ে গেছে। প্রিয়ব্রতকে কথা দিয়েছে ও। কথা রাখতে উদ্যোগী হলো মণীষা। যেন ওর পুরুষ কৌমার্য হরণ করছে এমনভাবে প্রিয়ব্রতকে সজোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো মণীষা, ওকে ঘর্ষণ করলো নিজের নগ্ন দেহে, তারপর প্রিয়ব্রতর পরনের পোশাক টেনে খুললো, হাত দিয়ে অনুভব করলো ওর উদ্যত রিরংসার ফলা, ছাড়লো না, মুঠোয় ধরে রইলো।

প্রিয়ব্রত অস্ফুটে বলে উঠলো, কি সুন্দর বুক তোমার মণীষা!

আর তোমার এই সোনারকাঠিটাও কম সুন্দর নয় প্রিয়ব্রত, দৈর্ঘে-প্রস্থে আমার স্বামীরটার থেকে দ্বিগুণ, যেকোনো মেয়ের কাছে এটা লোভনীয়।

প্রিয়ব্রতর সারা শরীর টান-টান হয়ে উঠেছে। সত্যিকার পুরুষমানুষ। উপযুক্ত শৃঙ্গার আবিষ্কার করতে চায় প্রিয়ব্রত। টের পেয়েছে, মণীষার তৃপ্তি-সাধন খুব সহজ নয়। তাই শৃঙ্গ ওকে অবশ না করলে শুধু সোনারকাঠির স্পর্শে ওর রাগমোচন হবে না। ওর দেহ বেয়ে খানিকটা নামলো প্রিয়ব্রত, মণীষার স্তনের অগ্রভাগে মণ্ডলীকার কালো দাগযুক্ত জায়গায় মুখ রাখলো, লেহন করলো স্তনটা উৎফুল্ল স্তনের খানিকটা মাংস দুই পাটির সবগুলো দাঁত দিয়ে বৃত্তাকারে গ্রহণ করে মৃদু চাপ দিলো। এক স্তন থেকে প্রিয়ব্রতর মাথাটা তুলে আর এক স্তনে আনলো মণীষা এবং বললো, এটাকেও একটু দেখো! মণীষার নিঃশ্বাসে হল্কা, নাকের পাটা ফুলছে, কথা জড়িয়ে আসছে, কোমল গোপনাঙ্গ আর্দ্র হচ্ছে। মণীষার নাভিমূলে হাত বুলোলো প্রিয়ব্রত। একটু একটু করে আরও নিচে উরুসন্ধিতে উত্তাপ অনুভব করলো, হাতের স্পর্শে দুই উরু প্রসারিত করলো মণীষা। আবেগকম্পিত গলায় বললো, আর পারছিনে। নিতম্ব ওপরের দিকে বার বার ঠেলে তুলতে মণীষা ওর ত্রিভুজে বিদ্ধ করাতে চাইছে প্রিয়ব্রতর সোনার কাঠি, দুহাতে ওর পুরুষকঠিন পশ্চাদভাগ টেনে আনছে নিজের কাঁকালের দিকে। প্রিয়ব্রত বেশ বুঝতে পারছে মণীষার চোখ মুখ উগ্র সঙ্গমেচ্ছায় বিস্তারিত, স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত। উত্তুঙ্গ উত্তেজনার মুহূর্তে দুহাতে মণীষার কোমর জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে ওকে ওপরের দিকে টানলো প্রিয়ব্রত, যুক্ত হলো দেহে দেহে প্রবিষ্ট হলো মণীষার মধ্যে। মণীষা অধীর আনন্দে বলে উঠলো, আঃ!

কি সুন্দর তোমার ত্রিভুজ মণীষা।

ভাল্‌লাগছে? আরও জোরে...।

কিন্তু প্রিয়ব্রত তাড়াহুড়ো করছে না দেহে দেহে দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে নিস্ক্রিয় প্রিয়ব্রত আবেশে চোখ বুজে উপভোগ করছে। ওদিকে মণীষা আর স্থির থাকতে

পারছে না। কেমন নির্লজ্জের মতো বললো, ও, আর একটু, আর একটু...

এবার সক্রিয় হলো প্রিয়ব্রত এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ওর উত্তাপে যৌবনের যারকরস বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়তে থাকলো মণীষার দেহের অভ্যন্তরে। দুজনেরই এক সঙ্গে রাগমোচন হলো। আর অবসন্ন দুটি দেহ ওই অবস্থায় পড়ে রইলো আরও কিছুক্ষণ।

মণীষার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকলো প্রিয়ব্রত, মণীষাও অনুসরণ করলো ও কে। এ ওর মিলনজনিত সমস্ত ক্লেদ, ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ করে দিলো। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে প্রিয়ব্রত ঘড়ির দিকে তাকালো, সাড়ে দশটা। বললো, তোমার ছেলের ফেরার সময় হয়ে এলো, এবার যাই।

আবার কবে দেখা হবে? মণীষার চোখে আকুতির ছায়া পড়ে।

আবার দেখা কেন, এই তো ভালো, মৃদু হেসে প্রিয়ব্রত বললো, পথের দেখা পথেই তো শেষ হলে ভালো হয়, তাই না।

মণীষা ফ্যালফ্যাল করে প্রিয়ব্রতর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। কি উত্তর দেবে ও? এই মুহূর্তে ওর সারা দেহ-মনে প্রিয়ব্রতর সুখ-স্মৃতি জড়িয়ে আছে, অন্য কথা ভেবে সেটা ও মুছে দিতে চাইলো না।

অবৈধ

সৌরেন দত্ত

উঃ নিঃশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আবার, বেশ বুঝতে পারছি, যে কোনো মুহূর্তে আমার দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তখন আমি খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে যাবো ঃ বেচারা! জীবনের রঙ কি জানলো না, পাগল করা মেয়েদের শরীরের ঘ্রাণ, প্রথম বৃষ্টি পড়া মাটির সোঁদো সোঁদো গন্ধ তার আর নেওয়া হলো না, তার আগেই...না, না, আমি বাঁচতে চাই, আমিও আমার অবৈধ বাবা-মায়ের মত একটা বেজন্মা সন্তানের জন্ম দিয়ে প্রতিশোধ নিতে চাই, দেখতে চাই শেষ কি, আমার এতো বন্দীদশা যাপন করতে করতে দুপুর গ্রহণ গুণছে? এখন রাত কি দিন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমার চোখে ঠুলি পরানোর কতো কি একটা জিনিষ চেপে দেওয়া হয়েছে, তাই দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। আমি এখন কোথায়ই বা, এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। আমি যেন এখন স্বপ্নের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমার এখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে দেবদাস হই। পারুকে না পাই চন্দ্রমুখীকে তো পাবো। এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে প্রায় অধিকাংশ মেয়েই তো চন্দ্রমুখী, পারুর মতো কজন সতী মেয়ে আছে? তাই নিদেন পক্ষে চন্দ্রমুখীকে পেলেও চলবে। আমি সেই চন্দ্রমুখীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি আপনার স্বপ্নের রাজ্যে।

আমার অবস্থা অনেকটা অভিমুন্যর মতো, মায়ের পেটে থাকার সময় থেকেই শুনে এসেছি, আদিবাসী মেয়েদের রঙ কালো বলে কি হবে ওদের মন খুব ভালো। আর শরীরের যেন তুলনাই হয় না, যেমন নরম তেমন গরম। ওদের হাতছানি আমার বাবা এড়াতে পারেনি। বাবা ঝাড়গ্রামের এক জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসার, আর সেই সূত্রে সাঁওতাল আদিবাসীদের সঙ্গে খুব মেলামেশা এর। ফলেই এক আদিবাসী যুবতী মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। বলাবাহুল্য, সে প্রেম দেহগত। আমার বাবা একজন লেডী কীলার, তাঁর নজরে একবার যে পড়ে তার রেহাই নেই, তাকে তিনি তাঁর শয্যাসঙ্গিনী না করে ছাড়েন না। এ নিয়ে আমার মার সঙ্গে বাবার কম ঝগড়াঝাঁটি হতো না, আমি আমার মায়ের জঠরে থেকে ওঁদের সব কথা শুনেছি। মা বাবাকে বলেছিলেন, "তুমি একের পর এক

নতুন মেয়ের মুখ দেখে বেড়াচ্ছো এদিকে তোমার পুরনো সঙ্গিনীর খবর কি রাখো?"..." কি খবর আবার?"..."এসব ব্যাপারে খবর তো একটাই! আবার তোমার তা হতে চলেছি?"..."এ আর এমন নতুন কি কথা আগুনের ওপর ঘি পড়লে সে জ্বলবেই। আর সেই আগুন নেভানোরও ব্যবস্থা আছে। যেমন এর আগে তিনবার করেছিলে।"..."না, এবার আমি তা আর করবো না। এবার আমি তোমার সন্তানের মা হতে চাই। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো রজত।"..." বিয়ে করবো বললেই তো যখন তখন করা যায় না। আমাকে একটু ভাববার সময় দাও।"...

"বেশ, সেই দিনটার জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকবো..." তারপর থেকেই আমার মধুলোভী ভ্রমর বাবাটি উধাও। তখন আমার কুমারী মায়ের গর্ভপাত করার সময় আর ছিল না, খুবই অ্যাডভান্স স্টেজ তখন, প্রায় আটমাস। তাই অগত্যা আমার মাকে দশমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। তারপর...তারপর আমার দুঃখিনী মায়ের কথা, আর আমার পরিণতির কথা এখনি বলতে চাই না। তার আগে আমার বাবার চরিত্রের প্রভাব কিরকম আমার মধ্যে পড়েছিল সেকথাই বলি শুনুন ঃ

নারীলোভী বাবার রক্ত আমার রক্তে প্রবাহিত। বাবার সব গুণ না পেলেও একটা গুণ আমি ঠিক পেয়েছি। আদিবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠ হওয়ার স্বপ্ন দেখছি এখন থেকেই।

রূপবতী চিৎকার করে উঠলো, 'উঃ লাগছে, আর পারছিনে। যা করার করো আমাকে হত্যা করে করো, তখন আমি তোমাকে বাধা দিতে আসবো না।"..."সুন্দরী রূপবতী, তোমার নার্সের চাকরী স্থায়ী করতে হলে তোমার রূপ থেকে আমার মধ্যে একটু তো খরচ করতে হবে। আর রূপের সঙ্গে তোমার দেহও তো খরচ করতে হবে। না, আর বাধা দিও না খুকুমনি এবার আমার খোকনসোনাকে তোমার ঘরে ভালোভাবে প্রবেশ করতে দাও। আমার খোকন একটু লম্বা আর বলিষ্ট, তাই তাকে হয়তো তোমার ঘরের দরজায় আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, তুমি যন্ত্রণা অনুভব করছো, দরজার কপাট দুটো পুরোপুরি খুলে দাও, তাহলে দেখবে তখন তোমার আর লাগবে না। লক্ষ্মী সোনা, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, বাধা দিও না।

আমি এখন আদিবাসী পুরুষদের সঙ্গে নাচছি। আমার পরনে পশুর ছাল আর মাথায় পাখির পালকের মুকুট। আমার সঙ্গে আগুন রঙের স্ত্রীলোকটি উন্মত্তের মতো নাচছে। তার অনাবৃত বুকে উল্কি আঁকা একটা ছুটন্ত হরিণের পিছনে ধাবমান নিষাদ। শালবনের ভেতরে সেই হেলিকপ্টার নামার হেলিপ্যাডের চাপন বৈশাখী পূর্ণিমার কাঞ্চন মেলায় যাবার পথ। দূরে দীঘির জলে জ্যোৎস্না পড়ে চক্‌চক্ করছে উৎসব মুখর রাত্রি, বাতাসে দিশী মদের গন্ধ, মহুয়ার মাতাল করা ঘ্রাণ।

দেবলীনা, শুভব্রত, আমার সমবয়সী। আমার সঙ্গে থাকলেও এরা কিন্তু নাচছে না আমাদের সঙ্গে। ওরা আদিবাসীদের ভাষা বুঝেনা বলেই বোধ হয় ওদের সঙ্গ এড়িয়ে দূরে দূরে থাকতে চাইছে। কিংবা এমনও হতে পারে জন্মলগ্ন থেকেই ওরা এ ও'কে নিজেদের জীবনসাথী করে ফেলেছে। আমার চোখের আড়ালে থেকে শালবনের নৈশলোকে তরুবীথির নিচে মিলন-বাসর রচনা করতে উদ্যত। দেবলীনার চোখে সেই তীব্র চাহনি যা আমার অতল পর্যন্ত দেখতে চায়। ডুম-ডুম-ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিং।

ফরেস্ট বাংলোর ড্রেসিং মিররের সামনে শ্যাম্পু করা অবিন্যস্ত চুল নিয়ে দীঘিতে সাঁতার কাটা সেই মেয়েটি মুখ দেখছে ; সায়ার গিঁট আলাগা হয়ে গেছলো ঠিক করছে। সায়ার লেসে নবাবী আমলের জাফরী। পীন পয়োধরে স্থূলিত প্রায় অর্ন্তবাস। বাংলোর লনের অন্ধকারে মাদীগন্ধে বিভোর এক যুবক পদচারণ করছে, হাতে তার একটা জ্বলন্ত সিগারেট শয়তানের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। অ্যাপার্টমেন্ট সংলগ্ন টয়লেটের ফোয়ারা থেকে জল পড়ার ছর-ছর শব্দ। অ্যাপার্টমেন্টে আশ্লেষকাতর কণ্ঠস্বর, "মাহরী আমি কি তোমার পরপুরুষ, বুকের জামাটা খোলো না, তোমার বুকটা কি সুন্দর, ঠিক যেন পাকা আম টস্‌টস্ করছে..."

জন্মস্থানের একটা বিশেষ আকর্ষণ যে আছে, তা অস্বীকার করা যায় না, আর তারই টানে আমি ফিরে যাই নার্সিংহোমের সেই বিষণ্ন কেবিনে আমি শুয়ে আছি। নীলাভ একটা আলোর বৃত্ত তার তলা দিয়ে সাদা পোশাকের নার্স হাতে ওষুধ নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। দূরে, ঠিক কতো দূরে, শালবনের জঙ্গল, আদিবাসী, আদিবাসীদের নাচ-গানের দৃশ্য তা বোঝাবার মতো জ্ঞান আমার এখনও হয়নি। সেই সবুজ অরণ্যানীর শব্দ যেন ভেসে আসে আমার কানে। আবার সেই শব্দ হারিয়ে যায় নার্সদের পায়ের জুতোর খট্ খট্ শব্দে। আমার বেডের সামনে দিয়ে একজন নার্সকে চলে যেতে দেখলাম।

ডুম, ডুম, ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিং...

নক্ষত্রের নীল আলো জ্বলে শালবনের মাথায় সারি সারি তরুবীথির কথাগুলো যেন লালে লাল, আগুন-লাল। আমি এখন আবার শালবনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার সদ্য বন্ধুর দল আদিবাসী সাঁওতালদের খোঁজে। কিন্তু কই কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না, এমন কি কারোর কোনো কথাও শুনতে পাচ্ছি না। শুধু বাতাসে শন্ শন্ আওয়াজ, সেই হাওয়ায় আদিবাসীরা সবাই হারিয়ে গেলো, হারিয়ে গেলো তাদের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ, এখন আর শুনতে পাচ্ছি না সেই শব্দ ডুম, ডুম, ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিং...

আমাকে এখন একটা কালো পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে। চারদিকে কালো পিচের মতো অন্ধকার থিক্ থিক্ করছিল। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের নির্দেশে

আমাকে এই কালো ভ্যানে করে নিয়ে চলেছে, দু'পাশে সারি সারি ঘনো তরুবীথি। পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথায় বুঝতে পারলাম ওরা আমাকে একটা সরকারী হাসপাতালে নিয়ে চলেছে। হাসপাতাল? চমকে উঠলাম, আমার আবার কি হলো, আমি তো বেশ ভালোই আছি। তাছাড়া আমার শরীর খারাপ, অথচ আমি জানবো না? তবে কি ওরা আমাকে চিকিৎসার নাম করে আসলে হত্যাই করতে চাইছে, যেমন করে আমার অবৈধ বাবা আমার মায়ের গর্ভপাত করতে চেয়েছিল? তার মানে ওরা আমাকে মর্গে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর সেখানে হবে আমার নরক যন্ত্রণা, কাটা-ছেঁড়া, ছুরি চালিয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে ফালা ফালা করে কাটবে এ কাজ হবে আমার ওই বেজন্মা বাপের! না, তার আগেই আমাকে পালাতে হবে। একটা পাঁচমাথার মোড়ে পুলিশের ভ্যানটা থামতেই আমি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে লাফ দিলাম সেখান থেকে। আবার আমার একা একা পথ চলা। আমার চলার পথে যদি কেউ না আসে তবে একাই আমি পথ চলবো, পথ চলাতেই আমার আনন্দ।

আমার চোখের সামনে একটু আগেই আমার নৃত্য-সঙ্গিনীর নগ্নদেহ হিল্লোল নৃত্য করতে করতে তার জরায়ুর মুখটা যেন নীল জ্বলন্ত নক্ষত্র হয়ে গেলো। তার মাথায় এখন এক বন্যপাখির পালক।

রাত শেষে ভোর হলো, তারপর সময়ের হাঁটা পথে পায়ে পায়ে সকাল পেরিয়ে দুপুর হলো। চারদিকে এখন শুধু উচ্ছল রোদে দিগন্ত প্রসারী ফসলের মাঠ। মেয়েটার নগ্ন শরীরের নাচন মাঠের আল দিয়ে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ক্রমশ এগিয়ে আসে। চারদিকে এখন নীল থমথমে আকাশ। আমি একা কোথাও কেউ নেই, শুধু আমার চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়ে,—রূপবতী, রূ-প-ব-তী, রূ-প-ব-তী, হাওয়ার ভেতর শব্দগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়। ফসলের মাথায় এখন নীল নক্ষত্রের মতো যোনি। আমি নিঃসঙ্গ, ভীষণ একা। শুভব্রত আমাকে তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। আমি এখন হাওয়ার ভেতর, আলোর ভেতর, ফসলের ভেতর একটা নীল যোনি দেখতে পাচ্ছি।

ফরেস্ট বাংলোয় আবার ফিরে এলাম। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে এখন শুধু নরনারীর কণ্ঠস্বর। ড্রেসিং মিররে শ্যাম্পুকরা চন্দ্রমুখীর চুল, তার বুকের খয়েরী বোঁটাতে মানুষের মুখের লালার দাগ। চন্দ্রমুখী ট্যাবলেট খেয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে, হিংস্র শ্বাপদের ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণে তছনছ করছে সন্ধ্যে থেকে প্রসাধিত চন্দ্রমুখীর দেহকে। মাঝে মাঝে দু'টি দেহের উত্তাল রক্তের মাদলের তালে তালে। খাটের শব্দ উঠছে খট, খট, খট। একটা হিংস্র শ্বাপদ চন্দ্রমুখীর জরায়ুর মুখে এখন উন্মত্ত। চন্দ্রমুখী মেঘলা জ্যোৎস্নায় উন্মুক্ত বারান্দা পেরিয়ে কলঘরে গিয়ে ঢুকেছে। ফোয়ারা বেয়ে জলের ধারা, নামছে ছরছর শব্দে।

আমি এখন সবকিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করি। আমি এখন আর বন্যনাচে

অন্যদের সঙ্গে সামিল হই না। আমাকে এখন আর শুভব্রতর সঙ্গে ফরেস্ট বাংলোর ঘরে ঘরে ঢুকে দেহক্ষুধার খাদ্য খুঁজতে হয় না। আমি এখন একা হলেও ক্লান্ত নই। কারণ আমি এখন আমার জন্মস্থান সেই নার্সিং হোমের বিল্ডিং-এর লনে রূপবতীকে দেখতে পাই, তার স্পর্শ অনুভব করি, আর দেহের মিষ্টি ঘ্রাণ পাই নাকে, তার নরম শরীরের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। আমি এখন আমার নিশ্চিন্ত আরামের বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি, হাঁটতে হাঁটতে দীঘির সামনে এসে পড়েছি। দীঘির ধারে একজন বিষণ্ণ মুখের মেয়েকে এক বন্যশ্বাপদের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখি, আর তারপর সেই শ্বাপদ মেয়েটিকে ধর্ষণ করে গভীর অরণ্যের ভেতর লাফ দেয়। ঠিক তখন শুরু হয় সেই ধর্ষিতা মেয়েটিকে ঘিরে বন্য হৈ হুল্লোড় এক জায়গায় জড়ো হয়ে কামুক যুবক যুবতী তখন যে দুর্বোধ্য ভাষায় গান গায়, যার ভাষা অন্য কেউ আর না বুঝতে পারলেও আমি কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারি। কারণ আমি যে জানি তাদের কাম-লালসার ফসল তো আমিই, তাদের শ্বাপদ কাম-প্রবৃত্তির ফসল তো আমিই, মাঠে মাঠে যেসব ফসলের চূড়ায় আমি নারী যোনি দেখে এসেছি, তা আমারই এক কামুক মায়ের, যেখানে যে মূর্খ চাষী ফসল ফলিয়েছে, সে তার ফসল তুলতে চায় না, সে পলাতক, আমি এখন আমার অবৈধ পিতা-মাতার অপেক্ষায় রয়েছি, কে আমার ভার নেবে শেষ পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট নয় এখন। জানি না শেষ পর্যন্ত আমার আশ্রয় হয়তো কোনো অনাথ আশ্রম হতে যাচ্ছে। আমি যুবক-যুবতীদের কাউকে চিনি না সেসব।

আমি দীঘির ধার থেকে সরে গিয়ে আবার শালবনে ঢুকে পরেছি এখন। দূর থেকে আবার ডুম, ডুম, ডুম...ডিডিং, ডিডিং, ডিডিং...ডিং, ডিং, ডিং, ডিডিং...

আমি আবার জন্মস্থান নার্সিংহোমে চলে এসেছি, সেখানকার আউটডোরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আউটডোর ফাঁকা, রোগী দেখার সময় নয়, তাই এখানে একমাত্র আলো ছাড়া সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের সেই লাল ত্রিকোণ দেখলাম ধীরে ধীরে একটা মুখোশ হয়ে গেলো। তারপর আর একটা জরায়ুর মুখ হয়ে গেলো। দূর থেকে দেখলাম আমার একদা সঙ্গিনী রূপবতীকে সঙ্গে নিয়ে একটি মস্তান এগিয়ে আসছে, সে এই নার্সিংহোমের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, আর ভরমা এখানকার ক্লাস ফোর স্টাফ। আমি সঙ্গে সঙ্গে আউটডোরের রিসেপসনিস্ট কাউন্টারের অনুকার জায়গায় ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম তাদের পরবর্তী কার্যকলাপ দেখার জন্য। একটু পরেই মস্তান যুবক আদিবাসী যুবতী রূপবতীকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে আমার সামনে দিয়ে নিয়ে গেলো একেবারে এক কোণায়, যেখানে আলো আঁধারির খেলা চলছে। তারা গিয়ে বসলো একটা সোফায়। তারপর সেই সোফায় তাকে চিৎ করে ফেলে দিলো আর ধীরে ধীরে মেয়েটির অর্ন্তবাস খুলে ফেলে ওকে গভীর ভাবে আদর করতে লাগলো। তাকে আদর করে আস্তে আস্তে উল্টো দিক করে

যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাকে প্ররোচিত করতে লাগলো মাস্তান যুবকটি। অবশ্য রূপবতী ঠিক এর জন্যে দেহমনের দিক থেকে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে ভেবেছিল একটু-আধটু সেক্স খরচ করে যুবকটিকে খুশি করতে পারলে নার্সিংহোমে তার নার্সের চাকরীটা স্থায়ী করে নেওয়ার সুযোগ আদায় করে নেবে তার কাছ থেকে, কারণ সে তাদের ইউনিয়নের নেতা, আর নেতারাই তো আজকের দিনে দ্বিতীয় নিয়োগকর্তা। কিন্তু পরে যে এভাবে যুবকটি কাম-লালসার কাছে পরাভূত হতে হবে, সেটা তার জানা ছিল না। সে এখন বেশ বুঝতে পারছে ধর্ষিতা হতে চলেছে সে, কিন্তু তার করার কিছু নেই। তার গলা শুনে কেউ এখন আর আসবে না, কাছেও কেউ নেই। আউটডোরে এখন কেবল তারা দু'জন। এখানে মস্তান যুবকটি যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া দৈহিক বলেও মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেক পিছিয়ে। আমাদের দেশের সর্বক্ষেত্রে পুরুষরাই নারীদের ওপরে থাকে। এমন কি নর-নারী আদিম প্রবৃত্তি দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রেও নারীকে সব সময়েই পুরুষের নিচে শুতে হয়। এক্ষেত্রে পুরুষের চিরাচরিত আকাঙ্ক্ষা এবং দৈহিক শক্তির নিরীখে মাস্তান যুবকটি গায়ের জোরে রূপবতীকে সম্পূর্ণভাবে নগ্ন করে (নিজে আগেই নগ্ন হয়েছিল) তার মধ্যে প্রবিষ্ট হতে উদ্যত হলো। একটু একটু করে রূপবতীর শরীরের নিচে, কোমরের আরো নিচে উরুসন্ধিতে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা অনুভব করলো, মাস্তান যুবকটি ঠিক মতো প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য তার হাতের স্পর্শে মেয়েটির পুষ্ট উরু প্রসারিত করলো। রূপবতী চিৎকার করে উঠলো, 'উঃ লাগছে, আর পারছিনে। যা করার করো আমাকে হত্যা করে করো, তখন আমি তোমাকে বাধা দিতে আসবো না।''...'সুন্দরী রূপবতী, তোমার নার্সের চাকরী স্থায়ী করতে হলে তোমার রূপ থেকে আমার মধ্যে একটু তো খরচ করতে হবে। আর রূপের সঙ্গে তোমার দেহও তো খরচ করতে হবে। না, আর বাধা দিও না খুকুমনি এবার আমাকে খোকনসোনাকে তোমার ঘরে ভালোভাবে প্রবেশ করতে দাও। আমার খোকন একটু লম্বা আর বলিষ্ঠ, তাই তাকে হয়তো তোমার ঘরের দরজায় আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, তুমি যন্ত্রণা অনুভব করছো, দরজার কপাট দুটো পুরোপুরি খুলে দাও, তাহলে দেখবে তখন তোমার আর লাগবে না। লক্ষ্মী সোনা, আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো, বাধা দিও না, অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি মাস্তান যুবকের চোখ মুখ উদগ্র সঙ্গমেচ্ছায় বিস্ফারিত, স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত। উত্তুঙ্গ উত্তেজনার মুহূর্তে দুহাতে রূপবতীর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ওপরের দিকে টানলো, মেয়েটির বিরোধিতা সত্ত্বেও দেহে দেহে যুক্ত হতে বাধ্য হলো, মাস্তান যুবকটি তার বহু প্রতিক্ষিত আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে প্রবিষ্ট হলো রূপবতীর মধ্যে। রূপবতী আর্ত চিৎকার করে উঠলো, হায় ভগবান, আমি ধর্ষিতা হতে চাইনি, উঃ! মাস্তান যুবকটি একতরফা রূপবতীর দেহ উপভোগ

করে উঠে দাঁড়ালো। আসার সময় রূপবতীর কোমর জড়িয়ে ঢুকলেও সে তাকে ধর্ষণ করে একাই বেরিয়ে গেলো আউটডোর থেকে। আর আমি এখন রূপবতীর বুকে উল্কি আঁকা ছুটন্ত হরিণের পিছনে ধাবমান নিষাদকে দেখতে পাচ্ছি। আগে আমাকে শালবনে তার সঙ্গে নাচ করার জন্য রূপবতী যেভাবে আহ্বান করেছিল, এই অন্ধকারের পরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেইভাবে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকলো। আমি এখন এক নীল নক্ষত্রের মধ্যাহ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। রূপবতী ধর্ষিতা, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার ত্রিভুজ এখন মাস্তান যুবকের যৌবনের জারকরসে সিঞ্চিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি আর শুনেছি, রূপবতী স্বেচ্ছায় ওই মাস্তানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় দেহ মিলতে প্রবৃত্ত হয়নি, জোর করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এ হেন অবস্থায় আমার কি করা উচিত? আমি কি ওর হাতছানিতে সাড়া দেবো?

পরের দিন। একটানা অবসাদের মধ্যে আমকে আবার আরেকটা দিন বাঁচতে হবে। স্বপ্নের সেই ঘনজঙ্গলের শহরে আমি এখন আর ফিরে যেতে পারবো না। সেই নার্সিংহোমের সামনে দিয়ে যেতে যেতে নার্সের পোশাকে রূপবতীকে হেঁটে যেতে দেখবো না। আমার মনের দেওয়ালে সেই নির্ঝর নিসর্গের ছবিটাকে এখন আমার আবার মনে হচ্ছে এক জটিল জরায়ুর মুখ রাত্রির রহস্যে আচ্ছন্ন, যার ভেতর নিহিত আছে আমার বিগত রাত্রির স্বপ্ন। গতরাত্রের সমস্ত ঘটনা আর স্বপ্ন এখন আমাকে ভীষণ আচ্ছন্ন করে আছে। আমি আর শুভব্রত সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাই একটা অমোঘ ইচ্ছার তাড়নায়। বদ্ধ ঘরের মধ্যে আবধ্য না থেকে শালবনের একটা নিষিদ্ধ এলাকায় ঘরে বেড়াই। অস্পষ্ট অন্ধকার, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। শুকনো পাতায় নর-নারীর দুটি শরীরের মিথুনাবদ্ধতার শব্দ হয়। নারী সঙ্গোমলোভী ইতস্তত তৃষ্ণাকাতর যুবক যুবতীরা ঘুরে বেড়ায়। প্রতিদিন আমরা কি ভয়ঙ্কর ভয়াবহভাবেই না বেঁচে আছি হয়তো বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েছি। জীবনের স্বাদ আমাদের বিষামৃতে ভরা। যেন কোথায় আমরা ভীষণভাবে দায়বদ্ধ। আমার চোখের সামনে আমার মনের দেওয়ালের ছবির জটিল জরায়ুর মুখ। আমি এখন শুভব্রতকে ছেড়ে চলে যেতে চাই। ও ওর সঙ্গিনী দেবলীনাকে নিয়ে পড়ে থাকুক। আর আমি ফিরে যেতে চাই আমার প্রিয়সঙ্গিনীর কাছে যার চোখের ভালোবাসার দৃষ্টিতে স্নান করেছি। সেই স্নানে আমার শরীরের সব ক্লেদ আর ময়লা মুছে গেছে। এই ময়লা আর ক্লেদ হলো আমার মায়ের জীবিত থাকার সময় আমার অবৈধ কামুক পিতার, তার কামনার জারকরস, যা সভ্য সমাজের কাছে ঘৃণিত, নিন্দিত এবং ধিকৃত। শুভব্রত হয়তো বলবে, চুপ কর গর্দভ, মেয়ের চোখের ভালোবাসার কথা বলছিস? তুই কি দেখেছিস মেয়েদের তলপেটের নিচের সেই জঙ্গলী চোখকে, আরো ভয়ঙ্কর কুৎসিত ভাষায় সে আমাকে খিস্তি করলো, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হয়তো সে আবার বলবে, বিয়ে করে বৌ নিয়ে

দুদিন রাতে খাট কাঁপিয়ে ভালোবাসা, তারপর তো সারা জীবন ছুঁচোর কেত্তন। শুভব্রত আমায় সঙ্গ ছাড়বে না, হয়তো আমায় আজ রাতে নিয়ে যাবে সেই শালবনের নিষিদ্ধ এলাকায় সেখানকার আনাচে কানাচে আমাকে শুনতে হবে আশ্লেষকাতর কণ্ঠস্বর, জীবনের রিরংসারমুক্ত পুরুষের কান্না আকুতি। মেয়েদের চপল হাসি। রূপবতীর মতো যুবতী এবং গৃহবধূ জান্তবভাবে ধর্ষিতা হবে। আমার দ্বিতীয় রাতের স্বপ্নে আমি আগুন রঙের মিনিস্কার্টের ইন্দ্রজানিক নৃত্য দেখতে পাচ্ছি, আমার চোখর সামনে নক্ষত্রোজ্বল যোনি ফসলের মধ্যে আস্তে আস্তে মধ্যাহ্নের মতো নার্সি হোমের বিল্ডিং, স্বপ্নের মধ্যে ড্রেসিং মিররে শ্যাম্পু করা চুল, শায়ার গিঁট আলগা হওয়া কোনো ঘরের রতিরণক্লান্ত দেহাপজীবিনীর বুকের খয়েরী চাকতিতে শুভব্রতর লালাসিক্ত ওষ্ঠের দাগ।

দেবলীনা, আমি চলে গেলে শুধু তোমাকেই আমার ঠিকানা দিয়ে যাবো, আমার ঘরে দেওয়ালের জটিল জরায়ুর মতো নির্ঝর নিসর্গের ছবিতে তখন দূর আকাশের নীল নক্ষত্রের আলো এসে পড়বে।

আমার সব আছে, অথচ কি আশ্চর্য সব কিছু থেকেও আমি নেই। একটা ডেলা পাকানো রূপান্তরিত শরীর আমার। দুদিন আগে অতি ক্ষুদ্র শূক্রকীট থেকে ভ্রূণ হয়ে যে আমি জন্ম নিয়েছিলাম, কুমারী মায়ের জঠরের অন্ধকারে থাকার সময়েই শুনেছিলাম, আমাকে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর অনাত্মীয় আকাশের নিচে ওরা ফেলে যাবে আমাকে কোনো নার্সিংহোমে কিংবা রাস্তার ডাস্টবিনে, ছুরি আর কাঁচির যৌথ আক্রমণে। কুমারী মায়ের যোনিপথ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হয়েছিল, হে ঈশ্বর তুমি কোথায়? আমার ভীষণ ইচ্ছে এখন বয়স্ক পুরুষের মতো বীর্যপাত করি কোনো অবাঙালী রমণীর যোনির ভিতর, কারণ শুনেছি, অবাঙালী রমণীও আজকাল বারোয়ারি। নরম মাংসের ভিতরে ফোলানো বেলুনে যদি কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারে আমার সৃষ্টি দশমাস, দশদিন তাহলে তো আর কথাই নেই। ব্যাটা নিশ্চয়ই জন্মাবে চোটপারিয়ামল হয়ে তারপর? তারপর আমি তখন অবাঙালী বাবার অবৈধ পিতা, ব্যাটা আমার ভেজান পথে টাকার কুমির হয়ে এবং আমার মতে পৃথিবীর যাবতীয় পূর্ণ্যকে নির্বিচারে হত্যা করতো, যাতে করে তারা শয়তানের আর জন্ম দিতে না পারে। আর সেই অবসরে আমি রাজধানীতে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতাম আমার অবৈধ অবাঙালী বাবার কালো টাকায় কতগুলো এম. পি. কিংবা এম. এল. এ. কেনা যায়? তারপর? প্রধানমন্ত্রী, না হয় অন্তত কোনো প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আসন আমার পাকা তখন। আমি তখন এক অবৈধ সরকারের নেতা, এবং সেই সঙ্গে সব জংলী কানুনের প্রণেতা। তারপর সকাল হতেই সেই অবৈধ সরকারের রক্ষিতা। দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখতাম, বড় বড় ব্যানারে ছাপা, ভ্রূণ হত্যা পাপ নয়। এই নিষ্ঠুর আইনটা পাশ হয়ে গেছে ভোটাধিক্যে। আর তারপরেই দেখলাম,

এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে আমি নিঃসঙ্গ একা, আমার অবৈধ পিতা-মাতা ফেলে গেছে ডাষ্টবিনে।

আমরা কথা বলতে পারি না, তাই জানা নেই ভাষা প্রতিবাদের এবং তার প্রতিকারের। আমাদের ভ্রূণ-গোষ্ঠীর হয়ে কে যেন প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, কিন্তু পাত্তা পায়নি, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। ফেরার পথে দেখেছিল কুমারী জননীর, উরু চিতিয়ে রোদ পোয়ানোর দৃশ্য। এবং সেই শয়তানটা আবার পচা শামুকের গন্ধভরা যোনিদ্বারে তার নাক ঠেকিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছে জানোয়ারের মতোন। আর ওদিকে তার লিঙ্গাগ্রে মাথা রেখে দু'দণ্ড বিশ্রাম নিচ্ছে কুমারী জননী। কিংবা এও হতে পারে তাতিয়ে নিচ্ছে তার রতিক্রিয়ার যন্ত্রটা, যেমন করে তাতিয়ে নেয় হাতলটা ভাঙ্গা থালা-বাসন জোড়া লাগানোওয়ালারা ঝাল দেওয়ার আগে। তারপর রাত্রি নামলে পর চলবে সারারাত ধরে দুই বিপরীত দুই মুখ, দুই বুক, এবং দু'জোড়া উরুর সন্ধি স্থলের যোগাযোগ। অর্থাৎ সঙ্গম!

এভাবে আরো কতো ভ্রূণ হত্যা সংঘটিত হবে কে জানে!

আমার অবৈধ পিতা রাতের অন্ধকারে আমাকে শহরের এক নিরালা রাস্তার ডাস্টবিনে একটা র‍্যাশনব্যাগে পুরে ফেলে রেখে গেছলো। পরের দিন সকালে একজন কাজের মেয়ে আমাকে ডাস্টবিনে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে প্রথমে পাড়ার ছেলেদের খবর দেয়, তারা এসে প্রথমে আমাকে র‍্যাশন ব্যাগ থেকে মুক্ত করে পুলিশে খবর দেয়। কালো পুলিশভ্যানে করে আমাকে একটা সরকারী হাসপাতালের সেমটারনিটি সেকশনে ভর্তি করে দেয়। আপাতত একজন মেট্রনের ওপর আমার দেখভালের ভার দেওয়া হয়েছে। নার্সদের কথাবার্তা থেকে আমি জেনেছি, আমাকে দত্তক নেবার জন্য ইতিমধ্যেই অনেকেই আবেদন করেছে। জানি না আমার ভবিষ্যৎ কোথায় নির্ধারিত হবে!

পরকীয়া প্রেম

উজ্জ্বলকুমার দাস

অনেক অভিধান ঘেঁটে আমার স্ত্রীর নাম রেখেছিল আমার শ্বশুরমশাই 'মধুমতী'। তখন অবশ্যই সবই জড়পিণ্ড। অয়েল ক্লথের উপর এক টুকরো ছোট কাঁথা আর তার উপর আমার প্রাণের বউ। কিন্তু তিনি যেই ধেড়ে হলেন, ব্যস্!

যখন আমি বিয়ে করবার জন্য আমার স্ত্রীকে প্রথম দেখতে গেলাম, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম আপনার? তখন লাজুক লাজুক মুখে বেশ মিহি সুরে টেনে বলল 'মধুমতী সাহা'।

আমার কানে তখন এমন সুর বেজে উঠল, যে মনে মনে বললাম আহা আহা...। কিন্তু বিয়ের তেরাত্তির পেরোতে না পেরোতেই মধুমতী, মধুমতীর খোলস ছেড়ে সংসারের সার্কাসে ভানুমতীর খেলা দেখাতে শুরু করে দিল। তখন মধুমতীর কোথায় সেই মধু, আর কোথায় সেই মতি। সব গুবলেট।

তারপর তো কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার স্ত্রীর শরীরে যাবতীয় রোগের আড্ডা বাসা বাঁধতে শুরু করল। দিনে দিনে গায়ে গতরে ফুলতে শুরু করল যেন ঠিক বম্বের টুনটুনের দ্বিতীয় সংস্করণ। তারপর এসে উপস্থিত হলো বাত, দন্তশূল, অম্বল ইত্যাদি। সব যেন হাত ধরাধরি করে লাইন ধরে আসছে আর যাচ্ছে। এ যেন এক নিরন্তর গতি। জীবনটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভাবি বিয়ে করে কিই না ভুল করেছি। কিন্তু এ ভুল সংশোধন করবার কোন উপায় নেই। ভুল সংশোধন কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় চলে, কিন্তু জীবন খাতায় একদম চলে না।

কিছুদিন হলো আমাদের পাশের দোতালায় হরিহরবাবুর একখানা ঘরে একজন আটাশ-তিরিশ বছরের অবিবাহিতা মহিলা ভাড়া এসেছেন, একলাই থাকেন। ঘরটা আবার আমার শোবার ঘর থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দেখতে খুব একটা মন্দ নয়। ছুটির দিনে প্রায়ই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। একদিন আমার শ্যামলী ও ঘরের মধ্যে হালকা সুরে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা গেয়ে চলেছে। আর আমি ওর দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি। হঠাৎ দেখি আমার পিছনে আমার স্ত্রী মধুমতী কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে বলল, 'কি গো, কখন থেকে যে ডাকছি বাজারে কখন যাবে, তা কানে কোন কথাই ঢুকছে না, ঐ দিকে কি অতো মন দিয়ে দেখছ দেখি, বলে জানালার সামনে

গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে শ্যামলী নেচে সেই গানটা গাইছে, ব্যস—

'হ্যাঁ, তাইতো', বলে চোখগুলো বড় বড় করে বলল, 'আমার কথা শুনবে কি করে', আমি গোবেচারির মতো বললাম 'কেন কেন কি হয়েছে?'

—কি আর হবে, ভাগ্যিস আমি দেখলাম। আরো পরে দেখলে কি সর্বনাশই না হয়ে যেত।

—কেন, কি সর্বনাশ?

—দেখো অত ন্যাকামো কোর না তো। সকালবেলা ঐ জানলা দিয়ে ঐ ছুঁড়িটার নাচ দেখছিলে না? ভাবো আমি কিছু বুঝি না? ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, না?

সব বৌদেরই এই একই রোগ, নিজের শাড়ীর মতো নিজের স্বামীটিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে, অন্য কেউ তা গায়ে জড়াক, তা তারা মোটেই পছন্দ করে না।

থাক্, স্ত্রীর ধাতানী খেয়ে লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবীটা গলিয়ে বাজারের থলিটা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা দিচ্ছি, ঠিক এমন সময় রান্না ঘর থেকে সাতবাড়ি শুনিয়ে মধুমতী বলল, 'রুই মাছের মাথা এনো কিন্তু।'

মাসের শেষ, রুই মাছের মাথা? মনে মনে গালাগাল দিয়ে বললাম, 'রুই মাছের মাথা না এনে তোমার মাথা আনবো।' বলে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তায় নেমেই আবার চোখটা চলে গেল সেই হরিহরবাবুর দোতলার বারান্দায়। তাকিয়ে দেখি শ্যামলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে ছড়িয়ে আছে একরাশ কালো চুল। যেন কোন তেল কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের মডেল। আমার দিকে চোখ পড়তেই শ্যামলীর ঠোঁটে একটু হাসি খেলে গেল। হঠাৎ আবার মধুমতীর কথা মনে পড়তেই, পেছনের দিকে আমার বাড়ির বারান্দায় তাকিয়ে দেখলাম মধুমতী দাঁড়িয়ে আছে কি না। না নেই। তাই আমিও শ্যামলীর দিকে একটু মুচকি হেসে বাজারের দিকে রওনা হলাম।

প্রতি রবিবারই বাজার সেরে আসবার সময় শম্ভুর দোকানে কাঁচাপাকা দাড়িগুলো একটু কামিয়ে আসি। সেদিনও শম্ভুর দোকানে গিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে বসলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে কিরকম বুড়ো বুড়ো বলে মনে হলো। সারা মাথায় কাঁচাপাকা চুলে ভর্তি। গালে এক গাল দাড়ি। পাকা চুল নিয়ে আর যা কিছু করা যায় কোন সুন্দরী যুবতীর হৃদয় কখনই জয় করা যায় না। স্বামীর চুল পেকে গেল, বৌরাই ঘ্যানঘ্যান করে, আর প্রেমিকা! ওরা তো পাত্তাই দেবে না। যাইহোক, শম্ভুকে বাকীতে চুলটা ভালো করে কলপ করিয়ে নিয়ে, মুখের দাড়ি কেটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। বয়স যেন অনেক কমে গেছে। যাইহোক খোশ মেজাজ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম বেলা এগারোটা। আমার পায়ের শব্দ শুনেই মধুমতী মধু বর্জন করে চীৎকার করে বলল, 'কি হলো, বাজারে গিয়ে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

—তোমার মাথা আনতে গিয়ে সরি, রুই মাছের মাথা আনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

মধুমতী কথা বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একবারে 'থ'। তারপর বলল "একি পাকা চুল কালো, হলো কি করে? কলপ করেছ নাকি?'

আমি তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে বললাম, "আমায় বেশ যুবক যুবক মনে হচ্ছে না?"

—যুবক! তোমায় ঠিক দাঁড়কাকের মতো দেখাচ্ছে। ময়ুরের পুচ্ছ লাগালে যেমন দাঁড়কাক ময়ুর হয় না, তেমন আধবুড়ো পাকা চুলে কলপ দিলে যুবক হয় না।

শুনলেন তো, আমার স্ত্রীর কথা। সব সময়ই বাঁকা বাঁকা কথা। কোথায় একটু আমায় যুবক বলে প্রশংসা করবে, তা না, শুধু সব সময় খোঁচা মেরে কথা।

আজকাল একটু স্মার্ট হয়ে চলতে চেষ্টা করি। মেয়েরা আবার একেবারে ল্যালাক্যাবলা ছেলে একেবারেই পছন্দ করে না। তাই ধুতির বদলে একটু প্যান্ট সার্ট সঙ্গে বুট পরে অফিসে বেরই। এই দেখেও স্ত্রী-এর মনে জ্বালা। হঠাৎ একদিন বলল "কি হয়েছে বলতো। তোমায় আজকাল প্রায়ই লক্ষ্য করি বুড়ো বয়সে ছোঁড়া সাজবার সখ হয়েছে। প্রেমে টেমে পড়লে নাকি?'

আমি একগাল হেসে বললাম, "ঘরে এমন সুন্দরী থাকতে, অন্যদিকে কি করে তাকাই। আর তাছাড়া এখন কি আর প্রেমের বয়স আছে।" অমনি গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দেয়, 'ছ্যাঁ, প্রেমের আবার বয়স। তোমাদের পুরুষ জাতটাকে একদম বিশ্বাস করি না। যত বুড়ো হয় তত বেশী বজ্জাত হয়।

ওমনি আমার মাথাটা টগবগিয়ে ফুটে উঠল। 'দেখ জাতটাত তুলে কথা বলবে না। আর তাছাড়া তোমার মতো এরকম খিটির-মিটির করা বউ ঘরে থাকলে, স্বামীরা তো বিগড়ে যাবেই।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমার মধুমতী গর্জে উঠে এমন বলল, 'কি আমি তোমার সাথে খিটির মিটির করি।' এই আওয়াজে পাড়ার যেন একটা ছোটখাটো ভূমিকম্প হয়ে গেল।

পরদিন অফিসে বেরোচ্ছি, ঠিক এই সময় আমার গিন্নী গ্যাসের চোতাটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, যাওয়ার সময় একটু বুক করে যেয়ো। ব্যাস! অফিসের বারোটা, ভাগ্যিস সরকারী অফিসের কেরানী।

তারপর নাচতে নাচতে গিয়ে হাজির হলাম গ্যাস দাদার কাছে। পাড়ার কাছে একটা বাড়ির গ্যারেজ ঘরে গ্যাস ঘর। ঐ ঘরে একটা টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে আছেন আমাদের গ্যাসদাদা, আর তার সামনে এক বিশাল লাইন। গ্যাসের লাইনে সবাই প্রশ্নকর্তা, আর সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে চলেছেন গ্যাসদাদা। সব প্রশ্নকর্তারই একই প্রশ্ন, দাদা কবে পাঠাচ্ছেন? বাচ্চারা কাঁদলে যেমন বড়রা টফি নিয়ে বলে "আর কেঁদো না সোনা! আর কেঁদো না—" ঠিক তেমনি গ্যাসদাদা সবাইকে বলে চলেছেন, 'এই দু-চার দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন।' ছেলেদের লাইনের সাথে ফুরফুরে সব

সুন্দরী মহিলাদের লাইন। সব নতুন সংসার করছে। স্বামীরা সব অফিসে বেরিয়েছে। আর গিন্নীরা সুন্দর পারফিউম মেখে গ্যাসের দোকানে লাইনে। হঠাৎ দেখি লাইনে সেই আমার পাশের বাড়ির শ্যামলী।

শ্যামলীকে দেখেই মনটা কি রকম পাক দিতে শুরু করল। কি করে শুরু করি কথা, যদি কথা বলতে গিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা বলে ফেলি, তাহলে তো আর রক্ষা নেই। এই বয়সে পাবলিকের হাতে মার খেয়ে আমাকে এই ধরাধাম ত্যাগ করতে হবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি আমার পায়ের সামনে একটা সুন্দর রুমাল পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি তুলে শ্যামলীর দিকে হাসি হাসি মুখ করে বললাম, 'এটা কি আপনার?'

শ্যামলীও হাসির বিনিময়ে হাসি দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমার। তারপর আমার হাত থেকে রুমালটা নিল। রুমালটা নেওয়ার সময় শ্যামলীর নরম নরম হাতের ছোঁয়ায় আমার শরীরের রক্তে এক শিহরণ খেলে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে শ্যামলীর সাথে আলাপ জমাতে শুরু করলাম। আর মনে মনে আমার মধুমতীকে ধন্যবাদ দিলাম। মধুমতী যদি আমায় আজ এই গ্যাসদাদার কাছে না পাঠাত তাহলে শ্যামলীর সাথে আলাপ করার সুযোগ পেতাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনেরই গ্যাসদাদার সাথে কথা চুকে গেল। তারপর ঐ গ্যারেজ ঘর থেকে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে এবং দিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালাম।

শ্যামলী আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

—আমি ডালহৌসী।

—ভালই হলো। আমিও ঐ পথেই যাব। চলুন একসাথে যাওয়া যাক।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালাম বাস স্ট্যান্ডে। লোকে লোকারণ্য। সবাই বাসে উঠবে। বাস আসছে, কিন্তু তাতে খুব কম লোকই উঠতে পারছে। বেশীর ভাগ বাসই বাদুড়ঝোলা।

তারপর অনেক কষ্টে একটা বাসের মধ্যে আমি আর শ্যামলী দেহের কসরৎ দেখিয়ে উঠলাম। বাসে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। শ্যামলীর শরীরটা আমার শরীরের উপর লেপটে আছে। আমার বুকের উপর পড়ে আছে ওর সুগন্ধী একরাশ কালো চুল। তার গন্ধে আমি মোহিত হয়ে উঠেছি। জীবনটা যেন মনে হচ্ছে কবিতা। হঠাৎ মনে হয় একি করছি আমি। এ পাপ। ঘরে আমার স্ত্রী আছে। শ্যামলীর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাই। কিন্তু নিরুপায়। বাসের ভীড়ে এপাশ থেকে ওপাশ হবার উপায় নেই। কি সুন্দর নরম তুলতুলে শরীর। মনে হয় যেন ভগবান মোম আর মাখন মিশিয়ে শ্যামলীর শরীর তৈরী করেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলাম ডালহৌসী। সময় যেন হুস্‌হুস্‌ করে চলে

গেল। রোজ বাসে যেতে যেতে জ্যামে পড়তে হয়। কিন্তু আজ একদম জ্যাম নেই। বাস থেকে আগে নেমে রাস্তায় পা রেখেছি। শ্যামলী নামতে গিয়ে হঠাৎ দেখি পড়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাতটা এগিয়ে দিলাম। আমার হাতের উপর ভর দিয়ে টালটা সামলে নিল। এদিকে আমার হাতটাও ধন্য হলো।

তারপর দুজনে নেমে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম। আমি আমার অফিসে ঢুকে গেলাম, আর আমার অফিসের পাশের বিল্ডিং-এ একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে শ্যামলী। সত্যি, একথা ভাবা যায় না। যাক্, আসবার সময় আবার আমরা দুজনে ফিরি। শ্যামলীর অফিসে রোজ নটায় হাজিরা। কিন্তু আমার সরকারী অফিস। যখন হোক গেলেই হয়। বডিটাকে একসময় অফিসের মধ্যে শো করতে পারলেই ব্যাস্। মাঝে মাঝে অবশ্য অফিসের হেডক্লার্ক থাকে, আমরা সম্মান দিয়ে বড়বাবু বলি। তিনি আমায় অনেকদিন বলেছেন যে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। কিন্তু আমি ওসব কথায় কোনদিনই কর্ণপাত করিনি। এ পৃথিবীতে বাঁচতে গেল সব কথা কানে তুলতে নেই। যদিও তা ঢোকাই তা অপর কান দিয়ে আবার বাতাসে ছেড়ে দি। আমার দেরীতে আসার সুবাদে অনেকেই আমায় মাঝে মাঝে রঙ্গরসিকতা করে (অর্থাৎ যার অপর কথা টিপ্পনী কাটে)। আমার নাম দিয়েছিল 'লেটুবাবু'। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যেমন চলছি তেমন চলব। চাকরী তো যাওয়ার কোন ভয় নেই। এতো আর প্রাইভেট ফার্ম না। যে একটু দেরী হলেই মাইনে কাটা। তারপরেও যদি বেয়াদপি করি, চাকরী নট্। এ হচ্ছে সরকারী অফিস। একদিনের কাজ দশদিনে করবো, মাঝে মাঝে 'ওভারটাইম' করবো। আর মাঝে মাঝে অফিস থেকে মাইনে বাড়ানোর দাবীতে বিরাট মিছিল করে সারা কলকাতার বুকে ট্রাফিক জ্যাম করে অবশেষে এসপ্ল্যানেড ইষ্টে বিরাট জনসমাবেশে যোগ। বড় বড় নেতাদের বড় বড় বুলি। আমি অবশ্য বড় বড় নেতা না হলেও ন্যাতা তো বটে। অফিসে রাজনীতি করি। তাই রাজনীতির নেতাদের আজকাল খুব একটা কেউ ঘাঁটাতে চায় না। একটা প্রচলিত কথা আছে যে "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা, আর আজকালকার রাজনীতির দাদারা ছুঁলে একশ ঘা।"

যাক্, আপনাদের সামনে আমার উপর বৈপ্লবিক চরিত্রের পরিচয়টা দিতে চাই না।

এবার আমার ফুলটুসি, আমার প্রাণকুমারী শ্যামলীর কথা বলি। এখন রোজই সকাল আটটার মধ্যে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই। ঐসময় শ্যামলীও বাসে ওঠে। একই সাথে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কখনো বা ভাগ্যে কুলোলে পাশাপাশি বসে দুজনে সুখ দুঃখের কথা বলতে বলতে অফিসে যাই। এ যে কি থ্রিলিং তা ঠিক মুখে বলা যায় না।

আমাকে এত সকাল সকাল দেখে অফিসের লোকেরা তো একেবারে 'থ'। কি হলো! আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো এর রহস্য। কিন্তু সত্যি কথাটা

বলতে পারলাম না।

অফিসে ফেরার সময়ও প্রায়ই আমরা একটুখানি হেঁটে আউটট্রাম ঘাটে গিয়ে পাশাপাশি বসতাম। নানারকম কথা বলতাম। সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে ওর দিকে হাত বাড়াতাম। শ্যামলী অবশ্য এসব কিছু আপত্তি করত না। মনে হত শ্যামলীও বোধহয় আমাকে ভালবাসতে চাইছে কেউ কি কোনদিন একা বাঁচতে পারে। সবাই সঙ্গ চায়, সঙ্গী সঙ্গীনী চায়। প্রায় লক্ষ্য করতাম, শ্যামলীর মধ্যে একটা পাপের প্রবল আকর্ষণ আছে।

মধুমতী দু-চারদিনের জন্য তার পিত্রালয়ে গেছে। আমি একেবারে ঝাড়া হাত-পা। একদিন রবিবার শ্যামলী আমায় সকালে চা জলখাবার নিমন্ত্রণ করেছে। সকাল সকালই চলে গেছি, গিয়ে দেখি চারদিক নিস্তব্ধ। কাউকে না ডেকেই ঘরে ঢুকে দেখলাম, শ্যামলী বড় লোভনীয় ভঙ্গীতে বিছানায় শুয়ে আছে। বুকের ওপর থেকে শাড়ির আঁচলখানা সামান্য সরানো। পরনে লাল রঙের ব্রাউজ। শরীরটা যেন সেই ব্লাউজ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা কিরকম ওঠা-নামা করছে। কি করব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমার পায়ের আওয়াজে শ্যামলী চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়েই আমায় জিজ্ঞেস করল, কি কতক্ষণ এসেছেন?

—এই এইমাত্র। আপনি ঘুমোচ্ছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। এই একটাই তো ছুটির দিন।

তারপর শ্যামলী এক মারাত্মক ভঙ্গীতে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। আমি সেই সুযোগে শ্যামলীর গোপন জায়গাগুলো দেখবার অবসর পেলাম। আমাকে বসিয়ে রেখে শ্যামলী কলঘরে গেল। তারপর বেশ ফ্রেশ হয়ে এসে আমায় জিজ্ঞেস করল 'কি, চা না কফি?' আমি উত্তর দিলাম 'কফি'। আমার উত্তর নিয়ে আবার জোরালো গতিতে কিচেনে চলে গেল। ইতিমধ্যে খবরের কাগজওয়ালা ছুঁড়ে কাগজখানা ঘরে দিয়ে গেল। একটু হলেই আমার নাকে এসে লাগত। ভাগ্য ভালো লাগেনি। খবরের কাগজখানা তুলে পড়তে লাগলাম। ইতিমধ্যে শ্যামলী কফি আর অন্য খাবার নিয়ে এসে হাজির।

শ্যামলী একগাল হেসে বলল, নিন, খেয়ে নিন।

আমি তো খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক। আমি ভদ্রতার খাতিরে হেসে বললাম, 'আমার জন্য আবার কষ্ট করে এতসব করতে গেলেন কেন?'

—'না কষ্ট কিসের, আমার আবার নিত্যনতুন খাবারদাবার তৈরী করতে খুব ভালো লাগে। তখন আমার মধুমতীর কথা মনে পড়ল। মধুমতীর কাছে সকালে সামান্য একটু চা চাই। তার বদলে পাই এক কাপ ঘৃণা।

আমার চোখ দুটো ঐ খাবারের প্লেটের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে খাবারগুলোকে আমার নরম আঙুল দুটো মুখের ভিতরে চালান করে দিতে লাগল। তারপর এল রসবড়া। আমি মুখে পুরে দিয়ে বললাম—দারুণ হয়েছে। এ

যেন ঠিক মনে হচ্ছে প্রেমের রসবড়া।

আমার কথা শুনে শ্যামলী তো হেসে কুটিপাটি।

—'কেন ভুল কথা বললাম'।

—'না তা কেন! আপনি বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন বটে।

তারপর খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ। এবার আমি আর শ্যামলী গল্পের পর্বে। শ্যামলী বিছানায় আর আমি হাত কয়েক দূরে সোফাতে গা টাকে এলিয়ে বসেছি। গল্পের মাঝে মাঝে শ্যামলী বিছানায় গড়াতে গড়াতে এমন এক একটা ভঙ্গী করছে, যেটা অনেক সময় বাজারের কোন চালু বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। আর উত্তেজনায় আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ভরাট হয়ে উঠছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে উত্তেজনা কাটাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফল হলো না।

আবার কথা। একথা থেকে সেকথা, আর সে কথা থেকে একথা। শ্যামলীর বুকের নীচে একটা নরম বালিশ। দু' কনুই বিছানার উপর গেঁথে রাখা। হাতের চেটোয় মুখখানাকে ধরে রাখা। ঘাড়ের পাশ দিয়ে কালো চুলের ঢল নেমে এসে গড়িয়ে পড়েছে বালিশের উপর। পা দুটোকে ভাঁজ করে একটু একটু করে দোলাতে শুরু করেছে শ্যামলী। শাড়িটা কুচিয়ে হাঁটু অবধি এগিয়ে আসায় শুভ্র নরম পা দুটেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ও দুটোকে জড়িয়ে ধরে খেলা করতে ইচ্ছে করছিল। অথচ নড়বার ক্ষমতা তখন হারিয়ে ফেলেছি। বুকের ভেতরটা টেনশনে দপদপ। কেমন যেন একটা উত্তেজক শব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলী শরীর দেখাতে জানে। অপরের শরীরে আগুন ধরাতেও জানে।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি। আর ঠিক সেই সময় শ্যামলী আবার অন্য পোজ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাঁকা হয়ে একপাশে নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়ে দুষ্ট-মিষ্টি ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছেন?'

আমি যে শ্যামলীর কাছে ধরা পড়ে গেছি তা আর বুঝতে দেরি হলো না। আমি তাই আমার...ঢাকবার জন্য আমতা আমতা করে বললাম, 'কই কিছু না তো।'

—কিছু না তো মানে, এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলেন। আপনার না বয়স হয়েছে। আপনার ঘরে স্ত্রী আছে।

একথা শুনে না আমার মাথা দিয়ে আগুন বেরোতে শুরু করল। ঘরে স্ত্রী আছে ঠিক কথা। কিন্তু আমার বয়স তুলে কথা বললে ভীষণ খারাপ লাগে। আমার কি এমন বয়স হয়েছে। দু-একটা চুল পেকেছে। কিন্তু সে তো আমি কলপ করে চুল কালো করে দিয়েছি। তুমিই বা কি এমন কচি খুকি? তোমার বয়সও তো পেকেছে। চামড়ার চেকনাইকে কসমেটিক্স দিয়ে বাড়াতে হয়। যেসব জায়গায় যৌবন, সে সব জায়গাগুলোও সামান্য ঝুলে পড়েছে। তুমি কি ভাব তোমার আর সে বাজার আছে যে তোমাকে দেখে দুনিয়ার যুব সমাজ হামরে পড়বে? আমার বউটা নেহাত আমায় গাল-মন্দ দেয়। একটু সোহাগ টোহাগ করে না। তার উপর অনেকদিনের পুরনো

মাল। তাই একটু নতুনের স্বাদ পাবার জন্য তোমার কাছে আসা। না হলে, তোমার কাছে আমার আসতে বয়েই গেছে।

আমার উপরিউক্ত কথাগুলো অবশ্য সবই মনে মনে। ভাষায় প্রকাশ করলেই এক্ষুণি এমন এক ক্যাঁত করে লাথি কষাবে না। পাক খেতে খেতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে সেই নর্দমায়। তার থেকে চুপ মেরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর তাছাড়া মেয়েছেলের কথায় বেশী কান দিতে নেই। কান দিলেই অশান্তি।

আমি আবার খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাই আমি যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। যাক্, শ্যামলীর সাথে কথা না বাড়িয়ে একটু চা খাবার প্রস্তাব রাখলাম।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি চা তৈরী করতে গেল। হঠাৎ একটা উঃ উঃ করে শব্দ। আমি তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি বাঁ হাত দিয়ে ডানহাত খানা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। চোখ ছলছল্।

আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? কোথাও পুড়ে গেল নাকি?

শ্যামলী ডান হাতের মাঝখানটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে এইখানটা পুড়ে গেছে। জ্বালা করছে।

পুড়ে যাবার বিশেষ লক্ষণ আমার অবশ্য চোখে পড়ল না। হাতের মাঝখানে সামান্য একটু ফোসকা।

তবুও দরদী কণ্ঠে বললাম, 'ইস, খুব জ্বালা করছে তাই না? কি করে পুড়ল?'

—এই একটু পাঁপড় ভাজতে গিয়েছিলাম, আর তেল ছিটকে এসে পড়েছে।

—কি দরকার ছিল। একটু আগেই তো এত সব খেলাম। এখন শুধু চা হলেই হতো।

—থাক, চলুন বার্নল জাতীয় মলম আছে?

—হ্যাঁ আছে, কিন্তু ও তো লাগালে খুব জ্বলবে।

—আরে, না না, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।

তারপর আমি শ্যামলীকে রান্নাঘর থেকে এনে ধীরে ধীরে নরম বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সামনের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে শ্যামলীর নগ্ন হাত। আমি বার্নলের টিউব থেকে মলম নিয়ে হাতে বার কয়েক ঘষতেই হাতের জ্বালাটা কমে গেল। শ্যামলী মিষ্টি হেসে বলল, আপনি বেশ যাদু জানেন দেখছি। আমার জ্বালাটা অনেকটা কমে গেছে।

—আপনার জ্বালা জুড়োবার জন্যই তো আমার বেঁচে থাকা। যেদিন থেকে শুনেছি আপনার প্রেমিক আপনাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছে, আর সেই দুঃখে আপনি এখনো বিয়ে করেন নি, সেদিন থেকেই বুঝেছি আপনার কত দুঃখ, কত জ্বালা।

শ্যামলী বলল, "নিন্, এবার হাতটা ছাড়ুন, অনেকক্ষণ ধরে আছেন।"

—হাতটা ছাড়তে প্রাণ চায় না, মনে হয় চিরকাল ধরে রাখি। কি সুন্দর আপনার হাতখানা, কি নরম। ঠিক মাখনের মতো।

শ্যামলী মুচকি হেসে বলল, "তাই নাকি! আপনার স্ত্রী-এর হাতও তো ঠিক

এইরকম তাই না।"

—কি যে বলেন। সে হাত তো শিলনোড়ার মতো শক্ত পাথর। আদর করে ধরলে হাতের মালিক খ্যাঁক করে ওঠে। আমার কথা শুনে শ্যামলী বলল, আপনারও খুব দুঃখ তাইনা।

—হ্যাঁ, কে আর বুঝলো বলুন।

এদিকে শ্যামলী আমার পাশে এসে, গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে। আর তখনই আমার একমাত্র স্ত্রী মধুমতীর কথা মনে পড়ছে। গায়ে গায়ে শ্যামলী। ত্বকে ত্বকে শ্যামলী, দেহের উত্তাপ, চুলের সুগন্ধ, শরীরের পাহাড়-পর্বত উপত্যকায়।

ধ্যাত তেরিকা, মধুমতী মোটা, অম্বল, বাতের রুগী। ধীরে ধীরে আমার একটা হাত শ্যামলীর কাঁধ আর খোঁপার ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে আঙুলগুলো ওপাশের বুকের ওপর খেলা করছে। এদিকে শাড়ির একটা দিক খুলে পড়েছে। শ্যামলীর বিশাল খোঁপাসহ মাথা আমার কাঁধে। উত্তেজিত গরম নিঃশ্বাসে আমার বুক ওঠা নামা করছে। খোঁপা খুলে গেছে, তখন আমি ভাবছি, শ্যামলী কি সুন্দরী।

শ্যামলীর লাল টুকটুকে ঠোঁটের ওপর আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট। আমার জিভ ক্ষুধার্তভাবে চলে এলো শ্যামলীর সুগন্ধী মুখের ভেতরে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো সুন্দর সারিবদ্ধ দাঁত, জিব, ঠোঁটের ভেতরের নরম জমি। এতো শুধু সুখ নয়, স্বর্গসুখ। ঘরের বউকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সাথে...বেশ ভালই লাগে।

আমি শ্যামলীর কানের কাছে মুখ রেখে বলি—শ্যামলী তুমি কি দারুণ। আমার কথা শুনে শ্যামলী খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

আর তখনই আমার চুলের পেছনের দিকে একটা প্রচণ্ড টান অনুভব করি। ঐ টানেই আমার দেহখানি শ্যামলীর দেহ থেকে আলাদা হয়ে সোজা মাটিতে। দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। তারপর পিছনে ফিরে দেখি আমার বিয়ে করা একমাত্র স্ত্রী মধুমতী।

মধুমতী আমায় শ্যামলীর সাথে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ব্যাস! শুরু করে দিলে—

'ও শ্যামলীর সাথে এত দূর। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি। আজই আমি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবো। তখন বুঝবে ঠেলা। কত ধানে কত চাল, স্ত্রী হত্যার দায়ে জেলের ঘানি টানতে হবে বারো বছর।

তা অবশ্য ঠিক কথা। স্ত্রী এখন জনগণের সম্পত্তি। গায়ে একটু আঁচড় লাগলেই প্রথমে জনগণের প্যাঁদানি। তারপর আদালতের কাঠগড়া। কিন্তু ওনারা আমার মাকে কাশীবাসী করাবেন। আমাকে সারা জীবন হামনদিস্তে ফেলে পিষবেন। কিন্তু কিছু বলা যাবে না। সারাজীবন শুধু বলির পাঁঠার মতো ব্যা ব্যা করে চল।

অতঃপর কি আর করা যাবে। সুবোধ বালকের মত আমি আবার হতাশ মনে আমার স্ত্রীর হাত ধরে বাড়ির মুখে চললাম।

ডেকামেরন

গিওভানি বোকাসিও

"গিলভানি বোকাসিও যদি কখনো ডেকামেরন না লিখতেন তবুও ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান সবার উপরে থাকতো, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'এগিয়া ডি ম্যাগনো ফিয়াসেটা' উপন্যাসে। এই উপন্যাসটি প্রথম আধুনিক মনোবিদ্যাগত উপন্যাস হিসাবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। নারী পুরুষের প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় লেখার সঙ্গে কোনো মতেই আপোস করতে চাননি তিনি। বরং বলা যেতে পারে, অতি আধুনিকতার ছাপ তাঁর প্রেমাস্পদের কাছে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছেন। বোকাসিওর গল্পের নায়িকারা যে রক্ত-মাংসের মানুষ। এই কথাটা মনের মধ্যে গেঁথে রেখে তিনি কথায় কথায় নায়কের শয্যাপার্শ্বে তাঁদের শুইয়েছেন, কামনায় অধীর করে তুলেছেন, নায়ক-নায়িকার দৈহিক তৃপ্তি না মেটা পর্যন্ত বোকাসিওর কলম থামে নি। এটা তাঁর পক্ষে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বললে অত্যুক্তি হবে না।

দ্বিতীয় রজনীর এটি সপ্তমকাহিনী। বোকাসিওর প্রতিটি গল্পই পড়তে কিংবা শুনতে গিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের কখনোই মনে হয়নি যে, এসব গল্প কাল্পনিক। মনে হয় এ যেন তাদেরই জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী। তাঁর গল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যেন ফুরোতে চায় না, প্রতিটি গল্পের রেশ থেকে যায় পাঠক-পাঠিকাদের মনে। ডেকামেরন গল্পগুলির স্বার্থকতা এখানেই। তাঁর প্রতিটি গল্প যেন নতুন ও চিরন্তন। এই গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়!

ব্যাবিলনে সালামের মেয়ের ভাগ্য বড় নিষ্ঠুর, নির্মম। বিয়ের জন্য চার বছরে সে বিভিন্ন দেশের ন'জন লোকের সংস্পর্শে আসে, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য প্রতিবারেই ব্যর্থ মন নিয়ে তাকে তার বাপের বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। তবে তার একমাত্র সান্ত্বনা হল, এখনো সে তার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে, আজও সে কুমারী। এবার সালাম তাকে অ্যালগারভের রাজার ঘরণী হওয়ার জন্য পাঠালেন।

এমিলিয়ার মুখ থেকে ম্যাডোনা বেরিটোলার দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে যুবতীরা তাদের চোখের জল আর সামলাতে পারেনি। তাদের বুকটা বারবার

হাহাকার করে উঠেছিল, এত দুঃখ-কষ্ট কেউ সহ্য করতে পারে? এমিলিয়া যেন দরদ দিয়ে দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কাহিনী শেষ হতেই রাণীর ইচ্ছে হল এবার প্যানফিলো তার কাহিনী বলতে শুরু করুক। রাণীর কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র বাধ্য ছেলের মতন সে তখন বলতে শুরু করল।

এখানে উপস্থিত আমরা সবাই জানি, আমাদের কোন্‌টা ভালো, আমাদের বেঁচে থাকার স্বার্থকতা কি আমাদের প্রয়োজন, সেটা ঠিক করা সহজ ব্যাপার নয়। আমরা অনেকেই মনে করে থাকি, আমরা বড় অভাবে আছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রচুর অর্থ সম্পত্তি পাইয়ে দেন আর যখন ঈশ্বর আমাদের কারোর ওপর সদয় হন, তারা যখন প্রচুর অর্থের পাহাড়ের শীর্ষে উঠে যান তখন হয়ত দেখা যাবে তাঁদের সেই সুখ-সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুও তৈরি হয়ে গেছে। একদিন তারা হয়ত সুখী হয়ে যায়। তখন সেই সুখের সর্বোচ্চ শিখর থেকে চরম দুঃখের অতল গভীরে তাদের তলিয়ে যেতে হয়। ধনী হওয়ার আগে তাদের এই চরম সর্বনাশের স্বপ্নই কখনো দেখেনি তারা। কোনো রাজা যেমন অপরের রাজ্য জয় করতে গিয়ে তাঁর কাছের এবং প্রিয়জনদের নির্বিচারে হত্যা করার সময় একবারও খেয়াল করেন না, যে রাজ্য জয়ের সুখের মোহে তিনি সেই কাজ করতে যাচ্ছেন, সেই সুখ কখনই তাঁর যে হাতছাড়া হতে পারে একদিন, সেই ভয়টা যে চিরদিনই থেকে যেতে পারে তাঁর জীবনে সেটা তিনি একবারও ভাববার প্রয়োজন মনে করেন না। আসলে তাদের বোঝার ক্ষমতা থাকে না, পাওনার অতিরিক্ত আকাঙ্খা তাদের মৃত্যু এবং চরম দুর্দশার কারণ হয়ে উঠতে পারে একদিন।

'মানুষের আশা-আকাঙ্খার বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমি শুধু বলব পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে জোর গলায় বলতে পারে, ভাগ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে সে কখনোই রেহাই পেতে পারে। তাই বলছি, ঈশ্বরের দান হিসেবে আমরা যেটুকু পেয়েছি তাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়কে অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারি। তবু মানুষ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চেয়ে কিংবা কামনা করে তাদের অজান্তে যে পাপ করে বসে তাঁর ফল তাদের ভুগতে তো হবেই এই ধরে আমি উপস্থিত মহিলাদের উল্লেখ করেই বলছি তোমাদের মধ্যে হয়ত এমন কেউ আছে, যে কিনা প্রকৃতির দান হিসাবে যে রূপ সৌন্দর্য পেয়েছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো সুন্দরী আরো রূপসী হওয়ার চেষ্টা করবে যাতে করে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু কোনো জ্ঞানী-গুণী লোক একে সমর্থন করবেন না। তার কারণ তার পরিণাম ভালো হতে পারে না। এই কাহিনীতে আমি এমন একজন পরমাসুন্দরী সিরিয় মেরে কথা শোনাবো, যে তার রূপের দেমাকে চার চারটে বছর ন'জন পুরুষের

সংস্পর্শে এলেও কারোর স্ত্রী হয়ে ঘর বাঁধতে পারেনি।

অনেক, অনেক দিন আগে ব্যাবিলনে সুলতান বেকিনদারের রাজত্বকালে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু ঘটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাঁর অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে মেয়ে আলাটিয়েল, তখনকার সময়ে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী ছিল বললে বোধহয় এতটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না। এক সময়ে আরবের যাযাবররা হঠাৎ তাঁর রাজ্যে হানা দেয়। তখন আল্যারভের রাজা সময়মত এগিয়ে এসে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এবং তাঁর পুরস্কার-স্বরূপ তিনি তখন সুলতানের কাছ থেকে তাঁর সেই সুন্দরী কন্যাকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন তিনি তাঁর সুন্দরী কন্যাকে জাহাজে তুলে দিলেন মহাআনন্দে আল্যারভ-এর উদ্দেশ্যে। আলাটিয়েলের সঙ্গে দিলেন প্রচুর যৌতুক এবং লোকলস্কর ও চাকর-চাকরানি।

বেশ কয়েকদিন পরে জাহাজটা আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর ছেড়ে যাওয়ার পর একদিন তারা যখন সারদিনিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যাত্রাপথ যখন তাদের প্রায় শেষ হয়ে আসছিল হঠাৎ সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় এবং তুফান উঠতে দেখা গেল। এত তীব্র এবং ভয়ঙ্কর সেই ঝড় যে, জাহাজের নাবিকেরা এক রকম ধরেই নিল, তাঁদের বাঁচার আয়ু শেষ হয়ে আসছে, তারা গভীর সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে একদিন। তবে তাদের সাহস এবং ধৈর্য ধরার ক্ষমতা ছিল অনেক। দুদিন ধরে সমুদ্রের নিচে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে কোনোরকমে বেঁচে রইল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। যাই হোক, তৃতীয় দিন আবার সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় এবং তুফান উঠতেই তাদের জাহাজ এবার প্রায় ডুবে যাওয়ার অবস্থা হল। সেখান থেকে ম্যাজোরকা খুব দূরে না হলেও আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা থাকার দরুণ তারা বুঝতে পারছিল না তারা তখন ঠিক কোথায় ছিল।

সবাই তখন ডুবন্ত জাহাজ থেকে নেমে একটা বড় নৌকা নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জাহাজের সব যাত্রী সেই নৌকায় জায়গা পেল না। কিছু লোক রয়ে গেল জাহাজে।

ইতিমধ্যে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঝড় সেই জাহাজটাকে ম্যাজোরকা দ্বীপের কাছে টেনে নিয়ে এল। জাহাজটা তখন প্রায় জলে ভর্তি হয়ে গেছে। সেই সময় জাহাজের যাত্রী বলতে সেই মহিলা এবং তাঁর পরিচারিকা। তাদের অবস্থা তখন মৃত জানোয়ারের মতন, তাদের চোখে-মুখে গভীর আতঙ্কের ছাপ। প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে জাহাজটা সমুদ্র তীরের বালিতে গেঁথে গিয়েছিল, নড়বার ক্ষমতা ছিল না তার। সারাটা রাত যাত্রীদের জাহাজেই কাটল।

পরদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দাপট কমে গেল। ভদ্রমহিলা প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক পরিচারিকাদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। কিন্তু তখন তাদের সাড়া দেওয়ার কেউ ছিল না।

তাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে এবং ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে দারুণ ভয় পেল। কোনো অঘটন ঘটল না তো? তখন সে জাহাজের চারিদিক ঘুরে দেখতে গিয়ে দেখল, সবাই প্রায় মৃতের মত। খুব কম মানুষের দেহে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ করা গেল। ভদ্রমহিলা এবার সত্যি সত্যি দারুণ ভয় পেলেন। জাহাজের চারিদিকে জল থৈ থৈ, তিনি যে কোথায় এসে পড়েছেন, কোনো ধারণা নেই সে ব্যাপারে। যে ক'জন তখনো জীবিত ছিল তাদের তিনি জাগিয়ে তুললেন। তারাও জানে না জাহাজের মানুষগুলোর কি হাল হয়েছে, তারা কোথায় তা তারা জানে না। তিন দিন ধরে পেটে একটুও খাবার পড়েনি। একটা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা অনুমান করে নিয়ে তারা সবাই তখন যেন ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

দুপুর পর্যন্ত ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ল আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে। তারপর দুপুর প্রায় শেষ হয়ে আসছিল সেই সময় পেরিকোন দ্য ভিসালগে নামে এক ভালোমানুষ এথেন্স থেকে ফেরার সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গে ছিল অনেক লোক লস্কর। সমুদ্রতীরে সেই জাহাজটা দেখে তিনি ধরে নিলেন, কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটে থাকবে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত পরিচারককে বললেন সেই জাহাজের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখার জন্যে। চাকরটি তখন জাহাজে উঠে সেই যুবতী মহিলা এবং তার পরিচারিকাদের দেখতে পেয়ে অবাক হল, তারা তখনো কি করে বেঁচে আছে আশ্চর্য! কিন্তু চাকরটা ওদের ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তখন তারা আকারে ইঙ্গিতে চাকরটাকে পথের দূরাবস্থার কথা বোঝাতে চাইল।

চাকর ফিরে এসে মেয়েটির সম্পর্কে খবর দিলে পেরিকোন সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই ডুবন্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন তাঁর প্রাসাদে, সেই সঙ্গে জাহাজের সমস্ত মূল্যবান সম্পদও সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। মেয়েটির সৌন্দর্য এবং মূল্যবান পোষাক দেখে পেরিকোন বুঝতে পারলেন সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে সে। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তখন মনে মনে ঠিক করে ফেললেন তাকে বিয়ে করবেন। আর বিয়ে যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি তাকে তাঁর মিস্ট্রেস হিসেবে রেখে দেবেন।

ইতিমধ্যে জাহাজ ভ্রমণের ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতেই মেয়েটি আরো বেশী রূপবতী এবং সুন্দরী হয়ে উঠল। পেরিকোনও কম সুপুরুষ নন। তিনি তখন মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু মেয়েটি তার হাবভাবে বুঝিয়ে দিল তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে অপারগ সে। ওদিকে পেরিকোনের কামনা ক্রমশ বেড়েই যেতে থাকল।

মেয়েটি তখনো জানে না, যে কোথায় এসে উঠেছে, কাদের সঙ্গে বসবাস করছে। তবে সে বুঝতে পারল, লোকগুলোর আচার ব্যবহার দেখে মনে হয়

তারা খ্রিস্টান। পেরিকোনের মনের ভাব তখন তার পুরোপুরি জানা হয়ে গেছে। যে রকম ব্যবহার তিনি করছেন তাতে মনে হয় সে পছন্দ করুক বা না করুক, একদিন না একদিন তাকে তাঁর ইচ্ছের শিকার হতেই হবে। তবুও, যেন সে কিছুই বুঝতে পারেনি এমনি ভাব দেখিয়ে অন্ধের মত চোখ ফিরিয়ে থাকার চেষ্টা করল পেরিকোনের দিক থেকে। মেয়েটি তার তিন জীবিত পরিচারিকাকে নির্দেশ দিয়ে বলল, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে তাদের মুক্তির আশ্বাস পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যেন তাদের পরিচয় প্রকাশ না করে পেরিকোনের কাছে। তাছাড়া তারা যেন সেখানকার কোনো পুরুষের প্রলোভনে নিজেদের দেহ বিকিয়ে না দেয়।

যত দিন যায় পেরিকোন যেন ততই অধৈর্য হয়ে উঠতে থাকে মেয়েটির সঙ্গ লাভের জন্যে। কিন্তু প্রতিবারেই মেয়েটি তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়। ক্রমে তার কামনার আগুন বেড়েই চলে। বার বার মেয়েটি তাঁকে ফিরিয়ে দিলে পেরিকোন তখন ভাবলেন, ভালো কথায় কাজ হবে না, হয়ত এবার তাঁকে বলপ্রয়োগ করতে হবে। তবে তিনি খোঁজ নিয়ে জেনে নিয়েছিলেন, মেয়েটির মদে আসক্তি আছে, অথচ মদ খাওয়া মেয়েটির ধর্মবিরুদ্ধ। পেরিকোন ভাবলেন মদের লোভ দেখিয়ে হয়ত তাকে জয় করা যেতে পারে। তাই তিনি একদিন সন্ধ্যায় এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন, সেই সভায় মেয়েটি উপস্থিত ছিল। পেরিকোন তাঁর চাকরকে বলে রেখেছিলেন মেয়েটিকে দামি মদ পরিবেশন করার জন্যে। চাকর তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। মদের নেশায় বিভোর হয়ে মেয়েটি অতিরিক্ত মদ গিলল। মেয়েটি তখন তার সব বিপর্যয়, সব দুঃখ দুর্দশার কথা ভুলে গিয়ে মেতে উঠল তাদের সঙ্গে। মেয়েটি দেখল, বেশ কিছু মেয়ে ম্যাজোরকার ঢঙে নাচছে, তখন সে নিজেও আলেকজান্দ্রার ফ্যাসানে নাচতে শুরু করে দিল।

সেই দৃশ্য দেখে পেরিকোনের মনে আশা জাগল, খুব শিগগীরই তাঁর ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। মেয়েটি গ্লাসের পর গ্লাস মদ গিলে যায়। তখন তার নিজস্ব সত্ত্বা বলতে কিছু ছিল না, তখন যেন সে একটা কলের পুতুল, দম দিলেই চলবে। সব শেষে অতিথিরা যে যার বাড়ি চলে গেলে পেরিকোন মেয়েটিকে যন্ত্রচালিতের মতন দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল। মেয়েটির তখন হুঁশ বলতে কিছু ছিল না। পেরিকোনকে সে তার ব্যক্তিগত পরিচারক ভেবে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে তার সামনেই সে তার পোষাক এক এক করে খুলে ফেলল, এবং বিছানায় শুয়ে পড়ল। পেরিকোন সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে সেও মেয়েটিকে অনুসরণ করলেন নিজেকে নির্বস্ত্র করে। তার ঘরের আলো নিভিয়ে মেয়েটির নগ্ন দেহের পাশে শুয়ে পড়লেন তিনি এবং দু'হাত দিয়ে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন, মেয়েটি কোনো বাধা দিল না, কলের পুতুলের মত নিজেকে সে সঁপে দিল

পেরিকোনের হাতে। পেরিকোন তার নগ্ন দেহ যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন। পুরুষ স্পর্শ যে নারীর কাছে এত প্রিয় হতে পারে আগে কোনও ধারণা ছিল না মেয়েটির। একটু একটু করে তখন তার মদের নেশাটা কেটে গিয়ে হুশ ফিরে আসছিল। পেরিকোনের হাতের মুঠোয় তখন তার স্তনযুগল, ঠোঁটে ঠোঁট। পেরিকোন তার দেহের ওপর নিজের শরীর বিছিয়ে দিতেই মেয়েটি আবেগে চোখ বুজল। পেরিকোন তার ঠোঁটে ঘন ঘন চুমু খেতে খেতে মেয়েটির দেহে প্রবেশ করল এক সময়। পেরিকোন আচমকা তার দেহে প্রবেশ করার দরুন প্রথমে একটু ব্যথা পেলেও এক অদ্ভুত আনন্দানুভূতি তার সারা দেহে রন রন করে অনুরণিত হয়ে উঠতে থাকল। থর থর করে কেঁপে উঠল তার সারা দেহ। সেই রোমাঞ্চকর সুখে গা ভাসিয়ে দিতে গিয়ে মেয়েটির তখন দারুণ অনুশোচনা হল, আগে কেন সে পেরিকোনেরর আহ্বানে সাড়া দেয়নি, কেন সে এই অপূর্ব সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখত এতদিন। মেয়েটির তৃপ্তি তখন এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, এবার সে নিজেই সেই সুখের জানান দিতে পেরিকোনের প্রেম-প্রেম খেলার সাথী হয়ে উঠল। একবার সুখ পেয়ে দেহের ক্ষুধা আরো বেড়ে গেল। তারপর সে নিজের থেকেই আহ্বান করল পেরিকোনকে। সেই রাতে দেহে ক্লান্তি না আসা পর্যন্ত বার বার পেরিকোনের সঙ্গে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হল বিভিন্ন কায়দায়। পেরিকোনও তাকে তৃপ্তি দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করলেন না।

তারপর থেকে পেরিকোনের আর কোনও ক্ষোভ রইল না। মেয়েটিকে তিনি তাঁর স্ত্রী হিসেবে না পেলেও খুশি মত যখন যেভাবে পারছেন তিনি তার দেহ উপভোগ করতে থাকলেন স্বামী-স্ত্রীর মতন। কিন্তু তাঁর সেই সুখের দিন বেশী সময় স্থায়ী হল না। পেরিকোনের এক পঁচিশ বছরের যুবক ভাই ছিল, তরতরে তাজা এবং সুপুরুষ, যেন সদ্য প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ—তার নাম ছিল মারাটো। মেয়েটিকে দেখা মাত্র তার যৌনচেতনা প্রচণ্ড ভাবে জেগে উঠল। মনে মনে মেয়েটিকে সে ভীষণ ভাবে কামনা করল। মেয়েটিও তাকে দেখে হাবভাবে বুঝিয়ে দিল সেও তাকে কামনা করে। তখন তারা দেখল, তাদের সামনে একমাত্র বাধা পেরিকোন, যাঁর কড়া নজর পড়ে আছে তার ওপর। মারাটো বুঝতে পারল, যে ভাবেই হোক পেরিকোনের হাত থেকে মেয়েটিকে মুক্ত করতে না পারলে তারা তাদের সুখের লক্ষে পৌঁছতে পারবে না। সে তখন এক মারাত্মক খেলায় মেতে উঠল।

সেই বন্দরে দুটি জোনোসী যুবক একটা জাহাজ নোঙর করল। পেলেপোনিজে ব্যবসায়ীদের জন্যে মালপত্র বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজটা। অনুকূল বাতাস আবার বইতে শুরু করলেই জাহাজটা সমুদ্রে ভাসবে। মারাটো সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার নিজের এবং মেয়েটির জন্যে দুটি আসনের

ব্যবস্থা করে রাখল। পরদিন রাত্রে তারা সেই জাহাজে উঠবে, সেখান থেকে পালাবার সব ব্যবস্থাই তো পাকা হল। কিন্তু যে মেয়েটিকে নিয়ে সে পালাতে চায় সেই মেয়েটিকে তার বড় ভাই-এর খপ্পর থেকে কি করে উদ্ধার করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে মারাটোর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, ঠিক করল পেরিকোনের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে আসবে।

মারাটো তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলে রাখল এ ব্যাপারে, তারা তাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিল। রাত গভীর হলে পেরিকোন এবং মেয়েটি গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লে তারা তাঁর ঘরে ঢুকে পেরিকোনকে হত্যা করে মেয়েটিকে ঘিরে ফেলল। মেয়েটি ঘুম থেকে জেগে উঠে সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠতেই তারা তাকে হত্যা করার ভয় দেখায়। মেয়েটি প্রাণের ভয়ে চুপ করে গেল। তখন তারা পেরিকোনের মূল্যবান সম্পদ ও নগদ অর্থ যা পারল সংগ্রহ করে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হয়ে গেল। রাত তখন গভীর নিশুতি, কাক পক্ষীও কেউ টের পেল না তাদের সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা। সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করছিল মারাটো। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সে তখন সেই জাহাজে উঠে পড়ল এবং তার সঙ্গীরা যে যার পথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল সেখান থেকে।

একটু পরেই অনুকূল বাতাস বইতে দেখে জাহাজের নাবিকরা বন্দর থেকে নোঙর তুলে দিয়ে জাহাজটা জলে ভাসিয়ে দিল।

মেয়েটি দ্বিতীয়বার বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল তখন। তবে মারাটোর মিষ্টি মিষ্টি কথায় মেয়েটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে গেল পেরিকোনের কথা। তার মন থেকে পেরিকোনের স্মৃতি মুছে ফেলে মারাটোর কাছে নিজেকে সঁপে দিল। রাতের অন্ধকারে জাহাজ তখন ভেসে চলেছে সমুদ্রে। আর ওদিকে একটা কেবিনে মারাটো এবং মেয়েটি সুখের সাগরে গা ভাসিয়ে দিল। বাকী রাতটুকু তারা প্রেম প্রেম খেলা খেলল, কম করেও তিনবার তারা চরম সুখের স্বাদ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করল, তাদের জীবন সার্থক বলে ধরে নিল। কিন্তু এবারেও বোধহয় ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মারাটোর সঙ্গে তার একটা নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই এক বিপর্যয়ের মহড়া দিচ্ছিল জাহাজের যুবক মালিক দু'জন। মেয়েটিকে রাতের অন্ধকারে দেখা মাত্র তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। মনে মনে তারা ঠিক করে ফেলেছিল যে ভাবেই হোক মেয়েটিকে তাদের শয্যা সঙ্গিনী করতে হবে।

"বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করে বলতে চাই,' প্যানফিলো এখানে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমরা জেনেছি মেয়েটির সারা অঙ্গে রূপ আর যৌবন যেন উপচে পড়ছিল। তাকে স্বর্গের অপ্সরা বললে এতটুকু

বুঝি বাড়িয়ে বলা হয় না। তার সেই চোখ ধাঁধানো রূপ দেখে যুবক দুটি প্রচণ্ড উত্তেজনায় তখন ভাবছিল কি করে মেয়েটির মন জয় করা যায়, তাকে তাদের কাম-লালসার চরিতার্থ করাতে রাজি করানো যায়। সেই সঙ্গে তারা এও ঠিক করল, তাদের মনের কথা মারাটোকে জানতে দেবে না।

যুবক দুটি পরস্পরের মনের কথা জানতে পেরে নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ রফা করে নিল আগে ভাগে। প্রথমে মেয়েটিকে জয় করতে হবে, তারপর ঠিক করা হবে কে প্রথম তাকে উপভোগ করবে। কিন্তু তাদের অপেক্ষা করতে হল। কারণ মারাটো তখন মেয়েটির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। কিন্তু একদিন তাদের সামনে সেই সুবর্ণ সুযোগটা এসে গেল। মারাটো দাঁড়িয়েছিল ডেকের ওপর, সামনেই রেলিং। তারা তখন নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, তাদের উদ্দেশ্যের কথা সে জানতেও পারল না। তারপর অতর্কিতে পিছন থেকে তারা তাকে সজোরে ধাক্কা দিতেই মারাটোর ভারী দেহটা জলের ওপর আছড়ে পড়ল এবং গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যেতে দেখা গেল তার দেহটা। দুর্ঘটনাস্থল থেকে এক মাইল পাড়ি দেওয়ার পর মেয়েটি জানতে পারল মারাটো আর বেঁচে নেই। জাহাজের দু'জন মালিকের হাতে ভাগ্যকে সঁপে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় সে আর দেখতে পেল না।

জাহাজের মালিক দুই ভাই তখন মেয়েটির দূরাবস্থা দেখে তাকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। তাঁর সঙ্গে ভালো ভালো কথা বলে তার মন গলানোর চেষ্টা করল। মেয়েটি তখন মারাটোকে হারিয়ে যত না দুঃখ পেয়েছিল তার বেশী দুঃখ পেল দুই ভাইকে একই সঙ্গে তার দেহের ওপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলতে দেখে। একটি নারী, দুটি পুরুষ, একটা অশুভ চিন্তা তখন তাকে গ্রাস করছিল। সেই আশঙ্কা যে মিথ্যে নয় একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। দুই ভাই তখন আলোচনায় বসল, কে প্রথম মেয়েটিকে তার শয্যাসঙ্গিনী করবে। প্রথমে ভালো কথায় তারা এ ওকে বোঝবার চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ যখন কারোর কথায় রাজি হতে পারল না, তখন তারা উত্তেজিত হয়ে এ ওকে গালিগালাজ করতে করতে শেষে ছুরি হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়ল। ছুরির আঘাতে দু'জনের দেহই তখন দারুণ ক্ষত-বিক্ষত। একজনের আঘাত এতই গুরুতর ছিল যে, ঘটনাস্থলেই সে মারা গেল। অন্য ভাইটা মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ডেকের উপর।

মেয়েটি তখন অত্যন্ত বিপন্না। জাহাজে তখন এমন কোনও ভালো লোক তার চোখে পড়ল না যে কিনা তার বিপদে তাকে সাহায্য করতে পারে। তার আরো আশঙ্কা, এবার বুঝি জাহাজের অন্য লোকগুলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার রূপসী দেহটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কারণ, দুই ভাই যখন কে আগে তাকে দেহ উপভোগ করবে, সামান্য এই সমস্যাটার কোনো সমাধান

করার আগেই একজনকে খুন হতে হল, আর একজন মারাত্মকভাবে আহত হল, তখন অতগুলো লোক কি সমঝোতায় যে আসতে পারে, সেটা এখন আর তার অজানা থাকার কথা নয়! আর সেই ভয়েই মেয়েটি তখন আরো বেশী কুঁকড়ে গেল। যাইহোক আহত যুবকটির প্রতি তার কেমন যেন মায়া হল এবং ওদিকে ক্লারেঞ্চয় নোঙর করাতে তখনকার মত তার বিপদ বুঝি কেটে গেল। তখন সে আহত যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। পরে সেই হোটেল থেকেই মেয়েটির দেহ-সৌন্দর্যের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। সেই সময়ে ক্লারেঞ্জায় মোরিয়ার রাজকুমার উপস্থিত ছিল। তার কানেও খবরটা পৌঁছতে সে তখন মেয়েটির ভুবন ভোলানো রূপ দেখা মাত্র সে তার প্রেমে পড়ে গেল, তার মনে হল ওর মত সুন্দরী মেয়ে সে বুঝি-এর আগে কখনো দেখেনি। মেয়েদের রূপ না তো অভিশাপ!

মেয়েটার পূর্ব পরিচয় পেয়ে রাজকুমারের মনে হল, কেনই বা সে তাকে পাবে না। রূপে-গুণে অর্থ-যশে সেই বা কি এমন কমতি আছে? আহত যুবকের আত্মীয় বন্ধুরাও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কসুর করল না। রাজকুমারের মনের কথা বুঝতে পেরে তারা তখন মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে রাজকুমারের হাতে তুলে দিল। মেয়েটিকে পেয়ে রাজকুমার উৎফুল্ল, এবং মেয়েটিও কম খুশি হল না। তার নতুন পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে। মেয়েটি তখন ভাবল, এবার বোধহয় তার বিপদ কাটল। ওদিকে রাজকুমার তার রূপে মুগ্ধ হয়ে ভাবল, মেয়েটির চালচলন দেখে মনে হয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে সে। তখন মেয়েটির প্রতি তার ভালোবাসা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। রক্ষিতা হিসাবে নয়, তাকে সে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিতে কসুর করল না।

মেয়েটি তার বর্তমান রূপ এবং ঐশ্বর্যের বহর দেখে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলে মনে করল। আগের জীবনে সে যে দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েছিল সে সবের তুলনায় রাজকুমারের জীবনে এসে সে অনেক বেশী সুখী, নিজেকে অনেক নিরাপদে বলে মনে করল। একটা সুখের মুখ দেখতে পেয়ে তারপর থেকে তার রূপ যেন আরো বেশী খুলে গেল। তার সেই নতুন রূপের কথা সারা প্রাচ্য সাম্রাজ্যে আগুনের দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। সবার মুখেই সেই একই কথা ; আহা কি রূপ মেয়েটির। এথেন্স-এর ডিউক ছিল রাজকুমারের আত্মীয় এবং বন্ধু। তার একদিন ইচ্ছে হল মেয়েটিকে নিজের চোখে একবার দেখে। ডিউকও ছিল দেখতে-শুনতে সুপুরুষ, বয়স অল্প। বলিষ্ঠ যুবক রাজকুমারের সঙ্গে প্রথামত দেখা করার অছিলা করে একদিন সে ক্লায়েঞ্চয় এল।

কথায় কথায় ডিউক জিজ্ঞেস করল, রাজকুমার শুনেছি তোমার প্রাসাদের নতুন অতিথিটি নাকি খুব সুন্দরী।

'সুন্দরী কি বলছ হে? পরমাসুন্দরী সে। অতুলনীয়া।' রাজকুমার মেয়েটির

রূপের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল, 'বিশ্বাস না হয়, নিজের চোখেই পরখ করে দেখতে পারো।'

এরপর রাজকুমার তাকে মেয়েটির ঘরে নিয়ে গেল। মেয়েটি তাদের সাদর অভ্যর্থনা করে তার শয়নকক্ষে বসাল। মেয়েটি বসেছিল দুই বন্ধুর ঠিক মাঝখানে। তবে তাদের ভাষা ঠিক মত বুঝতে না পারায় তাদের আলোচনায় রস সে গ্রহণ করতে পারছিল না। ডিউক ঘন ঘন মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছিল। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, মেয়েটি এই পৃথিবীর মানবী না কি স্বর্গের কোনো দেবী। একই অঙ্গে এত রূপ? নিজের চোখে না দেখলে বোধহয় সে বিশ্বাস করতে পারত না। তার রূপে আগুনের ঝলক ছিল, এত তীব্র সেই ঝলক যে, কোনো পুরুষ সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে পারে। তবু সেই আগুনের স্পর্শ পেতে চায় পুরুষ। বিচিত্র নারী, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় তাদের রূপ আর যৌবন। মেয়েটির প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করল ডিউক। তার মনে হল, পৃথিবীতে রাজকুমারের মত খুশী বোধহয় আর কেউ নেই এমন এক সুন্দরী মেয়ে যার শয্যা সঙ্গিনী, তার থেকে বেশী সুখী আর কেই বা হতে পারে? ডিউকের মধ্যে তখন অনেক চিন্তা। কি করে রাজকুমারের সেই সুখের সাম্রাজ্যে হানা দেওয়া যায়, কি করে মেয়েটিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়। তবে সে এ কথাও ভাবল, যে কোনো মূল্যে মেয়েটিকে পেতেই হবে, তার পরিণাম যত ভয়াবহই হোক না কেন।

অতঃপর ডিউক একদিন তার বদ মতলবের একটা বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্যে রাজকুমারের বিশ্বস্ত চাকরকে টাকা দিয়ে হাত করল। তার সঙ্গে চুক্তি হল, গভীর রাতে রাজকুমারের প্রাসাদের দরজা খুলে দেবে। তখন ডিউক এবং তার এক সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমারের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে।

সেদিন রাতে ঘোড়ায় চড়ে ডিউক তার সঙ্গীকে নিয়ে রাজকুমারের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারা দু'জনেই অস্ত্রে সুসজ্জিত। যথারীতি চাকর সিউরিয়াসি তাদের পথ দেখিয়ে নিঃশব্দে রাজকুমারের শয়নকক্ষে নিয়ে এল। প্রচণ্ড গরম সেদিন। চারিদিকে অন্ধকার থিক্‌থিক্ করছিল। মাঝে মাঝে সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছিল। মেয়েটি তখন বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন এবং প্রায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল। এবং রাজকুমার সমুদ্রে হাওয়া খাওয়ার জন্যে জানালার সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। দেখে মনে হয় খানিক আগে মেয়েটির সঙ্গে যৌন খেলায় মেতে উঠে থাকবে সে। ডিউক তার সঙ্গীকে ইশারায় ইঙ্গিত করল, আগেই সে বলে রেখেছিল কি তাকে করতে হবে। রাজকুমার তাদের উপস্থিতি একেবারেই টের পায়নি। সেই সুযোগে ডিউকের অনুচর পা টিপে এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে রাজকুমারের পিঠের ওপর তার হাতের ধারালো তলোয়ারটা আমূল বিঁধিয়ে দিল।

মাত্র একবারই অস্ফুটে চিৎকার করে উঠেছিল রাজকুমার, পরক্ষণেই তার রক্তাক্ত শরীরটা মেঝের ওপর পড়ে যেতেই ডিউক তার মৃতদেহটা দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দা সংলগ্ন রাজকুমারের প্রাসাদের প্রাচীর। ডিউক তার দেহটা প্রাচীর টপকে বাইরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিল। কেউ জানতেও পারল না।

ওদিকে ডিউকের শেখানো মত তার সঙ্গী তখন রাজকুমারের ভৃত্য সিউরিসির গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করে ফেলেছিল। তার মৃতদেহটাও প্রাসাদের বাইরে ফেলে এল তারা। তারপর ডিউক তার সঙ্গীকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে রাজকুমারের শয়নকক্ষে ঢুকল তার শেষ কাজটা সারার জন্যে। মেয়েটি তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। পোষাকে ঢাকা যে মেয়ের এত সৌন্দর্য না জানি নিরাবরণ দেহে তাকে আরো কত না সুন্দরী দেখাতে পারে। সেটা দেখার জন্যে ডিউক নিঃশব্দে বিছানায় তার পাশে বসে এক এক করে তার দেহ থেকে সমস্ত পোষাক খুলে ফেলল। তার চোখের সামনে মেয়েটির নগ্ন দেহ ভেসে উঠল। ফোটা পদ্মের মতো স্তনযুগল। সুউচ্চ স্তন জোড়ার মাঝে মসৃণ উপত্যকা অনেক নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে, নাভি পেরিয়ে সেই তল গিয়ে মিশেছে দুটি উরুর সন্ধিক্ষণে যেখানে মেয়েটির দেহের সমস্ত উত্তাপে ঘনীভূত। সেই উত্তাপের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে ডিউক দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রথমে মেয়েটির ঠোঁটে চুমু খেল। তার ঠোঁট জোড়া মেয়েটির বুক হয়ে পরিক্রমা শেষ করল নাভির নিচে। তার ভেতরের পশুটা তখন গর্জে উঠছিল পোষাকের আড়াল থেকে। তাকে শান্ত করতে ডিউক তখন পোষাক মুক্ত হয়ে নিজের দেহটা আলতো করে বিছিয়ে দিল মেয়েটির নগ্ন দেহের ওপর। মেয়েটি তখন আধা ঘুম চোখে একবার তাকিয়েই আবার চোখ বুঁজল। ঘরের আলোগুলো ডিউক আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটির ঠোঁটে কামনার হাসি ফুটে উঠল। সে তখন ডিউককে তার মনের মানুষ রাজকুমার ভেবে তার দৃঢ় আলিঙ্গনে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করল না। আর ডিউক সেই সুযোগে মনের আনন্দে মেয়েটির দেহ উপভোগ করে চলল। এক সময় তাদের দু'জনের দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল। ঠিক সেই মূহূর্তে দু'জনের দেহে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মেয়েটি দু'হাত দিয়ে ডিউকের মাথা নামিয়ে নিজের সিক্ত ঠোঁটের ওপর তার ঠোঁট জোড়া চেপে ধরল। ডিউক তার মুখের ভেতরে জিভটা চুষতে শুরু করে দিল। এক সময় চুম্বন বিস্বাদ ঠেকতেই তারা এ ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ডিউক উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালাতেই মেয়েটি রাজকুমারের বদলে ডিউককে দেখেই চমকে উঠল। 'তুমি? তুমিই তাহলে এতক্ষণ আমার সঙ্গে—', কথাটা অসমাপ্ত রেখে ডিউকের দিকে তাকাল মেয়েটি। কোনো রাগ নয়, বিদ্বেষ নয়, বরং মনে মনে মেয়েটি তার প্রশংসাই করল, কারণ রাজকুমারের থেকেও আজ বেশী সুখ

পেয়েছে সে ডিউকের কাছ থেকে। ডিউক তার দেহ মন দুই ভরিয়ে দিয়েছিল কানায় কানায়। রাজকুমারের মৃত্যুর খবর না জানলেও এখন তাকে ছেড়ে দিয়ে ডিউকের সঙ্গে পালিয়ে যেতে তার মনের ভাবটা মুখে প্রকাশ করল না। মেয়েদের স্বভাব জাত ধর্ম বুক ফাটল তবু তার মুখ ফুটল না। ডিউক ভাবল মেয়েটি বোধহয় নারাজ তার সঙ্গে যেতে। তাই সে তাকে ভয় দেখাল হত্যা করার হুমকি দিয়ে। তার নির্দেশে তার সঙ্গী তখন মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে রাজকুমারের প্রাসাদের বাইরে চলে এল। ডিউক তার নিজের ঘোড়ায় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে এবার ছুটে চলল। তাকে অনুসরণ করল তার সঙ্গী আর একটা ঘোড়ায় চড়ে। অদূরে ডিউকের অনুচররা অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। ডিউকের নির্দেশে তখন তারা এসেন্সের দিকে রওনা হল। ডিউক ছিল বিবাহিত তবে তাই বলে বেচারী এই মেয়েটিকে সে অবহেলা করবে তা নয়। শহরের এক প্রান্তে এক নির্জন জায়গায় তার বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলল সে মেয়েটিকে। সেখানে সে মেয়েটিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকম ব্যবস্থা করে দিতে একটুও কার্পণ্য করল না।

পরদিন সকালে রাজকুমারের ঘুম ভাঙতে না দেখে তার অনুচররা ভাবল, মেয়েটির সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকার দরুণ তার ঘুম ভাঙতে দেরী হচ্ছে হয়ত। কিন্তু অনেক বেলা পর্যন্ত যখন তার ঘুম ভাঙল না তখন তারা তাঁর শয়ন কক্ষের সামনে গিয়ে হাজির হল। ঘরের দরজা খোলা ছিল। সেই খোলা দরজা পথ দিয়ে তারা দেখল ঘর ফাঁকা। তখন তারা ভাবল, রাজকুমার হয়ত মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র তীরে বেড়াতে গেছে। তখন তারা রাজকুমারের খোঁজে সমুদ্রতীরের দিকে যেতে গিয়ে এক এক করে তারা রাজকুমার এবং তার ভৃত্য সিউরিয়াসির মৃতদেহ আবিষ্কার করল। একটা গভীর শোকের ছায়া নেমে এল রাজপ্রাসাদে।

কে, কে হত্যাকারী হতে পারে? রাজকুমার সমাধিস্থ দেওয়ার পর চলল অন্বেষণ। দেখা গেল এথেন্সের ডিউক নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে। তখন তাদের সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল তার ওপর। এথেন্সে লোক পাঠিয়ে তারা খোঁজ পেল হ্যাঁ, ডিউক সেই মেয়েটিকে তার রাজ্যে নিয়ে গেছে। তারা তখন রাজকুমারের ছোট ভাইকে রাজকুমারের আসনে বসিয়ে তাকে অনুরোধ করল, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। নবাগত রাজকুমার তখন তার প্রতিবেশী রাজ্যের মিত্র এবং আত্মীয় বন্ধুদের কাছে খবর পাঠাল, কে কি ভাবে তাকে সাহায্য করতে পারে জানানোর জন্যে। তাদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে রাজকুমার তখন এথেন্সের ডিউকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ওদিকে ডিউক যুদ্ধের খবর পেয়ে সেও তখন নবাগতা রাজকুমারের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হতে থাকল। বহু প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের শক্তিশালী

সম্রাট এবং রাজারা তাদের সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে কনস্ট্যান্টিনেপলের সম্রাটের ছেলে কনট্যান্ট এবং ভাই ম্যানুয়েলও এলো তাদের বিরাট এক সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে। কনট্যান্ট এবং ম্যানুয়েলকে দারুণ খাতির যত্ন করল। তাদের সব থেকে বেশী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ডিউক পত্নী ড্যাচিস, কারণ কনস্ট্যান্টির বোন ছিল সে।

যুদ্ধ যখন ঘনিয়ে আসছিল, ড্যাচিস একদিন তার ভাই কনস্ট্যান্ট এবং ম্যানুয়েলকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। সবাই জানাল, সেটা ভাইবোনের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। কিন্তু ড্যাচিসের আসল উদ্দেশ্য ভায়েদের কাছে তার দুঃখের গোপন কাহিনী খুলে বলা। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে তখন তাদের বলল, এই যুদ্ধের মূলে একজন সুন্দরী মহিলা যাকে ডিউক চুরি করে এনেছে। এই মহিলা শুধু এথেন্স-এর অশান্তির কারণ নয় ড্যাচিসের জীবনও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তার জন্যেই ডিউক আজকাল তাকে অবহেলা করতে শুরু করেছে। তার প্রতি আগের মতন তেমন নজর আর দেয় না সে। সারাক্ষণ সে সেই মেয়েটির কাছে পড়ে থাকে। ড্যাচিস তার দুঃখের কাহিনী বলে ভায়েদের অনুরোধ করল তাদের জীবন থেকে এই মেয়েটিকে অপসরণ করার জন্যে।

দুই ভাই তখন তাদের বোনকে আশ্বাস দিয়ে বলল, তারা তাদের সাধ্যমত ব্যবস্থা করবে। বোনের কাছ থেকে তারা জেনে নিয়েছিল সেই সুন্দরী রমণী কোথায় থাকে। তারপর একদিন তারা কথায় কথায় ডিউকের কাছে সেই মেয়েটির প্রসঙ্গ তুলে অনুরোধ করল তার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিতে দেওয়ার জন্যে। ডিউক তাদের অনুরোধ রাখতে গিয়ে তার জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

ড্যাচিসের দুই ভাই-এর সামনে ডিউক একদিন এক বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করল বাগান বাড়িতে। সেখানে সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কনস্ট্যান্টের আলাপ হল। প্রথম দর্শনেই প্রেম এতই তীব্র মনে হল তার কাছে যে সেই মুহূর্তে সে তার মন থেকে আসন্ন যুদ্ধের কথা মুছে ফেলে মনে মনে ডিউকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলল। যে ভাবেই হোক ডিউকের হাত থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে হবে। তার সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে, বোনের স্বার্থ নয় তার নিজের স্বার্থে নিজের দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর জন্যে। অবশ্য মেয়েটির প্রতি তার সেই তীব্র আকর্ষণ বোধের কথা সে কারোর কাছেই প্রকাশ করল না।

কনস্ট্যান্টের সারা দেহ মন তখন আচ্ছন্ন মেয়েটির কামনায়। এই সময় রাজকুমার এথেন্সের সীমান্তে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল তার সৈন্য-সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে। খবর পেয়ে ডিউক তার সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে গেল। যুদ্ধে তার মন কিছুতেই বসতে চাইছিল না। কয়েকদিন পরেই অসুখের ভান করে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল এথেন্স শহরে। ডিউক তখন অনুপস্থিত সেখানে। এই সুযোগ! মেয়েটিকে ইলোপ করার সুযোগটা সে হাতছাড়া করতে চাইল না। ম্যানুয়েলকে

তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আসে সে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আসার আগে।

এথেন্স-এ ফিরে সে প্রথমে তার বোন ড্যাচিসের সঙ্গে দেখা করল। তাকে সে বোঝাল, তার ভালোর জন্যেই সে তার স্বামী ডিউকের প্রেমিকাকে ইলোপ করে নিয়ে যেতে চায় সেখান থেকে। বোনের কাছে সে তার মনের গোপন ইচ্ছার কথা প্রকাশ করল না। ড্যাচিস তখন তাকে বলল 'তোমার সব কাজেই আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে দেখ, ডিউক যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, এ ব্যাপারে আমার মত আছে।'

'তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো বোন কাক পক্ষীও জানতে পারবে না।" এই বলে তারপর সে প্রথমেই একটা দ্রুতগামী স্পীড বোটের ব্যবস্থা করল অত্যন্ত গোপনে। ডিউকের বাগানবাড়িটা ছিল সমুদ্রের ধারেই। কনস্ট্যান্ট তার কিছু অনুচরদের স্পীড বোটটা পাহারা দিতে বলে বাকী লোকদের সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে গেল। ডিউকের সম্বন্ধী বলে খাতির করলেও অনুচররা তার ওপর নজর রাখতে ভুললো না। মেয়েটির এক পরিচারিকা মারফৎ সে খবর পাঠাল ডিউকের কাছ থেকে একটা গোপন বার্তা সে বহন করে নিয়ে এসেছে। স্বাভাবিক কৌতূহলবশত মেয়েটি কাছে আসতেই তার অনুচররা মেয়েটিকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। কনস্ট্যান্ট তাদের দিকে তলোয়ার উচিয়ে হুমকি দেয় ; মৃত্যু যদি না চাও তো এক পাও আর নড়বে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। যতক্ষণ না আমার স্পীড বোটটা তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে না যায়। ডিউকের রক্ষিতাকে হরণ করার উদ্দেশ্য আমার নয় তবে সে আমার বোনের যে ক্ষতি করেছে সেটা পূরণ করার জন্যেই আমি একে নিয়ে যাচ্ছি বুঝলে?

কিছু দূরে গিয়ে তারা অপেক্ষা করে, স্পীড বোটে উঠে যাত্রা শুরু করল। কয়েকদিন পরে তারা চিরসে গিয়ে পৌঁছাল। জায়গাটা নিরাপদ মনে করে কনস্ট্যান্ট সেখানে থেকে গেল কিছুদিন। মেয়েটিকে চুরি করে আনার খবরটা সেখান থেকে বাবার কানে গিয়ে পৌঁছবে না অন্তত, ভাবল সে। কয়েকদিন ধরে মেয়েটি তার দুর্ভাগ্যের কথা ভেঙে কাটিয়ে দিল। তারপর একদিন সে কনস্ট্যান্টের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারল না। আগের মত সে তার ভাগ্যকে মেনে নেয় নতুন ভাবে কনস্ট্যান্টের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠল। ডিউকের কথা ভুলেই গেল সে একদিন। কিন্তু মেয়েটির নতুন জীবন, ঘর সংসার বেশীদিন স্থায়ী হল না আগের মতন। ভাগ্যদেবী আবার তার ওপর অপ্রসন্ন হলেন।

আবার সে হাত বদল হল, অন্য এক পুরুষের উপভোগের সামগ্রী হল সে। তারপর একে একে আরো অনেক পুরুষের হাত বদল হতে হল তাকে। তার দেহ নিয়ে অনেক পুরুষই ছিনিমিনি খেলল তারপর। সুন্দরী হওয়ার অভিশাপ যে কি, মেয়েটি বাস্তবে সেটা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল।

বারবার সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি না করে মেয়েটির ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের

একেবারে শেষ অধ্যায়ে আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। এই বলে প্যানফিলো আবার বলতে শুরু করল।

সাইপ্রাসের সতদানার প্রথমে তাকে বোনের মতো গ্রহণ করল তার দুঃখের কাহিনী শুনে। কিন্তু জাহাজে পাড়ি দিতে গিয়ে তার কেবিনে মেয়েটিকে একদিন নিভৃতে পেয়ে তার রূপ আর যৌবন দেখে ভাইবোনের সম্পর্ক আর টেনে নিয়ে যেতে পারল না। তার সব ধৈর্য ভেঙে রেণু রেণু হয়ে ভেঙে পড়ল। আর মেয়েটিও বহুদিন পুরুষ সঙ্গ না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠেছিল। বলতে গেলে একরকম স্বেচ্ছায় সে তার কাছে ধরা দিয়ে ফেলল। তারপর একদিন সাইপ্রাসের বন্দর প্যাফোসে নামল স্বামী-স্ত্রী হিসেবে।

একদিন প্যাফোসে অ্যান্টিগোনা নামে এক বয়স্ক লোক এল। মেয়েটির বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে একদিন। তখন সাইপ্রাসের সেই সতদানার বাড়িতে ছিল না। ব্যবসার কাজে আরমিনিয়ায় গিয়েছিল সে তখন। মেয়েটিকে জানালার সামনে দেখতে পেয়ে অ্যান্টিগোনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, কোথায় যেন সে দেখেছে মেয়েটিকে। ঠিক ওর মতন সুন্দরী মেয়ে, তার মুখটা মনে আছে, কিন্তু পরিচয়টা ঠিক খেয়াল করতে পারছিল না সে। মেয়েটিও তাকে দেখে ভাবছিল, আলেকজান্দ্রিয়ায় লোকটাকে দেখে থাকবে সে, বাবার কাছে লোকটা এসেছিল কোনো একটা কাজে। লোকটাকে দেখে কেন জানি তার মনে হল সে বোধহয় তার বাড়ি ফেরার পরামর্শ দিতে পারে ; লোকটার সাহায্যে তার দুঃখের অবসান হতে পারে। মেয়েটি তার একজন পরিচারিকাকে পাঠিয়ে লোকটিকে ডেকে পাঠাল, লোকটি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল 'আপনাকে ফেমাগুস্টার অ্যান্টিগোনা বলে মনে করলে আমি কি ভুল করব?'

"না", অ্যান্টিগোনা চটজলদি উত্তর দিল, "বিন্দুমাত্র নয়। আমিও ভাবছিলাম, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু এখন তোমার নামটা খেয়াল করতে পারছি না। কি তোমার পরিচয় বল তো?" মেয়েটি এবার নিশ্চিত হল, এই মানুষটিকেই সে খুঁজছিল। তার দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বাদল নামল। দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে মেয়েটি এবার ডুকরে কেঁদে উঠল। অ্যান্টিগোনোর বুক থেকে অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে এক সময় মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাকে কখনো আলোকজান্দ্রিয়ায় দেখেন নি।?'

অ্যান্টিগোনা এবার তাকে চিনতে পারল—সুলতানের মেয়ে আলটিয়েল সে। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার সবাই জানে সুলতানের সুন্দরী কন্যা সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে। অ্যান্টিগোনা তাকে খবর দিল, "মিশরের সমস্ত লোক জানে, তুমি সমুদ্রে ডুবে মারা গেছ। বহু বছর তোমার কোনো খবর না পেয়ে তাদের সেই ধারণাটা আরো বদ্ধমূল হয়ে গেছে।"

"তাদের ধারণা ঠিকই। কিন্তু তারা তো জানে না, কি ভয়ঙ্কর দুর্বিষহ জীবন

আমাকে কাটাতে হয়েছে।'

'তুমি যদি কিছু মনে না কর, এই দীর্ঘ কয়েক বছর তুমি কিভাবে কাটালে বলবে?' অ্যান্টিগোনা জিজ্ঞেস করল।

'অ্যান্টিগোনা', আলটিয়েল উত্তরে বলল, 'আপনাকে দেখেই কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন আমার নিজের বাবাকে দেখছি। অনেকদিন থেকে আমি আমার প্রিয়জনকে খুঁজছিলাম, যাকে আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী বলা যেতে পারে, যা আমি এর আগে কাউকে বলিনি, মানে বলতে পারি নি। হ্যাঁ, আপনাকেই সে সব কথা বলা যায়। সব শোনার পর যদি মনে করেন, আমি আবার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারব। আর যদি মনে করেন, তা সম্ভব নয়, তাহলে আপনাকে অনুরোধ করছি, কাউকে বলবেন না, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, আমার সম্পর্কে কোন কথা আপনি শুনেছেন।"

মেয়েটি তার দুঃখের কাহিনী এক এক করে সব বলে গেল, কোনো কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু অ্যান্টিগোনা ভাবল, এ কাহিনী শুনলে, সুলতান কিংবা আলগারভ-এর রাজা তাকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই অ্যান্টিগোনা তখন মেয়েটিকে পরামর্শ দিল, সে যেন তার জীবনের তিক্ত ঘটনার কথা গোপন রেখে সৎ জীবনযাপনের গল্প ফেঁদে বসে। এরপর অ্যান্টিগোনা আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মেয়ের বেঁচে থাকার খবর দিতেই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তখুনি লোক লস্কর পাঠালেন মেয়েকে দেশে ফিরিয়ে আনার। আলাটিয়েলের দুঃখের জীবন তখন শেষ হয়ে এসেছিল। সুলতান তখন আলগারভ-এর রাজার কাছে চিঠি লিখে তাঁর মেয়ের সাময়িক বিপর্যয়ের কথা জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তখনো তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি আছেন? আলগারভ-এর রাজা খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোক লস্কর পাঠিয়ে আলটিয়েলকে তাঁর দেশে আনতে পাঠালেন। মেয়েটি অতঃপর আটজন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার পর কুমারী মেয়ে হিসেবেই তার সত্যিকারের স্বামীর ঘর করতে আলাগারভ-এ চলল। বহু বছর ধরে মেয়েটি সুখে দিন কাটাল আলগারভ-এর রাজার রানি হয়ে। এর থেকেই বোঝা যায়, চাঁদের কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাই বলে চাঁদ তো তার সৌন্দর্য হারায়নি?"

লাভ অ্যান্ড সেক্স অফ এ গুড গার্ল

ন্যান্সি ফ্রাইডে

"নর নারীর প্রেম ভালবাসা আর যৌনতা নিয়ে ন্যান্সি ফ্রাইডে যে গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন—সেগুলি অনেক তাত্ত্বিক সাহিত্যিকদের কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মূল্যায়নে ফ্রাইডের গল্পগুলি অবশ্যই কালোত্তীর্ণ। যৌন চেতনায় অনভিজ্ঞ এক যুবতীর কথা নিয়েই এই প্রবন্ধধর্মী গল্পটি।

পূর্ণিমার রাতে যখন পূর্ণ চাঁদের হাট বসে, তরুবীথি ঘেরা সুবাসিত উদ্যানে একা একা ঘুরে বেড়ানোর সময় হঠাৎ অতর্কিতে যদি কোনো যুবক সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ মেয়েকে পিছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কোনো কথা নেই, বার্তা নেই তার মুখটা মেয়েটির মুখের উপর নামিয়ে এনে তার তৃষিত ওষ্ঠদ্বয় মেয়েটির উষ্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের উপর চেপে ধরে চুমু খায়, স্ফুরিতক চুম্বনে রক্তবর্ণ করে দেয় তার প্রেমিকার ওষ্ঠ, আর সেই চুম্বনে বৃষ্টি-পড়া কদমের মতো কণ্টকিত হয় তার ওষ্ঠদ্বয়, তখন মেয়েটি কি করে বুঝবে যে, সেটা তার যৌন অনুভূতি, আর সেই হবে তার চুম্বনের প্রথম স্মৃতি! তার সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত দেহ ও মনে এই যে এখন এই মুহূর্তে অন্য সব ভাবাবেগ আর সংবেদন থেকে যৌনানুভূতিকে আলাদা করে রাখার প্রয়োজনীয়তা, এরকম কিছুই ঘটেনি এর আগে তার জীবনে। এবং সাহায্যের জন্যে তাকে এভাবে হাহাকারও করতে হয়নি। যৌন উত্তেজনা হলে পুরুষদের মধ্যে একটা লক্ষণ যেমন অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে তাদের সেই ভাব প্রকাশ পায় তাদের স্তনবৃন্তের কাঠিন্যলাভের মাধ্যমে। কিন্তু অ্যানির শরীরে সেরকম ভাব কখনো দেখা যায়নি এর আগে। এটা যৌনতা প্রকাশের লক্ষণ, এরকম কোনো ইঙ্গিতও তার দেহ কখনো দেয়নি, এমন কি অপর ভাবাবেগ, রোমান্টিক সাদৃশ্য, এসবের সঙ্গে তার জ্ঞান বা উপলব্ধি বলতে যা বোঝায়, সেরকম কিছুই ছিল না।

যৌন ব্যাপারে অ্যানি ছিল একেবারে অনভিজ্ঞ। নারী ও পুরুষের কি সম্পর্ক, উভয়ের কাছে উভয়ের দেহের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই প্রয়োজনের সদ্ব্যবহারে যে এক অনাস্বাদিত সুখানুভূতি জাগে উভয়ের দেহ-মনে এসব কিছুই জানা ছিল না অ্যানির। এর জন্যে অবশ্য তাকে নিষ্পাপ আখ্যা দিলে বোধ হয় সত্যের অপবাদ হবে, কিংবা প্রকৃতিকে অবমাননা করা হবে এই কারণে যে, সময়ে নারী পুরুষের

দেহ-মনে যৌনানুভূতি জাগাটা কোনো সামাজিক অপরাধ নয়, বরং প্রকৃতির নিয়মে তাকে বলা যায় অক্ষম অজ্ঞ কিংবা নিষ্ক্রিয় যা কখনোই কাম্য হতে পারে না। আর যদি কোনো নারী পুরুষের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব চলতেই থাকে চিরদিন, তাহলে সৃষ্টির বিনাশ ঘটবে, নতুন প্রজন্মের জন্ম আর হবে না। একটা পরিবার, একটা জাতির তথা একটা দেশের অস্তিত্ব তখন বিলুপ্তপ্রায় হয়ে দাঁড়াবে।

এমন অনেক মেয়ে আছে, যৌন ব্যাপারটা যার কাছে একেবারে অদ্ভুত, ঘৃণ্য এবং গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একটি মেয়েকে আমি জানি, বিয়ের জয়েও যে তার স্বামীর সঙ্গে দেহ মিলনে লিপ্ত হওয়া দূরে থাক এমনকি স্বামীর সঙ্গে একই শয্যায় তার সঙ্গিনী হয়নি বিয়ের পর অন্তত ছ'মাস পর্যন্ত তো বটেই। যৌনবিদ তথা মনস্তত্ত্ববিদরা বলে থাকেন, স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির যৌন সংসর্গে আতঙ্কের প্রধান কারণ হল, তার যৌনজ্ঞানের অভাব। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে জানত না নারী-পুরুষ তথা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি, সে জানত না বিয়েটা নারী ও পুরুষের অবাধ দেহ মিলনের একটা আইনসিদ্ধ ছাড়পত্র, আর সেই ছাড়পত্রের মর্যাদা দেওয়া উচিত প্রতিটি নারী ও পুরুষকে। এই জ্ঞান মেয়েটি উপলব্ধি করেছিল এক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। তার স্বামী ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসার। বিয়ের ছ'মাস পরে মেয়েটি তার ফরেস্ট অফিসার স্বামীর সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্রে চলে যায়। তার স্বামীর বাসস্থান ছিল জঙ্গলসংলগ্ন একটা বাংলোয়। সেখানে এক পূর্ণিমার রাত্রে মেয়েটি তাদের শয়নকক্ষের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় তাদের বাংলো সংলগ্ন উদ্যানে এক জোড়া হরিণ-হরিণী মৈথুন ক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল, তারা তখন সৃষ্টির নেশায় বিভোর। মেয়েটি সেই প্রথম যৌন-সংসর্গের দৃশ্য চাক্ষুস করে, আর সেই প্রথম সে বাস্তবে উপলব্ধি করে দেহ-মিলনের প্রয়োজনীয়তা। হরিণ-হরিণীর দেহ-মিলনের সেই দৃশ্য দেখে মেয়েটি তখন তার দেহে এমন এক অদ্ভুত উত্তেজনা এবং জ্বালা অনুভব করে যে সেই মুহূর্তে সে তার স্বামী সংসর্গের তাগিদটা ভয়ঙ্করভাবে অনুভব করতে থাকে। তাই সে তখন একরকম ছুটে তার স্বামীর শয্যাপাশে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে, এবং কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি তার স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় মিলিত হয়, সেই প্রথম সে মিলনসুখ উপভোগ করে, যা তার কাছে পরম সুখপ্রাপ্তির সামিল বলে মনে হয়। তারপর মিলনে সে আর কখনো তার স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিতা করেনি। তারা তখন এক আদর্শ সুখী দম্পতিতে পরিণত হয়।

এক্ষেত্রে সম্ভবত অ্যানি যখন ছোট ছিল, নয় কি দশ বছর বয়স হবে তার, সেই সময় একদিন তার দুই উরুর সন্ধিস্থলে তার বালিশটা চেপে ধরতেই এক রোমান্টিকর অনুভূতি জেগে উঠেছিল তার দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার মনে হয়েছিল তার উরু সন্ধিস্থল থেকে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে, যে আগুন তার পক্ষে একা নেভান সম্ভব নয়, তার তখন একজন পুরুষ সঙ্গী চাই, যে তার দেহের আগুন নিভিয়ে দিতে পারবে। এই উদ্ভট কল্পনা প্রায়শই মেয়েদের মনে যখন জাগে তখন

তাদের বয়স খুবই কম। খারাপ পাইরেটের মতোই সেই কল্পনা তাদের নিষ্পাপ মনটা দখল করে নেয়, আবার এমন কিছু বদ লোক আছে যাদের এমন কিছু কিছু কল্পনা আছে যা নিষিদ্ধ, যা মেয়েদের দেহ-মন কলুষিত করে দিতে পারে, অপবিত্র করে দিতে পারে, সেসব অনুভূতিগুলোই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিজ্ঞাপিত করে থাকে। তবে তাই বলে এ ধরনের অনুভূতিগুলোকে কেউই যৌন বা কামজ বলে ভাবে না। কেউ ভাবে না মাত্র ন'বছর বয়সের মেয়ের মনে কাম ভাব জেগে উঠতে পারে। ভগবান না করুন, একটি চার বছর বালিকার মধ্যেও আবার প্রথম যৌন অনুভূতি সক্রিয় হয়ে ওঠার কথাটা যেন সত্যি না হয়, মিথ্যে বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। তবুও এটা একটা ঘটনা, সেই সব বালিকাদের অভিভাবকদের বড় ভাবনা, বড় দুশ্চিন্তা।

কোনো মেয়ে কি ভাবছে, কি অনুভব করছে নিজের কাছেই তার কোনো ভাষা নেই বর্ণনা দেওয়ার মতো, তবুও সেই সব নোংরা কথাগুলো জানতে চায় না সে, কারণ ইতিমধ্যেই ভালো মেয়ে হিসাবে সুখ্যাতি পেয়েছে সে তার অভিভাবকদের কাছ থেকে। কিশোর বয়সেই সব মেয়েদেরই বিশ্বাস, সব রকমের বেদন, সংবেদন, ভালোবাসার মাধ্যমে সারতে হবে। তবে দেহকে বাদ দিয়ে কোনো ভালোবাসাই যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, সেটা জানতে তাকে অপেক্ষা করতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক প্রাপ্তি পর্যন্ত, যৌবনের পূর্ণতাই তাকে তার দেহ ও মনের সঠিক পথের নিশানা দিয়ে দেবে।

এখন দেখা যাক ছেলেটি কোনো মেয়েকে চুমু খেলে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়। ছেলেটি মেয়েটির মনে এই সব মনোভাব জাগিয়ে তোলে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা সে রপ্ত করেছিল যৌন উত্তেজক গানের কথা আর সুর থেকে। রোমান্টিক উপন্যাসের পরিচ্ছদ থেকে, ছায়াছবির প্রেমের দৃশ্য থেকে। ছেলেরা যখন বহির্জগতে বেরিয়ে নানান ভালোমন্দ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে সৎ মানুষের গুণগুলো আহরণ করে সৎ-সাহসী এবং স্বাধীন হওয়ার শিক্ষালাভ করতে থাকে, তখন মেয়েরা অন্দরমহলে থেকে একসাথে থাকার অভ্যাস করা অন্য মেয়েদের সঙ্গে নাচ করা, নিজেদের মধ্যে উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়া, কি করে পুরুষদের কাছ থেকে দূরে থেকে দেহের পবিত্র বজায় রাখা, এসব অভ্যাসগুলো রপ্ত করতে ব্যস্ত থাকা। এ ধরনের নিশ্ছিদ্র বন্ধুত্বের ফলে মেয়েরা বহুর মধ্যে একতা রক্ষা করে চলতে দেখে যেমন তারা তাদের মায়ের সঙ্গে এক হয়ে থাকে, আর এই ভাবটা জিইয়ে রাখার জন্যে তারা বারবার নিজেদের মধ্যে অভ্যাস করে নিতে থাকে যতক্ষণ না ছেলেরা তাদের গ্রহণ করার জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তোলে। আর যদি এই সব ভালো ভালো বন্ধুত্বের মধ্যে একটিও তালগোল পাকিয়ে যায় কিংবা ভণ্ডুল হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা কোনো মায়ের পরিত্যক্ত শিশুর বেদনারই সামিল বলা যায়।

এই বিশ্বাস-ভঙ্গতা স্বাবলম্বনে বহু প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যাপারে তেমন কোনো

উপকার করতে পারে না। বরং পতনই ডেকে আনে তাদের জীবনে। মেয়েরা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার বাইরে কতটুকুই বা জানে? তারা তাদের সারাটা জীবন ধরে একসঙ্গে থাকা, ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যেই শুধু প্রশংসিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেই সব স্থিতবস্তা বজায় রাখতে গিয়ে তাদের যে কি পরিমাণ আত্মবলি দিতে হয় সেটা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করে না।

তাই তারা পূর্ণ চাঁদের হাটে নিজেদেরকে একসাথে সামিল করেছে আজ। ছেলে এবং মেয়েটি। ছেলেটিকে দেখে মনে হয়, বেচারা নিরীহ নিষ্পাপ, তার সম্পর্কে মেয়েটির ধারণা এই রকমই। এবং এরকম একটা ভালো ধারণা করে নিয়েই সে তাকে স্পর্শ করে, চুমু খায়, সুখ অনুভব করে। এখন দেখতে হবে যুবকরা এই সব মেয়েদের কতটুকুই বা জানে? তার একটা হাত তখন মেয়েটির কোমর বেষ্টিত এবং আর অন্য হাতটি তখন মেয়েটির দুই উরুর সন্ধিস্থল ছুঁই ছুঁই। মেয়েটি আশৈশব যে পবিত্র ভাবধারায় বড় হয়ে উঠেছে, তার কাছে ছেলেটির এমন এক বিসদৃশ ব্যবহার যেন তার কাছে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের সামিল। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে ওঠে। মেয়েটি তখন ক্রুদ্ধ স্বরে ছেলেটিকে তিরস্কার করে বলে, সে এক জঘন্য চরিত্রের ছেলে। মেয়েটি কেঁদে ফেলে। ছেলেটি কি করে তাকে বাজারি মেয়ে ভাবল? এতদিন সে ভালো মেয়ে হওয়ার সব রকম নিয়ম-নিষ্ঠ পালন করে এসেছে, তার সেই প্রাপ্য মর্যাদা দেবে না ছেলেটি? ছেলেটি তার এই সব ভালো ভালো কাজের পুরস্কার হওয়ার কথা, তাকে এভাবে নির্যাতন করার কথা নয়। তাছাড়া, তাছাড়া মেয়েটি তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থাকার সময় যে রোমান্টিক ভাব অনুভব করেছিল, অপর হাত দিয়ে সেটা সে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ছেলেটি তার ওপর যে অন্যায় ব্যবহার করেছে, তার খেসারত তাকে দিতেই হবে। যদি ছেলেটি আবার তার হাত মেয়েটির গায়ে দিতে চায়, তাহলে সেটা হবে তার শর্তে। কোনো ছেলের সঙ্গে কোনো মেয়ের বন্ধুত্ব স্থাপন করার ক্ষেত্রে মেয়েটির প্রথম শিক্ষাই হল তাকে আভাস দেওয়া এই বলে যে, যৌনভাবটাকে সময় মতো ব্যবহার করার আগে পর্যন্ত প্রশমিত করে রাখা। এর জন্যে যদি ছেলেটির মনক্ষুণ্ন হয় তাহলে সে নাচার।

আর তার পক্ষে, ছেলেটি এবার মেয়েটির ওপর ভার দেয়, সে স্থির করুক তাদের মধ্যে কোনো সেক্স হবে কি হবে না। মেয়েটি এর আগে যে ভাবে ছেলেটির ওপর তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল, সে কথাটা মেয়েটিকে মনে করিয়ে দিতে চাইল সে। ছেলেটিও তাকে এও জানিয়ে দেয় যে, মেয়েটিকে এখনও চায় সে। ভালোবাসার দরাদরি তাকে এমন বিরক্ত হয়ে যে করতে হবে ভাবতেই পারেনি ছেলেটি। তাই এভাবেই না বলা শর্তে তাদের ভালোবাসার ভিত এভাবেই রচিত হল। অতএব নারী ও পুরুষের মধ্যে এভাবেই যুদ্ধের সূত্রপাত।

যদি কখনো মেয়েটি উপলব্ধি করে, যৌনতার অধিকার তার আছে, যৌবনপ্রাপ্তির

সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন কী প্রতিটি লোমকূপে যৌনতার প্রকাশ ঘটেছে, যা তার প্রেমিকের কাছে আকর্ষণীয় এবং প্রকৃতির নিয়মে সেটাই কাম্য এই কারণে যে, যৌনক্রিয়া একা নারী কিংবা একা পুরুষের শত চেষ্টাকেও সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, সেটা করতে হয় যৌথভাবে উভয়ের সম্মতিতেই। তার এই নবলব্ধ উপলব্ধির পরেও কি মেয়েটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয়? হস্তমৈথুন সব কিছুর সমাধান করতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, ভালোবাসা থেকে যৌনভাবটাকে কখনোই আলাদা করে রাখা উচিত নয়, প্রেম ও যৌন এ দুটি একে অপরের পরিপূরক, তাই এ দুটিকে এক সাথে নিয়েই ঘর করতে হয়। মেলামেশা করতে হয় প্রতিটি নারী পুরুষকে।

মেয়েদের মেয়েবেলার ভাবধারা অন্যরকম থাকে, মায়ের শিক্ষায় অন্য ভাবে তারা নিজেদেরকে গড়ে তোলে। মায়ের শিক্ষা হল, সব সময় নিজের দেহটাকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করবে, কুমারীত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে, পুরুষের প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। ঠিক আছে, এই মেয়েবেলা পর্যন্ত, কৈশোর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু কৈশোর পেরিয়ে যখন সে যৌবনে পা দেবে, তখন সেক্স সম্পর্কে তার শিক্ষা, ধ্যান ধারণা সব বদলে দিতে হবে। তখন তার মায়ের উচিত তাকে বোঝান, এরপর থেকে হস্তমৈথুনে তার রতিতৃপ্তিলাভের প্রয়োজন আর নেই, এখন তাকে সরাসরি তার মনের মতো পুরুষের সঙ্গে দেহমিলনে লিপ্ত হয়ে যৌনসুখের সন্ধান করা উচিত। এখন তাকে প্রকৃত ভালোবাসার পাত্রের সন্ধান করতে হবে, তার সঙ্গে প্রেম করতে হবে, তাকে জানতে হবে, তার মধ্যে জেগে উঠবে যৌনভাব, এবং তার দেহেরও প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌনতার প্রকাশ প্রকট হয়ে উঠবে, যেমন মেয়েটি তখন তার স্তনে তার প্রেমিকের চাপ আকাঙ্খা করবে, প্রেমিকের চুম্বনে সে তার ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ করে তুলতে চাইবে, পুরুষ কৌমার্য হরণ করতে হত তাকে। আর এভাবেই সে উদগ্র সঙ্গমেচ্ছু করে তুলতে পারবে নিজেকে। কৈশোরে সে তার মায়ের কাছে সেক্স থেকে দূরে থাকার শিক্ষাটা এখন বদলাতে হবে, নিজেই নিজেকে সেক্স সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, এবং হস্তমৈথুনের প্রয়োজনীয়তা ভুলে যেতে হবে তাকে। নিজেকেই যৌন জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, তা না হলে তার বিবাহিত জীবন সুখের হবে না, অসময়ে অপমৃত্যু ঘটতে বাধ্য! তবে এক্ষেত্রে ছেলেদেরও একটা ভূমিকা আছে। দায়িত্ব আছে মেয়েটিকে যৌনসুখী করে তোলার, তাকে যৌন জীবনে নিয়ে আসা। তবে ছেলেটির সর্বপ্রথম কাজ হবে তাকে ভালোবাসতে হবে, তার গভীর ভালোবাসা দিয়ে মেয়েটিকে বোঝাতে হবে ভালোবাসা আর সেক্স এ দুয়ের সম্পর্ক ঠিক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মতো। কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না জীবন থেকে। আর তাতেই সাফল্য পাবে সে, মেয়েটিকে তার সঙ্গে যৌন-মিলনে রাজি করাতে পারবে।

টম জোন্স

হেনরী ফিল্ডিং

"হেনরি ফিল্ডিং তাঁর উপন্যাস টম জোন্স-এর জন্য সুপরিচিত, এলবার্ট ফিনি এবং সুমানা ইয়ার্ড এই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা। এই কাহিনী তাঁর প্রারম্ভিক উপন্যাস থেকে নেওয়া। এই লেখাটি মনে করিয়ে দেয় ফিল্ডি-এর বিচিত্র ধরনের সুন্দর রসবোধ, কৌতুকপ্রিয়তা এবং স্বাভাবিক উদারতাবোধ। সুন্দরী পরিচারিকার সঙ্গসুখে এক অনাবিল তৃপ্তির স্বাদ পাওয়া, যার আনন্দময় কৌতুক মেয়েটি নিজেই অস্বীকার করতে পারে না, শরীরী মিলন তাকে সুখ প্রাপ্তির প্রচুর সুযোগ করে দিয়েছিল, সেই ক্ষণিকের যৌন অভিজ্ঞতা বারবার তার দেহ-মনে একটা নিরবিচ্ছিন্ন কৌতুহল জাগিয়ে তুলতো রাতের পর রাত..."

সব সময়েই ওর মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যস্ততা, এ ঘর থেকে ও ঘরে, একজনের হৃদয় থেকে অন্য একজনের হৃদয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান, এতো সব ব্যস্ততার উপলক্ষ্য তো সেই একটিই মেয়ে বেটি। সুন্দরী, তন্বী ও যুবতী, এসব ছাড়াও আরও কিছু ভালো ভালো গুণ ছিল, যা উল্লেখ না করলে ওর প্রতি ভয়ঙ্কর একটা অবিচার করা হয়ে যাবে। ওর মধ্যে ছিল একটা ভালো স্বভাবের লক্ষণ, মহত্ববোধ এবং অপরের দুঃখে সমবেদনা জাগাবার সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ওর দেহ-মনের বিন্যাস যে সব উষ্ণ মিশ্র ধাতুতে গড়া, তাতে আশ্রম-বালিকার পবিত্রতা হয়তো বেশ সুন্দর অথচ অশুভ যা কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু একটা সরাইখানার পরিচারিকা হিসেবে কাজ করার সময় সেখানকার আবহাওয়া এবং পরিস্থিতিতে ওর মনের সব দৃঢ়তা কেমন তাসের ঘরের মতো ভেঙে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে, তখন ও আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। বিচলিত হয়ে উঠতে বাধ্য হয়।

সরাইখানায় কত রকম চরিত্রের লোকেরই যাতায়াত, এখানে এলেই এখানকার পরিচারিকাদের এক একজন কত সহজেই না প্রেমিক হয়ে যায়, তার ওপর যদি কোনো পরিচারিকা সুন্দরী এবং বলা বাহুল্য যুবতী হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রেম নিবেদন। তারপর সরাইখানায় খদ্দের হিসাবে ধরে রাখতে সময়ে-অসময়ে তাদের আদর-আবদারও সহ্য করতে হয়, শয্যা-সঙ্গিনী হওয়ার জন্যে তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতেই হয়, যে মেজাজ বা মনোভাবেরই লোক হোক না কেন সে। এমনকি কখনো কখনো সামরিক বিভাগের কোনো কোনো সুন্দর সভ্য-ভব্য ভদ্রলোকের বিপজ্জনক আহ্বানেও সাড়া দিতে হয় ওকে, তাকে খাতির করতে সারাটা বছর ধরে তার সঙ্গী সাড়া দিতে হয় ওকে, তাকে খাতির করতে সারাটা বছর ধরে তার সঙ্গী হতে হয় বৈকি। এসব ছাড়াও সময় সময় পথচারী, কোচওয়ান কিংবা সরাইখানার পরিচারকদের মনোরঞ্জন করতে হয় ওকে। এইসব সামরিক বাহিনীর ক্ষণিকের প্রেমিক-অতিথিরা তাদের প্রেমের অশ্রু হিসেবে ওর ওপর ব্যবহার করতে চায় চুম্বন, মিথ্যে আশার প্রলোভন, উৎকোচ প্রদান এবং প্রেমের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যত রকম অস্ত্র আছে সবই ওর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চায় তারা।

একুশ বছরের যুবতী বোট আজ তিন বছর হল এই বিপজ্জনক অবস্থায় বাস করছে, এই সময়ে বেশ ভালোভাবেই নিজেকে সেই সব বিপদের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। আবার এই সময়েই বেটি ওর জীবনে এমন এক ব্যক্তির পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিল যে কিনা ওর হৃদয়ে একটা গভীর ছাপ ফেলে দিতে পেরেছিল। হ্যাঁ, অবশ্যই বেটির মধ্যে একটা অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিতে পেরেছিল, যে আগুন একবার সেই প্রেমিকটিই নেভাতে পারতো। এ এক বিচিত্র প্রেমের জ্বালা। বেটি যখন ওর সেই প্রেমিক প্রবরটির জন্যে ভেতরে ভেতরে জ্বলছে, ওর হৃদয় জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তখন বহু পুরুষ আবার ওকে না পাওয়ার জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরছে। সামরিক অফিসাররা, পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণরত যুবকেরা, মহিলাদের নিরীহ সঙ্গীরা এমনকী কবর খননকারীরা পর্যন্ত ওর তীব্র আকর্ষণে ছটফট করতে থাকে।

অবশেষে বেটি ওর প্রথম অসুখী আবেগের প্রচণ্ডতা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠার পর চিরস্থায়ীভাবে কৌমার্যব্রত গ্রহণ করার জন্যে শপথ নিল। বেটি প্রেমিকদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখেও বোবা বনেছিল দীর্ঘদিন ধরে। এভাবেই ও নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলছিল। এই সময় পাশেই একটা মেলায় সরাইখানার অশ্বরক্ষক জন-এর বক্তৃতা ওর ওপর দ্বিতীয়বার প্রভাব পড়ল। লোকটির মাথায় স্ট্র-হ্যাট এবং বগলে মদের একটা বোতল।

যাইহোক, এই উপলক্ষে বেটি ওর আগের প্রণয়ের ফলস্বরূপ সেরকম কোনো উত্তেজনা বা উত্তাপ অনুভব করেনি। এমনকী সেই একজন বিচক্ষণ যুবতী তার প্রেমিকের আদর ও সোহাগের নিরঙ্কুশ প্রশ্রয় থেকে আগে ভাগে টের পেয়ে গেছিল, আর এর থেকে ওর সতর্ক হওয়াটাই ওকে অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল। পরে অবশ্য বেটির মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা

যায়, জন-এর প্রতি ওর আনুগত্য, ভালোবাসায় একটু ঘাটতি কিংবা বলা যায় অবিচলিত না থাকার দরুন, জন-এর সঙ্গে কোচওয়ান টম হুইপওয়েল এবং যখন তখন এক একজন তরুণ ভ্রমণার্থীদের অনুগ্রহ করে সে।

মিষ্টার টো-উজ কিছুদিন ধরে এই যুবতীর ওপর কুদৃষ্টি ফেলে রাখছিল। সুযোগ পেলেই ওর কানের কাছে ভালোবাসার বুলি আওড়াতো। ইনিয়ে-বিনিয়ে কখনো বা কু-প্রস্তাব দিতেও ছাড়তো না, কখনো বা জড়িয়ে ধরে ওর গাল টিপে দিত, স্তনে চাপ দিয়ে মোচড় দিত, আবার এক এক সময় ওঁর ঠোঁটে চুমু খেতো। মিসেস টো-উজের জন্যে তার সেই আবেগের প্রচণ্ডতা একটু প্রশমিত হলেও, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বেশী সময় লাগে না। যেমন এক জায়গায় নদীর প্রবাহিত জলের স্রোতে বাধা সৃষ্টি করলে স্বভাবতই সেই স্রোত অন্য দিকে বাঁক নিতে বাধ্য। ওদিকে মিসেস টো-উজ হয়তো উপলব্ধি করে থাকবে, অন্য নারীর প্রতি তার স্বামীর আসক্তি। এবং সম্ভবত তার মেজাজের স্বাভাবিক মিষ্টতায় স্বামীর এই অন্যায় খেলায় তেমন কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না, কারণ প্রতিদিন সূর্য ওঠার মতোই স্বামীর কাছে তার স্ত্রী ধ্রুব সত্য। স্ত্রী যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে, স্বামীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে উষ্ণতা অনুভব করতে সমান পারদর্শিনী সে। আসলে তার সব বক্তব্যের একটাই মূল সূত্র হল, যেমন আকর্ষণে স্বামীরা পর-নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিংবা অন্য নারী তাদের চটুল ছলাকলা দেখিয়ে পর-পুরুষদের আকর্ষণ করার ফাঁদ পেতে থাকে, সেগুলো যদি তারা নিজেরাই যে যার বাড়িতে বসে তাদের স্বামীদের দেখাবার চেষ্টা করে, মনে হয় এতে তারা ফল পেতে পারে হাতে হাতে। স্ত্রীরাই যদি স্বামীদের চাহিদা মতো অন্য নারীর অভাব পূরণ করে দিতে সক্ষম হয়, তাহলে কেনই বা তারা বহির্মুখী হতে যাবে?

যোসেফের আবির্ভাবের পর থেকেই ভয়ঙ্করভাবে তাকে পছন্দ করার ভাব প্রকাশ করতে থাকে বেটি। ওর এই আকর্ষণবোধ উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। বিস্ফোরক পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে যেমন দেশলাই কাঠির প্রয়োজন হয়, তেমনি এই মুহূর্তে বেটির বিস্ফোরক দেহে বিস্ফোরণ ঘটাতে প্রয়োজন একজন পুরুষের, মনের মতো পুরুষ দেশলাই কাঠির মতো সেই কাজ করবে ওর দেহে অগ্নিসংযোগ করে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে। আর সেই দেশলাইকাঠিটা এখানে যোসেফ। ওদিকে যোসেফেরও জায়গাটা ক্রমশই ভালো লাগছিল, এক অনাস্বাদিত আকর্ষণবোধ করছিল। সে আকর্ষণের গূঢ় অর্থ বোধহয় যোসেফ নিজেই জানতো না, তা বেটি কি করে জানবে? সব কিছুই অজানা তখন বেটির। ও তখন জানতো না কোন পথে পদক্ষেপ করতে চলেছে ও। স্রেফ মোহে, হ্যাঁ একটা মোহের আবর্তে পড়ে ও তখন লাট্টুর মতো পাক খেতে চাইছিল ওর স্বপ্নের রাজকুমার যোসেফের চারপাশে। সরাইখানার

পরিচারিকা হিসাবে বেটির কাজ ছিল বোর্ডারদের ঘর পরিষ্কার রাখা এবং বিছানাপত্তর গোছগাছ করা। সেদিন সেই ভয়ঙ্কর রাতটা ছিল প্রচণ্ড শীতলতম। যোসেফের বিছানাটা তখন বরফের মতো ঠাণ্ডা, তাই তার বিছানাটা গরম করতে গরম-প্যান ব্যবহার করছিল ও। যোসেফের বিছানা গরম করতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে ও নিজেই এতই গরম হয়ে উঠছিল, এবং ওর আবেগ এমনি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল, এবং এমন নিখুঁত ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল ওর বিনয় ও নম্রতার গুণে যে, অনেক ব্যর্থ আকার-ইঙ্গিত এবং পরোক্ষ ইশারা সত্ত্বেও যোসেফ যখন সাড়া দিল না, অবশেষে ও তখন গরম-প্যানটা নিচে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল যোসেফকে, ওর মধ্যে প্রচণ্ড কামনা-বাসনা, বেটির উচ্ছ্বাস তখন এমনি এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল যে, যোসেফ তখন ওর কাছে যেন এক রাজপুত্তর, পৃথিবীর সেরা সুপুরুষ যাকে ও আগে কখনো দেখেনি। তাই যোসেফকে একান্তে কাছে পেতে সবকিছু করতেই প্রস্তুত, এমন কি যদি সে চায় তার সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতেও প্রস্তুত ছিল বেটি তখন। ভাবা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না, এই সেই বেটি যে কিনা যোসেফের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের সতীত্ব রক্ষার্থে অবিচল ছিল, কোনো পুরুষ ওকে স্পর্শ করা দূরে থাক, কোনোরকম প্রলোভনে প্রলুব্ধ পর্যন্ত করতে পারেনি ওকে। বিচিত্র নারী, তার চেয়েও বিচিত্র বোধহয় তার মন!

ওদিকে যোসেফ কিন্তু এ সবের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বেটি যে অমন এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করতে পারে, সেটা ছিল তার ধারণার অতীত, কল্পনার বাইরে। সে তখন ভয়ঙ্কর বিভ্রান্ত, হতভম্ব, দ্রুত বেটির আলিঙ্গন ছিন্ন করে লাফিয়ে উঠল। তারপর ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে ওঠার পর স্পষ্টতই বেটির অমন সৃষ্টিছাড়া আচরণের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে উঠল, একজন যুবতী মেয়েকে অমন নম্রতা, শালীনতা বিসর্জন দিতে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত সে। এমনটি সে আশা করেনি বেটির মতো মেয়ের কাছ থেকে।

বেটির কিন্তু তাতে কোনো রকম ভ্রূক্ষেপ নেই, যোসেফের কথাগুলো এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বার করে দিল। শুধু কি তাই, ও তখন এমনি এক কঠিন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে, সেখান থেকে পিছু হটে আসা সম্ভব নয়। এবং বেটি তখন এমনি এক অভব্য ব্যবহার করল যে বেটির অপ্রত্যাশিত প্রেম-নিবেদনে সাড়া দেবার পরিবর্তে যোসেফ ওর এমন অশালীন ব্যবহারের বিরোধীতা করে ওকে দু'হাত দিয়ে ধরে কার্যত ধাক্কা দিয়ে তার ঘর থেকে বার করে দিল। এবং ভেতর থেকে নিজের ঘরটা বন্ধ করে দিল।

যদি কোনো পুরুষের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা থাকে এবং তার সংযম সব সময়েই নিজের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তার আনন্দ কত যে অপরিসীম

হয় তা বোঝাতে কোনো অসুবিধে হয় না। ঠিক এই কারণেই যোসেফের দৈহিক শক্তি সব সময়েই সক্ষম থাকে বলে নিজেই প্রতিরোধ করতে পারে, যেমন সহজেই বেটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারল। আর তাই কি বেটির মতো দুর্বল চিত্তের একজন নারী তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে তাকে ওর সঙ্গে সেই মিলনে লিপ্ত করতে পারল না!

এমন হতাশায় বেটি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। দুর্বার ক্রোধ, আবেগ আর কামলালসা ওর হৃদয়টাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যেমন দু'টো দড়ির প্রান্ত দু'টি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হলে যা হয়। একটা মুহূর্তে যোসেফের বুকে ছুরি বসিয়ে দেবার কথা ভেবেছিল বেটি। আবার পরমুহূর্তেই তাকে নিজের দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল এবং চুমায় চুমায় তার ঠোঁট রাঙিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল এবং পরের আবেগটা অত্যন্ত ব্যাপক। তারপর ওকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবল। কিন্তু ওর উপায় হিসাবে জলে ডুবিয়ে, গলায় ফাঁস দিয়ে কিংবা বিষপ্রয়োগ করার কথা ভাবছিল, তখন ওর বিক্ষিপ্ত মন কোনো সিদ্ধান্তেই উপনিত হতে পারল না।

এইরকম একটা অস্থির ভাবাবেগের মুহূর্তে আকস্মিকভাবে বেটির মনে পড়ে গেল, ওর মনিবের বিছানা পাতা হয়নি ; অতএব ও তখন সোজা জনের ঘরে চলে গেল। সেই সময় সে তখন তার টেবিলের সামনে বসে নিজের কাজ করতে ব্যস্ত ছিল। তাকে দেখা মাত্র ও তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হল। কিন্তু সে তখন ওকে ফিরে আসতে বলল। তারপর বেটির একটা হাত ধরে ওকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে ওর স্তনজোড়া চটকাবার ফাঁকে ফাঁকে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিস্‌ফিসিয়ে প্রেমের বুলি আওড়াচ্ছিল। আর এক সময় বেটিকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বেটির ঠোঁটের ওপর তার ঠোঁট চেপে ধরে চুমু খেতে থাকল। বেটি তখন সম্পূর্ণভাবে পরাভূত। বেটির দেহমনে আগেই আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত এমনটিই চাইছিল ও, জন ওকে পরাভূত করুক, বলপূর্বক কৌমার্য হরণ করুক। এবং বেটি মনে মনে চাইছিল ধর্ষিতা হওয়ার জন্যে। আর তাই কি ও নিজেকে সঁপে দিল জনের কাছে, ও এখন জনের হাতের পুতুল, সে ওকে যেভাবে নাচাবে, সেভাবে ও নাচবে। সনাতন প্রথায় সে যদি বেটিকে তার নিচে না শুইয়ে বলে, তুমি আমার ওপরে শোও, ও তাই করবে নীরবে। বেটির এখন একটাই উদ্দেশ্য যেভাবেই হোক জনকে পাওয়া, নিজের দেহকে তৃপ্ত করা, আর সেটা যদি বিপরীত বিহারে হয়, ক্ষতি কি!

জন-এর তরফ থেকে কেন এই বৈপরিত্য? আমার পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন, একটু আগে বেটি যখন স্বেচ্ছায় ওর দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে তুলে ধরেছিল যোসেফের সামনে, সে তখন ওকে গ্রহণ করা দূরে থাক। উপরন্তু

ওকে একরকম গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। এ যেন বেটির মনিবের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে বসে থাকা। না, ঠিক তা নয়, আসলে সেই সময় মিসেস টো-উজ অভাবনীয়ভাবে তার ঘরে ঢুকে পড়ে, এবং সেই মাত্র জন তার স্ত্রী সঙ্গে মিথুন-লগ্নে প্রবৃত্ত হয়, আর এটাই হল বিভ্রান্তির কারণ যা আমরা একটু আগে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বর্তমানে এ নিয়ে আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই এই কারণে যে, জন বেটিকে গ্রহণ করেছে সর্বান্তকরণে। আমাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র আভাস না পেলেও আমি অনায়াসে বলে দিতে পারি যে, প্রতিটি পাঠক-পাঠিকা, সে যে ধরনেরই হোক না কেন, কিংবা তার অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন, যদিও সে বিবাহিত নয়, সহজেই অনুমান করে নিতে পারবে। এর পরিণতি হল, জন-এর সঙ্গে মিলনে ওর স্বর্গসুখ প্রাপ্তি ঘটেছিল। তবে সেটা সম্ভব হয়েছিল তার স্ত্রীর বদান্যতার দরুণ। মিসেস টো-উজ-এর সঙ্গে তার স্বামীর বোঝাপড়া হয় এই পর্বে যে, ভবিষ্যতে জন এ-ধরনের ব্যবহার আর কখনোই করবে না, অর্থাৎ পরনারীর প্রতি আসক্ত হবে না সে।

সব শেষে এখন তার এমনি একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তার জীবনের অবশিষ্ট অধ্যায়ে দিনে একবার কি দু'বার তার শর্ত ভাঙার দায়ে প্রায়শ্চিত্য করার কথাটা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে তাকে। তবুও তাতে কোনোরকম ভ্রূক্ষেপ বা অনুশোচনা নেই। তার মনোভাব এখন এই রকম : অপরাধ করবো আবার জরিমানা দেব, জরিমানা দিয়ে সেই অপরাধের সুখ অনেক।

রোমান্স

অ্যানীস নীন

"প্যারিসে বিংশ শতাব্দীর বিশ ও তিরিশ দশকে অ্যানীস নীনের বোহেমিয়ান লাইফস্টাইল আজ আর অপরিচিত নয় পাঠক পাঠিকাদের কাছে। সেই সঙ্গে বহু বিতর্কিত গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক হেনরি মিলারের সঙ্গে তাঁর গোপন সম্পর্কের কথাও সর্বজনবিদিত। যার প্রতিফলন হয় হেনরি এন্ড জুন ছবিতে। সেই অ্যানীস নীন আমেরিকায় পাড়ি দিয়ে একের পর এক ইরোটিক গল্প লিখে যান, যার সম্মানিক মূল্য ছিল প্রতি পৃষ্ঠা এক ডলার। সেই সব বিশ্ব-বিখ্যাত ইরোটিক গল্পের মধ্যে এই গল্পটিও অন্যতম।"

ফরাসী দেশের একজন স্বনামধন্য বীর এবং নাইট এক সময় একজন অতীব সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়ে যান, আর সেই মহিলাটিও নাইটকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে এবং তার মন পাবার জন্যে তাঁর সব কিছু উজাড় করে দিতেন, এমন কি নারীর সব থেকে মূল্যবান সতীত্ব—সেটাও তিনি খরচ করে বসেছিলেন নাইটের জন্যে। ভদ্রমহিলা তখন নাইটের কাছে সম্পদলোভ্যা হয়ে ওঠেন, নাইট যা চান তাই দেন তিনি, না চাইতেই নিজের থেকে তিনি তাঁর দেহের নৈবেদ্য সাজিয়ে অপেক্ষা করে থাকতেন প্রতি রাত্রে। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাজার হুকুমে নাইটকে যুদ্ধে যেতে হলো স্পেন এবং অন্যত্র। সুন্দরীর কাছ থেকে বিছিন্ন হওয়ার পর মন খারাপ হলেও যুদ্ধে গিয়ে নাইটের সুনাম আরো বেড়ে গেল। রাতারাতি আরো বিখ্যাত হয়ে উঠলেন তিনি। যুদ্ধ শেষে তিনি বীর নায়কের মতো দেশে ফিরে এলেন।

ওদিকে নাইটের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রেমিকা আর অপেক্ষা করে থাকতে পারলেন না। জীবনের নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে তিনি একদিন বিয়ে করে বসলেন এক বয়স্ক বুদ্ধিমান ভদ্রলোককে। রাজদরবারে দারুণ খাতির তার। ভদ্রলোক মহা খুশি। কিন্তু বাড়িতে ফিরলে তাঁর সেই খুশির আমেজটা নিমেষে কর্পূরের মতো উবে যায় যেন। তাঁর স্ত্রী সেক্স ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কিন্তু সে জানে না, সেক্স ছাড়াও দাম্পত্য জীবন অন্য কিছু দিয়েও পরিপূর্ণ করে তোলা যায়। স্ত্রীর সঙ্গে কিছুদিন ঘর করবার পরেই ভদ্রলোক যেন বুঝতে পারেন তাঁর মতো জ্ঞানী-গুণী মানুষের যে

ধরনের বউ পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পাননি।

নাইট দেশে ফিরেই তাঁর প্রেমিকার বিয়ের খবর শুনে প্রথমে একটু মুষড়ে পড়লেও একটুও দমলেন না, কিংবা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেন না। একদিন তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে, বর্তমানে ভদ্রলোকের স্ত্রী, দেখা করতে গেলেন তাঁর স্বামীর বাড়িতে। ভদ্রলোক দারুণ আলাপী এবং অমায়িক। নাইটকে তিনি খুব খাতির করে আপ্যায়ন করলেন। সোজা তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাকে সম্মানিত অতিথির মতো। পরে নৈশভোজের পর দামী মদ খাওয়ালেন। নাইট দারুণ তৃপ্ত। তবু যেন কিসের অভাব! তা তাঁর সেই অভাবটা পূরণ করতে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী, নাইটের প্রাক্তন প্রেমিকা। ভদ্রমহিলা নাইটকে আদর আপ্যায়ন করতে চাইলেন ঠিক আগের মতো। একটুও বদলাননি তিনি।

ভদ্রমহিলার মনের ভাবটা টের পেয়ে আড়ালে তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকার কানে কানে ফিসফিস করে আগের মতো প্রেম নিবেদন করে বললেন, 'মানুষের ইচ্ছে থাকলে একটা না একটা উপায় ঠিক হয়ে যায়। তোমার স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে তুমি আমার ঘরে চলে এসো।"

'অসম্ভব!' ভদ্রমহিলা দু পা পিছিয়ে গিয়ে হতাশার সুরে বলে উঠলেন, "ওঁর ঘুম ভীষণ হাল্কা। তাছাড়া মাঝে মাঝে আমার গায়ের ওপর হাত রেখে ঘুমোন। তাই আমার আশঙ্কা, ঘুমের মধ্যে আমাকে না পেলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?" নাইট জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার স্বামী কি শুধু তোমার গায়ে হাত দেন, না অন্য কিছুও করেন?"

"না, এ বয়সে অন্য আর কি করতে পারেন?" বলে ভদ্রমহিলা রহস্যময় হাসি হাসলেন।

নাইট বুঝলেন, ভদ্রমহিলার বয়স্ক স্বামী বয়সের ভারে তাঁর যৌন ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন বোধহয়। ভালই হয়েছে, নাইট সঙ্গে সঙ্গে খুশি হলেন এই ভেবে যে, ভদ্রলোক তাঁর প্রেমিকাকে বিয়ে করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেও তাঁর প্রেমিকার দেহ খুন করতে পারে নি। আর তার প্রেমিকাও তাঁর অক্ষত সতীত্ব রক্ষা করে আসছে তার জন্যে। এইসব কথা ভেবে নাইট এবার তার প্রেমিকাকে বললেন, 'তাহলে তো ভালই হলো প্রিয়তমা। তুমি অন্য একটি মেয়েকে ওঁর পাশে শোয়াতে পারবে না? তোমার বাড়ির পরিচারিকা কিংবা অন্য কোনো মেয়ে যে কিনা তোমার হয়ে প্রক্সি দিতে পারে!"

"উত্তম প্রস্তাব!" ভদ্রমহিলা আনন্দে নেচে উঠলেন। চট্‌জলদি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর ব্যক্তিগত তরুণী পরিচারিকাকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমার জন্যে আমি তো অনেক কিছু করেছি। এবার তুমি আমার একটা উপকার করবে?"

"বেশ তো কি করতে হবে বলুন", পরিচারিকা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে বলে উঠল, "আপনার হুকুম মতো কাজ করতে আমি এক পায়ে খাড়া।"

"তাহলে শোনো বাছা, ভদ্রমহিলা অতঃপর তাঁর কাজের কথাটা চটপট সেরে নিতে চাইলেন", ঐ যে নাইট ভদ্রলোককে দেখছ, "দূরে নাইটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন তিনি, "আজ উনি আমাদের অতিথি হলেও ওঁর সঙ্গে আমার ভালবাসা দীর্ঘদিনের। ঘটনাচক্রে, বলতে পারো আমার অধৈর্যপনার দরুনই ওঁর সঙ্গে আমার বিয়েটা হতে পারে নি। তাই ওঁর সঙ্গে আমাকে কয়েকটা জরুরী কথা বলতে হবে, আর সেটা আমি গোপনে সারতে চাই, আজ রাতেই। সেজন্যে তোমাকে অনুরোধ করছি, আজ রাতে বিছানায় আমার জায়গায় তুমি শোবে। আমার স্বামী, মানে তোমার মনিব, রাতে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে আমার গায়ে একটু হাত রেখে থাকেন, তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। হ্যাঁ, উনি যখন তোমার গায়ে হাত রাখবেন, তুমি একটুও নড়বে না। কথাও বলবে না, স্রেফ চুপটি করে শুয়ে থাকবে। দেখো, এমন কোনো কাজ করবে না, মানে আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো! আমার স্বামীর স্পর্শ সুখ পেয়ে উত্তেজনাবশে এমন কোনো কাজ করবে না যাতে তিনি টের পেয়ে যান, আমি তার পাশে শুয়ে নেই, আমার বদলে তুমি"

পরিচারিকা জিভ কেটে বলে, "ছিঃ ছিঃ আমি কেন অমন খারাপ কাজ করতে যাব? তাহলে তো আপনার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, আমার তরফ থেকে কোনো অন্যায় কাজ হবে না।" এই কথা বলে রাজী হয়ে গেল পরিচারিকা।

রাতে ভদ্রমহিলার স্বামী এবং প্রেমিক নাইট যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্প শেষ করে আর এক দফা মদ্যপান সাঙ্গ করে এ ওর কামরার দিকে পা বাড়ালেন।

মনিব পত্নীর নির্দেশে অন্ধকারের মধ্যে ভদ্রলোকের শয়নকক্ষে পরিচারিকাটি লুকিয়ে বসেছিল। এক সময় সেই ভদ্রলোক রোজকার অভ্যাস মতো বিছানায় শুয়ে পড়লেন ঘরের আলো নিভিয়ে। পরিচারিকাটি প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঘরের আলোটা নিভে যেতেই গুটি গুটি পায়ে বিছানায় উঠে ভদ্রলোকের পাশে শুয়ে পড়ল একটু পরেই। ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়তেন। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। পরিচারিকাটি ভয়ে সিঁটকে রইল, তখন তার মনিব ঘুমের ঘোরে তার গায়ে হাত রাখলেন, তাকে চিনতে পারলেই সমূহ বিপদ, কেলেঙ্কারির একশেষ একেবারে।

ওদিকে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়ামাত্র ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন তার প্রেমিক নাইটের ঘরের উদ্দেশ্যে। একটু পরেই দেখা গেলো নাইটের পাশে ভদ্রমহিলা এবং স্বামীর পাশে পরিচারিকা শুয়ে আছে। ভদ্রলোক প্রায় সারাটা রাত ঘুমিয়ে কাটালেন। নাইট কিন্তু সারা রাত জেগে রইলেন, ভদ্রলোকের স্ত্রী মানে তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে স্ফূর্তি করে প্রায় সমস্ত রাতটাই কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু—

ভদ্রলোক অভ্যাস মতো নিজের স্ত্রী ভেবে ভোর রাতে হাত রাখলেন তরুণী

পরিচারিকাটির গায়ে। আজ হঠাৎ তাঁর হাতটা গিয়ে পড়ে পরিচারিকার বুকের ওপরে। চমকে উঠলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর ঘুম গেলো ভেঙে। অন্ধকার ঘর, কিছুই দেখা যায় না। তবে সেই অন্ধকারেই মেয়েটির বুকে হাত রেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, মেয়েটির স্তন দুটি, সুউচ্চ চূড়ার মতন আর একটু যেন মাংসল। খানিক পরেই তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে স্তনের বৃন্ত দ্বয় আরো বেশি শক্ত হয়ে উঠলো। কেমন যেন সন্দেহ হলো ভদ্রলোকের। তিনি তাঁর সেই সন্দেহ নিরসন করার জন্যে মেয়েটি বুকের ওপর রাখা হাতটা ধীরে ধীরে নিচে, নাভীর অনেক নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন, একেবারে মেয়েটির গোপন অঙ্গের প্রান্ত ভাগে তাঁর চঞ্চল হাতটা এসে ঠেকলো এক সময়। মেয়েটির দুই উরুর সন্ধিস্থল অসম্ভব ফোলা-ফাঁপা, একটু বেশি মাংস যেন সেই জায়গাটায়। সেখানে হাত রেখে তিনি বুঝলেন, না, কোনো মতেই এ তাঁর বৌ হতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ভাবলেন ওঁরা নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে চালাকি করেছে। মনে মনে তিনি ভাবলেন, একটু ধৈর্য ধরে দেখা যাক, ওরা কি করে—

ওরা দুজনে এমন কি করতে পারে সেটা অনুমান করে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে না থেকে তিনিও সুন্দর করে একটা চুমু দিলেন মেয়েটির সিক্ত ঠোঁটে। মেয়েটি প্রথমে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকলেও ভদ্রলোকের ক্রমাগত চুমুর প্রত্যুত্তরে বুঝি বা সে-ও একবার তার মনিবের ঠোঁটে চুমু খেয়ে ফেলল। শুধু তাই নয়, দু'হাত দিয়ে সে তার মনিবের গলা জড়িয়ে ধরল আবেশে, উত্তেজনায়। তরুণী পরিচারিকার কাছ থেকে সাড়া পেয়ে এরপর ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক যা যা করতেন, মেয়েটির সঙ্গেও ঠিক তাই করতে শুরু করলেন এক এক করে। প্রথমেই মেয়েটিকে পোষাকমুক্ত করে নিজেও তিনি পোষাকমুক্ত হলেন। তারপর দুটি দেহ মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেল। ভূমিকম্পের মতো দুজনের দেহ থরথর করে কেঁপে উঠতে থাকল, সেই সঙ্গে বিছানাটাও!

সেই অবস্থায় চরম উত্তেজনাময় মুহূর্তে উপনীত হওয়ার আগে ভদ্রলোক চিৎকার করে বলে উঠলেন, "নাইট মশাই, আপনি কোথায়? কি করছেন! আপনিও কি আমার মতো—"

ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন নাইট। সেই সঙ্গে ভদ্রমহিলাও আঁতকে উঠলেন। তাঁরা ধরা পড়ে গেছেন স্বামীর কাছে। তাহলে এবার কি হবে?

সাড়া না পেয়ে ভদ্রলোক আবার জোরে হাঁক দিলেন, "কথা বলছেন না কেন নাইটমশাই?"

নাইট এবার জবাব দিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

আমি আপনাদের একটা সুখবর দিতে চাই, এ ধরনের বিনিময়ে আমি খুব আগ্রহী, আমি খুব তৃপ্তি পাচ্ছি!"

"কিসের বিনিময়ে?" নাইট তো শুনে থ।

"কেন, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলেন না? এই যে বিনিময় করেছেন আজ রাতে! একটি প্রৌঢ়া, বিবর্ণ, অসতী, বহুব্যবহৃতা মহিলার বিনিময়ে যে টাটকা, তাজা, আমার কথার বাধ্য আর আমার মনের মতো মেয়েটিকে দিয়েছেন, তার জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি জানেন নাইটমশাই, বিয়ের পর এতো আনন্দ আমি কখনো পাইনি। এই অভূতপূর্ব আনন্দ পাইয়ে দেবার জন্যে আর একবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

ওদিকে তরুণী পরিচারিকাটি হতবুদ্ধি হয়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলো ভদ্রলোকের ভারী শরীরের নিচে। এটাই তার প্রথম এ ধরনের সুখ প্রাপ্তি। তাই স্বভাবতই ভদ্রলোকের থেকে একটু বেশি অভিভূতা সেও।

ভোর হয়ে আসছিল। নাইট তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়ে কোনো রকমে গায়ে পোষাক চাপিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর এক লাফে তাঁর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন নিমেষে। এমন কি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে গেলেন।